সেফ ফুড ডাইজেস্ট

বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

ডিমে আছে প্রোটিন
খেতে হবে প্রতিদিন

বিশ্ব ডিম দিবস

১০ অক্টোবর ২০২৫

উন্নত খাদ্য এবং উন্নত
ভবিষ্যতের জন্য হাতে হাত রেখে

বিশ্ব খাদ্য দিবস

১৬ অক্টোবর ২০২৫

প্রকাশনায়

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ প্রকাশনা উপ-কমিটি

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড
BANGLADESH SOCIETY FOR SAFE FOOD

404/A (2nd Floor), Khilgaon Chowrasta, Dhaka-1219 www.bdbssf.org basfefood@gmail.com

সূচিপত্র

○	মুখবন্ধ	০৩
○	বাণী	০৫
○	কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৫-২০২৭	১৩
১	অপচয় রোধেই মিলবে খাদ্য নিরাপত্তা	১৫
২	স্মার্ট খামার থেকে জলবায়ু সহনশীল জাত: ডিম শিল্পের জন্য অভিযোজন প্রযুক্তি	১৭
৩	ডিমের খাদ্য নিরাপদতা: বৈশ্বিক মানদণ্ড থেকে বাংলাদেশের বাস্তবতা	১৯
৪	নিরাপদ খাদ্য হিসেবে পাস্তুরিত দুধ ও মানুষের স্বাস্থ্য	২২
৫	বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবেলা ও খাদ্য অপচয়রোধে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	২৬
৬	অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত মাছ উৎপাদন: খাদ্য নিরাপত্তায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি	২৮
৭	রেস্টুরেন্ট ও স্ট্রিট ফুড : খাদ্য সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাস্তবতা	৩০
৮	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ডিমের গ্রেডিং এবং সাইজিংঃ প্রয়োজনীতা ও করণীয়	৩৪
৯	মাশরুম-একটি অপ্রচলিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় স্বাস্থ্যকর খাবার	৩৮
১০	খাদ্যে অ্যাক্রিলামাইডের গঠন, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	৪০
১১	জুনোটিক পরজীবী ও নিরাপদ খাদ্যঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	৪১
১২	প্রজন্মের রক্ষায় নিরাপদ খাবার চাই	৪৩
১৩	খাদ্য নিরাপত্তায় এক অভিন্ন কৌশল	৪৪
১৪	খাদ্য অপচয়ঃ কারণ ও প্রতিকার	৪৬
১৫	প্রযুক্তিই পারে খাদ্য ক্ষতি কমাতে	৪৮
১৬	খাদ্যে বায়ো ইনোভেশন: বিজ্ঞানের স্পর্শে পুষ্টির নতুন দিগন্ত	৪৯
১৭	টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা প্রযুক্তি: মাছ ও মাংস সংরক্ষণের নতুন দিগন্ত	৫১
১৮	টেকসই খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ পুষ্টির পথে বাংলাদেশ	৫৬
১৯	দুধ ও ডিমের প্রাপ্যতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টির নিশ্চয়তা	৫৮
২০	মৎস্যখাদ্যে প্রোটিনের উৎস হিসেবে মিলওয়ার্ম (Tenebrio molitor) এর ব্যবহার: আমদানি নির্ভরতা কমানো ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা	৬১
২১	নিরাপদ খাদ্যের সচেতন চর্চা	৬৩
২২	মাশরুম: পুষ্টি, খাদ্য এবং জীবন মান উন্নয়নে জীবন্ত সম্পদ	৬৬
২৩	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ডিমের ভূমিকা	৬৯
২৪	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ও গ্রহণে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ও অ্যান্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	৭৩
২৫	বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ	৭৬
২৬	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা: ফার্ম থেকে প্লেট পর্যন্ত খাদ্য সুরক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার (ব্লকচেইন, স্মার্ট সেন্সর)	৭৯
২৭	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন খাতের ভূমিকা	৮৪
২৮	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণে টেকসই পদক্ষেপ	৮৬
২৯	খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত: নিরাপদ ও টেকসই খাদ্যব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	৮৯
৩০	নিরাপদ দুধের অভিযাত্রা ও টেকসই প্রযুক্তি: উৎপাদন থেকে ভোক্তার টেবিল	৯৫
৩১	প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য ডিমের গুরুত্ব	৯৯
৩২	জৈব চাষে নিরাপদ খাদ্য: সুস্থ ভবিষ্যতের অঙ্গীকার	১০১
৩৩	নিরাপদ খাদ্য- টেকসই জীবনের পূর্বশর্ত	১০৬
৩৪	খাদ্য উৎপাদন এবং পুষ্টি নিশ্চিতকরণ	১০৯
৩৫	ডিম: একটি সম্পূর্ণ খাদ্য ও নিরাপদ পুষ্টির উৎস	১১১
৩৬	ডিম: এক বিস্ময়কর পুষ্টির ভাণ্ডার	১১২
○	সেফ ফুড ডাইজেস্ট প্রকাশনা উপ-কমিটি	১১৪
○	প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ	১১৫
○	উপদেষ্টা মন্ডলী	১১৬
○	Life Members	১১৭
○	ছবিতে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর কিছু কর্মকান্ড	১২৩

সদস্য সচিব
প্রকাশনা উপ-কমিটি
বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (BSSF)-এর বার্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষে "সেফ ফুড ডাইজেস্ট" ষষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা-১ প্রকাশ করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, আলহামদুলিল্লাহ্। গুরুত্বপূর্ণ এ দিবস দুটিকে আমরা উদযাপন করি ডিমের গুরুত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে।

বিশ্ব ডিম দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "The Mighty Egg: Packed with Natural Nutrition" যা ডিমের পুষ্টিগুণ ও বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থায় দৃঢ় ভূমিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে এর প্রতিপাদ্য, "ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন"। অপরদিকে, বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future" অর্থাৎ "হাত রেখে হাতে উত্তম খাদ্য ও উন্নত আগামীর পথে", যা আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপদ খাদ্য ও সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার। সে লক্ষ্যেই ২০১৭ সালে BSSF প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তবধর্মী ভূমিকার কারণে বহুমাত্রিক পেশাজীবী ও জনসাধারণের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। "সেফ ফুড ডাইজেস্ট" সেই যাত্রারই এক বস্তুনিষ্ঠ দলিল, যা খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছে সাম্প্রতিক অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনার চিত্র। ২০২০ সালে প্রকাশনার সূচনা থেকেই ডাইজেস্টটি জ্ঞান বিনিময়ের একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংখ্যায়ও জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার নির্যাস নিংড়ে দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রফেসর, গবেষক, সরকারি কর্তৃপক্ষ, কৃষিবিদ, কর্পোরেট, পুষ্টিবিদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার কর্তাব্যক্তি, শিক্ষার্থী ও খাদ্য নিরাপত্তা পেশাজীবীগণ। তাঁদের লিখায় উঠে এসেছে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাণিস্বাস্থ্য ও মানবস্বাস্থ্যের আন্তঃসম্পর্ক অর্থাৎ 'ওয়ান হেলথ'-সহ নানা দিক। এ প্রকাশনার প্রতিটি প্রবন্ধ পাঠককে ডিমের পুষ্টিমান, খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার বিষয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখকদের ব্যাপক সাড়া আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ৩৬টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত এ "সেফ ফুড ডাইজেস্ট ২০২৫" একটি সম্মিলিত উদ্যোগ; যেখানে নীতি ও বাস্তব প্রয়োগের সেতুবন্ধন ঘটানো হয়েছে। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল বরেণ্য বাণী দাতা, সৃষ্টিশীল প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞ রিভিউয়ার, মহৎ বিজ্ঞাপনদাতা এবং কর্তব্যপরায়ণ নির্বাহী কমিটিকে যাঁদের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও নিবেদিত প্রচেষ্টায় এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে, আমি ধন্যবাদ জানাই সোসাইটির প্রতিষ্টাতা সদস্যবৃন্দকে যারা সময়োপযোগী এই সংস্থার গোড়াপত্তন করেছেন।

সোসাইটির বহুমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের এই যৌথ প্রয়াস হোক আগামীর নিরাপদ, পুষ্টিকর ও টেকসই খাদ্যব্যবস্থার অঙ্গীকারের প্রতীক। মুদ্রণ সংক্রান্ত, তথ্যগত বা অন্য ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন অথবা জানালে আমরা সংশোধন করে নেব।

সকলের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করছি।

ড. মো. আব্দুল ওয়ারেছ

Bangladesh Society for Safe Food

প্রকাশকাল...
অক্টোবর ২০২৫

প্রকাশনায়...
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

সম্পাদনায়...
ড. মো. আব্দুল ওয়ারেছ

সহযোগিতায়...
প্রফেসর ড. মো: খালেদ হোসেন
ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান
প্রফেসর ড. এ.কে.এম মোস্তফা আনোয়ার
প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির
প্রফেসর ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম
ডা. এ.কে.এম. খসরুজ্জামান
ড. জীবুন্নাহার খন্দকার
ডা. এএইচএম তাছলিমা আক্তার
প্রফেসর ড. মোছা: মিনারা খাতুন
প্রফেসর ড. আশরাফী হোসেন
ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম
ডা. আবদুর রহমান (রাফি)

গ্রাফিক্স ও প্রিন্টিং...
আলিফ প্রিন্টিং প্রেস, ময়মনসিংহ
০১৯১৮-৬৫৪৮২৯

উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ এবং বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড' স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

বিশ্ব খাদ্য দিবস সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য Hand in Hand for Better Foods and a Better Future বা 'উন্নত খাদ্য এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য হাতে হাত রাখো'। অর্থাৎ খাদ্যের উন্নতি এবং মানুষের ভাল ভবিষ্যতের জন্য সরকার, সংগঠন, জনগোষ্টিকে মিলিতভাবে হাতে হাত রেখে বৈশ্বিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে। কৃষিজাত দানাদার জাতীয় খাদ্য ও সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। একই সাথে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবদান আজ বিশ্ব স্বীকৃত।

'ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পালিত হয়েছে 'বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫'। ডিম আমিষ জাতীয় পুষ্টির উৎস এবং সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সহজলভ্য। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যানুযায়ী, বছরে একজন মানুষের নূন্যতম ১০৪টি ডিম খাওয়া প্রয়োজন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে বছরে ২৪৪০ কোটি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে, এবং ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ন্যূনতম লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। বর্তমানে মাথাপিছু বার্ষিক ডিম গ্রহণের পরিমাণ বছরে ১৩৭ টিরও বেশী।

বিজ্ঞানী, খামারি, ভোক্তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের চেষ্টার মাধ্যমে খাদ্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি এবং কৃষিসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং একইসাথে সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টি সম্মত খাদ্য নিশ্চিত কল্পে সচেষ্ট হওয়া জরুরী। দেশের উপযোগি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। সকলকে সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্নভাবে খাদ্য শস্য ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে কাজ করার জন্য তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি প্রান্তিক কৃষক ও খামারিদের সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

আমি বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

ফরিদা আখতার

ভাইস-চ্যান্সেলর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

‘বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫’ ও ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষ্যে “বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড”- একটি বার্ষিক স্মরনিকা ‘সেফ ফুড ডাইজেস্ট’ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

"বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" -এর উদ্যেগে বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে "সেফ ফুড ডাইজেষ্ট" -এর ষষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা-১ এর প্রকাশকালে সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আগামী ১০ই অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হবে বিশ্ব ডিম দিবস। এ বছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো -"The Mighty Egg: Packed with Natural Nutrition"-এই স্লোগান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ডিম একটি শক্তির উৎস যাহা প্রাকৃতিক পুষ্টিতে ভরপুর থাকে। এতে বিদ্যামান উচ্চমানের প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ ও অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড শিশু থেকে বৃদ্ধ -সবার জন্য সমানভাবে উপকারী। স্বাস্থ্যকর জাতি গঠনে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে বছরে একজন মানুষের ন্যুনতম ১০৪ টি ডিম খাওয়া প্রয়োজন। সেই হিসেবে প্রতিবছর আমাদের ডিমের প্রয়োজন ১৮৫০.১৬ কোটি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে চাহিদার চেয়েও বেশী (২৪৪০.৬৫ কোটি) ডিম উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু বাৎসরিক ডিম উৎপাদনের পরিমান ১৩৭.১৯ টি।

অন্যদিকে, বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ -এর প্রতিপাদ্য বিষয় "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future" যাহা উন্নত খাবার উৎপাদন ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য আমাদের হাতে হাত রেখে কাজ করার আহ্বান জানায়। একটি ক্ষুধামুক্ত ও সুস্থ বিশ্ব গঠনে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য অপচয় ও নিরাপদ খাদ্যের সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছি এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও এখন অনেকটা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর ৩৯.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান, ৪৫.৮৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ভূট্টা, ১.০৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন গম এবং ১৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হয়। এখন আমাদের প্রয়োজন পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ সুষম ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করা। নানাবিধ কারনে আমাদের খাবার সমূহ অনিরাপদ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ে খাদ্যে রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যবহার, খাদ্যে ভেজাল ও জীবাণু দুষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতকরণের মাধ্যমেও খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে। কাজেই খাদ্যকে নিরাপদ করতে হলে এর উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপনন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সহ খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও পরিবেশন সর্বক্ষেত্রেই সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে, তবেই খাদ্য মানুষের জন্য নিরাপদ হবে।

শেরেবাংলা কষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কষি, প্রাণীসম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। এই দিবসগুলি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে- একটি সুস্থ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

সবাইকে বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল লতিফ

ভাইস-চ্যান্সেলর
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

আসসালামু আলাইকুম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিবস "বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫" ও "বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫"। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর বিশ্ব ডিম দিবস এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন করা হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) প্রতিবারের মত এবারও "সেফ ফুড ডাইজেস্ট ২০২৫" প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ডিম একটি প্রাকৃতিক পুষ্টির ভাণ্ডার: এর মধ্যে রয়েছে উচ্চমানের প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদান যা আমাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ভূমিকা রাখে। ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রথম বিশ্ব ডিম দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব ডিম দিবস। এই বছরের বিশ্ব ডিম দিবসের প্রতিপাদ্য হলো "The Mighty Egg: Packed with Natural Nutrition". যথার্থই এই প্রতিপাদ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে মানুষের পুষ্টিতে ডিমের শক্তিশালী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মানুষের অপুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো প্রোটিনের ঘাটতি। সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে প্রোটিনের অন্যতম উৎস হলো ডিম। তাই আমাদের প্রতিদিন ডিম খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বিজ্ঞানীদের মতে ডিম শুধু স্বাস্থ্যকর উপাদানই নয় রোগ প্রতিরোধেও রয়েছে চমৎকার ভূমিকা। গবেষকদের মতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন একটি করে ডিম খেলে শরীরে কোন ধরনের সংক্রামক রোগ আক্রমণ করতে পারবেনা। সুতরাং বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ শুধুমাত্র একটি পাঠচিহ্ন নয়-এটি একটি জাগরণ, একটি আহ্বান।

অন্য দিকে, মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দরিদ্র পুষ্টিহীনতা দূর করে ক্ষুধা মুক্ত পৃথিবীর গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৫ সালের ১৬ই অক্টোবর জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) তাদের কার্যক্রম শুরু করে। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা শুরু হয়। ২০২৫ সালের বিশ্ব খাদ্য দিবসের আনুষ্ঠানিক স্লোগান বা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future". এই প্রতিপাদ্য সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর, টেকসই এবং সহজলভ্য খাদ্যের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রচেষ্টা তৈরিতে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, বিশেষ করে ২০২৫ সালে FAO-এর ৮০তম বার্ষিকীর স্বীকৃতিস্বরূপ। এই দুই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়-প্রত্যেকে একটি সুস্থ, সুষম ও নিরাপদ খাদ্য উপভোগের অধিকার রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষক ও খামারি-সবাই মিলে আমরা একটি নিরাপদ খাদ্য চেইন গড়ে তুলব।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিএসএসএফ দীর্ঘদিন যাবত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনা সভা সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন করছে এবং সঠিকভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রসেসিং মান নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও মান-নিয়ন্ত্রণে বিএসএসএফ কর্তৃক আয়োজিত এসব জনসচেতনতা মূলক কর্মকান্ডের জন্য সকল সদস্যবৃন্দকে আমি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমি বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত "সেফ ফুড ডাইজেস্ট ২০২৫" এর সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর ড. কাজী রফিকুল ইসলাম

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫" এবং"বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫" উপলক্ষ্যে "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" এর এই উদ্যোগে "সেফ ফুড ডাইজেস্ট" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশে ২০১৩ সাল থেকে দিবস দুটি ব্যাপক আকারে পালন করা হচ্ছে। প্রতি বছর ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের কারণে জনগণের কাছে এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য পৌঁছে যাচ্ছে এবং জনসচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ডিম দিবস উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে মানুষকে প্রতিদিন অন্তত একটা নিরাপদ ডিম খেতে উদ্বুদ্ধ করা। একটা ডিমে ৭ গ্রাম উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত প্রোটিন রয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় Essential Amino Acids এবং Minerals বিদ্যমান যা মানুষের শরীর গঠনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তাই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে স্বল্প খরচে ডিমের কোন বিকল্প নেই। বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমান সময়ের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রক্ষেপণ অনুসারে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০-৭০% খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য নিরাপদতাও নিশ্চিত করতে হবে। সমন্বিতভাবে, এই প্রয়োজন পূরণে প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সকলের প্রচেষ্টায় ডিম এবং মাংস উৎপাদনে আমরা বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। একইসাথে, Sustainable Development Goals (SDG) অর্জনে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাত মুখ্য ভূমিকা রেখে চলছে।

এ বারের বিশ্ব ডিম দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয় "ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন"। অপরদিকে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয় "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future"। মানুষের জীবন ও জীবিকায় নিরাপদ খাদ্য ও পানির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই উভয় দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয়সমূহ অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ন। তাদের এই কর্মপ্রয়াসটি প্রসংশার দাবী রাখে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অন্য সকল অংশীজনদের সাথে প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও নিরাপদতা বা ফুড সেফটি বিষয়টি প্রতিপালনের জন্য বিশেষ করে উৎপাদন হতে শুরু করে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য পৌছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আওতায় মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনে সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং জোরদার করেছে। ফিডমিল ও হ্যাচরী পরিদর্শন, পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন, উৎপাদন পর্যায়ে এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপদতার (ফুড সেফটি) বিষয়ক অসংগতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। প্রাণিজাত পণ্যের গুনগত মান নিরুপণে ঢাকার সাভারে আন্তর্জাতিক মানের একটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে যা আইএসও ৯০০১ এবং আইএসও ১৭০২৫ সনদ প্রাপ্ত। ফলশ্রুতিতে, প্রাণিজাত পণ্যের ও প্রাাণিসম্পদ উৎপাদন সামগ্রীর নিরাপদতা ও গুনগত মান নিরুপণে এ দপ্তরের সক্ষমতা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। যা প্রাাণিজাত পণ্য রপ্তানিতে সহায়ক হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে খামারীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন হয়েছেন। তাঁরা গবাদিপশু-পাখি উৎপাদনে ফুড সেফটি ব্যবস্থাপণা অনুশীলন করছেন। ফলে, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নত হচ্ছে।

তবে, খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একই সাথে, এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। Good Manufacturing Practice (GMP) ও Good Livestock Production Practice (GLPP) যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। কাজটি কারও একার নয়। সে জন্য বলা হয় ফুড সেফটি অংশীজনের সম্বলিত দায়িত্ব। প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনকারী, ভোক্তা, সিভিল সোসাইটি, সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সকলকেই এ নিয়ে কাজ করতে হবে। যাতে করে আমরা ভোক্তা পর্যায়ে একটা নিরাপদ খাদ্য পেতে পারি এবং রপ্তানির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে পারি।

"বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড"এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। খাদ্য নিরাপত্তায় এ সোসাইটির কার্যক্রম প্রশংসনীয়। উত্তরোত্তর সোসাইটির বিস্তৃতি কামনা করছি।

ড. মো: আবু সুফিয়ান

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৫ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০২৫ সালের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় - "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future". এই প্রতিপাদ্য সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর, টেকসই এবং সহজলভ্য খাদ্যের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রচেষ্টা তৈরিতে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বর্তমান সরকার নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা।

খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য তথা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। বলা যায়, এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% প্রাণিজ আমিষের জোগান দেয় মাছ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসাবে মাছের গুনগত মান অন্য যেকোন খাদ্যের চেয়ে উত্তম। মাছে রয়েছে সকল অ্যামাইনো এসিডের এক সুষম বন্টণ যা অন্য খাদ্যে সাধারনত পাওয়া যায়না। এছাড়া সামুদ্রিক মাছে রয়েছে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি এসিড যা হৃদরোগ ও হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এছাড়া বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছে রয়েছে অতি উপকারী ডোকোসাহেক্সনয়িক এসিড (Docosahexaenoic acid) ও ইকোস্যাপান্টানয়িক এসিড (Eicosapentaenoic acid) নামক বিশেষ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি এসিড যা গর্ভাবস্থায় ও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশ, হৃদপিন্ড সুস্থ্য রাখা এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। সুষম খাদ্য হিসেবে মাছ অতি উপকারী ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর স্বয়ংসম্পূর্ণ, এছাড়া মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে ।

খাদ্য নিরাপত্তার (Food Security) পাশাপাশি নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য (Food Safety) নিশ্চিতের বিষয়ে নজর দেয়া অত্যন্ত জরুরী। সেক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য করতে হবে। বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই নানা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে পড়েছে। এতে করে কোমলমতি শিশু-কিশোরসহ সকলেরই স্থূলতাজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। অন্যদিকে পুষ্টিহীনতার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ শারীরিক জটিলতা। তাই আমাদের খাদ্য তালিকায় মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন দেশি ফলমূল, শাকসবজি ও দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সহ অন্যান্য উৎসাহতে পরিমিত প্রাণিজ আমিষকে স্থান দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় নিয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী, বেসরকারি উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে (৩-০ শূণ্য) মূলনীতি: শূণ্য দারিদ্র, শূণ্য বেকারত্ব ও শূণ্য নেট কার্বন নিস্ব:রণ অর্জন করতে সক্ষম হবো -এ প্রত্যাশা করি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড কর্তৃক প্রকাশিতব্য স্যুভেনির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। খোদা হাফেজ।

ড. মো: আবদুর রউফ

সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

বাণী

"বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" -এর উদ্যেগে "বিশ্ব ডিম দিবস" ২০২৫ ও "বিশ্ব খাদ্য দিবস" ২০২৫ উপলক্ষ্যে "সেফ ফুড ডাইজেষ্ট" -এর ষষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা-১ এর প্রকাশকালে সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের মানুষকে পুষ্টিসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার মহান ব্রত নিয়ে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড"। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই সোসাইটি নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজন সহ সায়েন্টিফিক জার্নাল ও স্বরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ, ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাবারের বিষয়ে সচেতন করে আসছে। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হলেও অধিকাংশ জনগণের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ, সুষম খাবার গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতার যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। এছাড়াও মানুষের অজ্ঞতা ও অসাধুতার কারণে খাবার হয়ে পড়েছে ঝুকিপূর্ণ। এর মধ্যে ভেজালযুক্ত খাবার, খাদ্যে কিটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি, ভারী ধাতু ও এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। খাদ্যে অনোনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক ও কীটনাশকের উপস্থিতির কারণে মানুষ -এর বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছে। ফলে মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং মানুষের শরীরে দেখা দিচ্ছে ক্যান্সারসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা। অন্যদিকে মানুষের অসচেতনতার কারণে খাদ্য দূষিত হচ্ছে নানাবিধ সংক্রামক জীবাণু দ্বারা। এসকল খাদ্যবাহিত ক্ষতিকর সংক্রামক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মানুষ ভূগছে নানাবিধ জটিল রোগে। এসকল বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর উদ্যেশ্যে "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সোসাইটি টেলিভিশনে নিয়মিত সাপ্তহিক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়াজনের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে নিরাপদ খাদ্য সমপর্কে সচেতন করে যাচ্ছে।

আগামী ১০ই অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হবে বিশ্ব ডিম দিবস। এ বছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-"ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন" – এই প্রতিপাদ্যের ভাবার্থ হলো: ডিম একটি পূর্ণাঙ্গ ও পুষ্টিকর খাবার, যাতে শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও শক্তি জোগানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনসহ নানা উপাদান রয়েছে। সুস্থ শরীর ও মেধার বিকাশে প্রতিদিন ডিম খাওয়া অত্যন্ত উপকারী। এই শ্লোগানটি মানুষকে নিয়মিত ডিম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে অপুষ্টি রোধ হয় এবং সব বয়সের মানুষ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার গ্রহণে সচেতন হয়। স্বাস্থ্যকর জাতি গঠনে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিম কেবল একটি খাদ্য নয়, এটি পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতীক। ডিম হচ্ছে সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও উচ্চমানের পুষ্টির অন্যতম উৎস। এতে প্রটিন এবং ভিটামিন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ যেমন- আয়রন ও সেলেনিয়াম থাকে যা শিশুদের মেধাবিকাশ, গর্ভবতী নারীর পুষ্টি ও প্রবীণদের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। লাখো মানুষ এ খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, যা গ্রামীন অর্থনীতিকে সচল রাখছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্দ্যোগে ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য- প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অন্ততঃ একটি ডিম অন্তর্ভূক্ত করা। একটি ছোট ডিমও পারে বড় পরিবর্তন আনতে। পুষ্টিহীনতা দূর করে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও মেধাবী জাতি গঠণে ডিমের ভূমিকা অপরিসীম। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি- "প্রতিদিন একটি ডিম খাব, পুষ্টি ও শক্তিতে দেশ গড়বো"। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ২৪৪০.৬৫ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু বাৎসরিক ডিম উৎপাদনের পরিমান ১৩৭.১৯ টি। উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিম উৎপাদনের বর্তমান হার আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অন্যদিকে, আগামী ১৬ ই অক্টোবর পালিত হবে "বিশ্ব খাদ্য দিবস"। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ -এর প্রতিপাদ্য বিষয় "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future" যাহা উন্নত খাবার উৎপাদন ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য আমাদের হাতে হাত রেখে কাজ করার আহ্বান জানায়। একটি ক্ষুধামুক্ত ও সুস্থ বিশ্ব গঠনে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য অপচয় ও নিরাপদ খাদ্যের সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছি এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও এখন অনেকটা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। খাদ্যে এখন আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর ৩৯.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান, ৪৫.৮৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ভূট্টা, ১.০৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন গম, ১৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হয়। কিন্তু পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ন্যায়সংঙ্গত বন্টন এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য অপচয় এবং টেকশই উৎপাদন ব্যবস্থার অভাব খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করছে। এই প্রেক্ষাপটে, কৃষির আধুনিকায়ণ, স্থানীয় খাদ্যসম্পদের ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষমতায়নই হতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি। বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ সুষম ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করা। নানাবিধ কারনে আমাদের খাবার সমূহ অনিরাপদ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ে খাদ্যে মাত্রারিক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যবহার, খাদ্যে ভেজাল, জীবাণু দুষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতকরণের মাধ্যমেও খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে। কাজেই খাদ্যকে নিরাপদ করতে হলে এর উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপনন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সহ খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও পরিবেশন সর্বক্ষেত্রেই সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে, তবেই খাদ্য মানুষের জন্য নিরাপদ হবে।

"সেফ ফুড ডাইজেষ্ট" এর এই সংখ্যাটিতে যাঁরা মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠিয়ে স্মরনিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্মরনিকাটি প্রকাশে যাঁরা আর্থিকভাবে সহযোগীতা করেছেন আমি তাঁদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশনা উপকমিটিকে, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যায় করে এই সুন্দর বইটি প্রকাশ করেছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে এদেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করি।

প্রফেসর ড. মো: খালেদ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

বাণী

খাদ্য আমাদের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ শুধু সুস্থ জীবনের ভিত্তিই নয়, একটি উন্নত জাতি গঠনেরও পূর্বশর্ত। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আজ একটি বৈশ্বিক অগ্রাধিকার।

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য "ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন" আমাদের মনে করিয়ে দেয়–ডিম একটি পূর্ণাঙ্গ, সুলভ এবং সহজলভ্য প্রোটিনের উৎস। এতে রয়েছে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের অ্যামাইনো এসিড, ভিটামিন, মিনারেল এবং স্বাস্থ্যসম্মত চর্বি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করা কেবল শিশু ও কিশোরদের পুষ্টিহীনতা রোধেই নয়, বরং সব বয়সের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে, বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য "উন্নত খাদ্য ও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য হাতে হাত রেখে" আমাদের আহ্বান জানায়–খাদ্যের মান, নিরাপত্তা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও নীতিনির্ধারক–সবাই মিলে যদি খাদ্য সরবরাহ চেইনের প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা ও নৈতিকতা বজায় রাখি, তবে একটি সুস্থ, শক্তিশালী ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (BSSF) বিশ্বাস করে–নিরাপদ খাদ্য সবার অধিকার, এবং সচেতনতা তার প্রথম শর্ত।

এই উপলক্ষে আমরা সবাইকে আহ্বান জানাই–নিরাপদ, পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যময় খাদ্য গ্রহণে সচেতন হই, ডিম খাই প্রতিদিন, আর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাতে হাত রাখি।

একসাথে এগিয়ে চলি,

নিরাপদ খাদ্য, সুস্থ জীবন ও উন্নত ভবিষ্যতের পথে।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড বরাবরের মতো এবারও বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে "সেফ ফুড ডাইজেস্ট" এর ষষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা-১ প্রকাশ করে দেশের আপামর জনসাধারনের মাঝে খাদ্য নিরাপদতায় সচেতনতা সৃষ্টিতে অব্যাহত ভাবে কাজ করে চলেছে। আমি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কমিটি ও অংশীজনদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে একযোগে কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ।

ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান

আহ্বায়ক
প্রকাশনা উপ-কমিটি
বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

বাণী

আসসালামু আলাইকুম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এই সুন্দর সময়ে, যখন আমরা এগিয়ে চলছি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার দিকে, সামনে আমাদের দাঁড়িয়েছে দুটি মৌলিক দিবস- ১০ অক্টোবর ২০২৫ (বিশ্ব ডিম দিবস) ও ১৬ অক্টোবর ২০২৫ (বিশ্ব খাদ্য দিবস)। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) এর পক্ষ থেকে "সেফ ফুড ডাইজেস্ট ২০২৫"এর মাধ্যমে এই দুই দিবসকে একটি শক্তিশালী বার্তা হিসেবে রূপ দিতে চায়-"ডিম ও খাদ্যে সুরক্ষা"-কে শুধু স্লোগানের আবেগের মধ্যে না রেখে বরং কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা হোক। ডিম ও খাদ্য-এই দুটি বিষয় আমাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। কিন্তু যেকোন খাদ্য যেমন পুষ্টি দান করতে পারে, তেমনই অবহেলা করলে তা বিপদও বয়ে আনতে পারে। তাই যথার্থই এ বছর এই দুই দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০২৫ সালের বিশ্ব ডিম দিবসের থিম "ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন" আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ডিমের গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডিম সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য প্রোটিনের অন্যতম উৎস, যা শিশু থেকে প্রবীণ–সবার পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়ক। এই থিম মানুষকে নিয়মিত ডিম খাওয়ার মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা রোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। পাশাপাশি, এটি দেশের ডিম উৎপাদক ও পোলট্রি শিল্পের উন্নয়নেও সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

আবার বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫-এর থিম নির্ধারণ করা হয়েছে "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future" - অর্থাৎ "উন্নত খাদ্য ও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য হাতে হাত রেখে"। এই থিম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য শুধু একক প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত নয়; প্রয়োজন আন্তঃসংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সমন্বয়, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও যুগোপযোগী নীতি-উপকরণ।

বর্তমানে, বিশ্ব খাদ্য-জট, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি-উপযোগীতা সংকট, খাদ্য অপচয় ও অঞ্চলভেদে পুষ্টি ঘাটতির প্রকোপ বাড়ছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে, একটি টেকসই ও অংশগ্রহণমূলক খাদ্য ব্যবস্থার বিকাশ অপরিহার্য- যেখানে ডিম ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারগুলি নিরাপদ ও সর্বসাধারণের নাগালে পৌঁছাবে।

আমি সকল গবেষক, পুষ্টিবিদ, কৃষক, শিক্ষার্থী, খাদ্যশিল্প ও মিডিয়ার লোক, এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানাই- আসুন আমরা "হাত মিলিয়ে" এগিয়ে যাই। শুধু হাতে হাত মিলিয়ে নয়, হৃদয় মিলিয়ে, সিদ্ধান্ত মিলিয়ে এই দেশকে পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্যের দলে গড়ে তুলি।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে ৬ষ্ঠ সেফ ফুড ডাইজেস্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই উদ্বেগের একজন সহযাত্রী হিসেবে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) দিবস দুটিকে স্মরণ করে আসছে। প্রকাশিত এ স্মরণিকাতে খাদ্য ও ডিম সম্পর্কিত সকল সেক্টর যেমন শস্য, পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ঔষধ, শাকসবজি, ফলমূল এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছানো ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ সকল প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য উপাত্তসমূহ সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। যে সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নানাবিধ লেখা দিয়ে আমাদের এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং আর্থিক সহযোগীতা করেছেন আপনাদের সকল কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ ও শুভকামনা রইল।

প্রফেসর ড. মো. শরিফুল ইসলাম

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড
কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৫-২০২৭

সভাপতি

প্রফেসর ড. মোঃ খালেদ হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ,
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস অনুষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

সাধারণ সম্পাদক

ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সেইফ বায়ো প্রোডাক্টস্ লি.

সহ-সভাপতি-১

প্রফেসর ড. এ.কে.এম মোস্তফা আনোয়ার
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ
এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-সভাপতি-২

প্রফেসর ড. মো: আমির হোসেন
জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগ, কৃষি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

যুগ্ম-সম্পাদক

ডা. এএইচএম তাছলিমা আক্তার
সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার
সার্ক কৃষি কেন্দ্র
ফার্মগেট, বাংলাদেশ, ঢাকা

কোষাধ্যক্ষ

ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান
প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

প্রকাশনা সম্পাদক

প্রফেসর ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম
ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

প্রফেসর ড. আশরাফী হোসেন
বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মোলেকুলার বায়োলজি বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক

প্রফেসর ড. সাজেদুল হক
ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সাংগঠনিক সম্পাদক

ড. জীবুন্নাহার খন্দকার
সহযোগী অধ্যাপক
ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ

সদস্য

ড. নুরে আলম সিদ্দিকী
ডেপুটি টিম লীড
ফ্লেমিং ফান্ড কান্ট্রি গ্রান্ট অব বাংলাদেশ

সদস্য

প্রফেসর ড. সুলতান আহম্মেদ
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

সদস্য

প্রফেসর ড. মোছা: মিনারা খাতুন
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সদস্য

প্রফেসর ড. শেখ আহমেদ আল নাহিদ
ডীন, মৎস্য অনুষদ
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সস ইউনির্ভাসিটি

সদস্য

ডা. এ.কে.এম. খসরুজ্জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইন্টার এগ্রো বিডি লি.

সদস্য

মোহাম্মদ তারেক সরকার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফিসটেক হ্যাচারী লি.

সদস্য

ডাঃ মোঃ মুখলেছুর রহমান
জেলা ভেটেরিনারি সার্জন
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফার্মগেট, ঢাকা, বাংলাদেশ

সদস্য

ড. মো. আব্দুল ওয়ারেছ
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
পরিকল্পনা শাখা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা

সদস্য

ডাঃ আব্দুর রহমান রাফি
প্রভাষক, ডেয়রি বিজ্ঞান বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এক্স অফিসিও
সদ্য সাবেক সভাপতি

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার (লাইভস্টক ডিভিশন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা

এক্স অফিসিও
সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক

প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

illumina®

MiSeq™ i100 Series

The standard in sequencing simplicity

☑ Simplest ☑ Fastest ☑ Sustainable

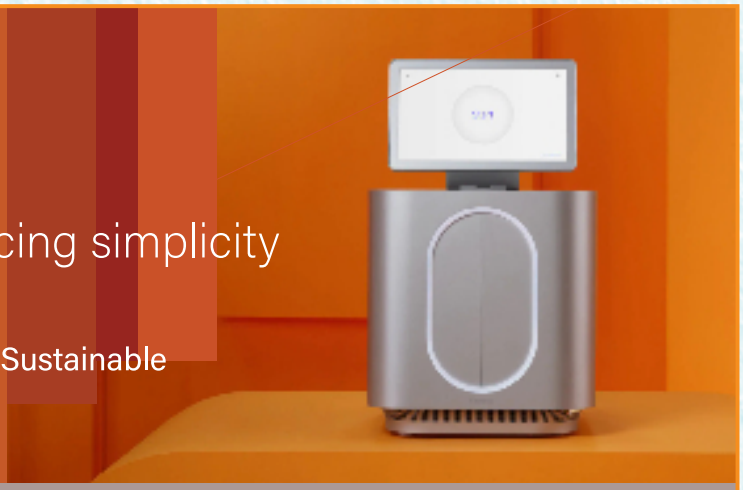

100M	30 Gb	100	384
Max reads	Max output	Small whole genomes per run	Targeted gene sequences per run*

*Reads per sample, therefore sample plexity dependent on panel and desired coverage

INVENT TECHNOLOGIES LTD

Flat No : B1 & C1, House No : 119, Block : F, Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh

Tel : 9852557, Fax : 9872152 Email: info@invent.com.bd

অপচয় রোধেই মিলবে খাদ্য নিরাপত্তা

ড. মো. হারুনুর রশীদ, পরিচালক, সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতা উত্তর দেশে চালের উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি টন যা বেড়ে ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৬ লাখ টনে। একইভাবে আলু, ভুট্টা, মাছ, দুগ্ধ এবং মাংস উৎপাদনেও হয়েছে চোখে পড়ার মতো অগ্রগতি। এই অর্জন দেশে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার, সরকারের নীতি ও কৌশল, সর্বপরি কৃষকের কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ়তার প্রতিফলন। কিন্তু উৎপাদিত খাদ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মানুষের টেবিলেই পৌঁছায় না। ফল, সবজি এমনকি প্রধান খাদ্য ধানও হারিয়ে যায় অপ্রতুল সংরক্ষণ, অদক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ফলনোত্তর ক্ষতি হওয়ার কারণে। খাদ্য অপচয় কেবল প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়; এটি খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতার বিষয়। প্রতিটি অপচয় হওয়া দানা হলো শ্রম, পানি, সার এবং অর্থের অপচয়, পাশাপাশি এটি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে অবদান রাখে। তাই শুধু উৎপাদন বাড়ানো নয়, বরং খাদ্য অপচয় কমানোও সমানভাবে জরুরি। এ সংকট মোকাবিলা না করলে বাংলাদেশের কঠোর পরিশ্রম প্রকৃত অর্থে জনগণকে পুষ্টি সমৃদ্ধ করতে পারবে না।

দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে সার্কভূক্ত দেশগুলোতে ফসল-পরবর্তী ক্ষতি একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ। এ অঞ্চলে ফসল তোলার পর ২০ থেকে ৪৪ শতাংশ ফল ও সবজি হারিয়ে যায় অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অদক্ষ পরিবহন ও সংরক্ষণের কারণে। বৈশ্বিকভাবে গড়ে ১৩.২ শতাংশ খাদ্য খামার থেকে খুচরা বাজারে পৌঁছানোর আগেই হারিয়ে যায়। উন্নয়নশীল দেশে এই হার নষ্টযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এতে শুধু খাদ্য নিরাপত্তাই হুমকির মুখে পড়ে না, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ টন গৃহস্থালি খাদ্য অপচয় হয়। এর মধ্যে ফল ও সবজি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষেত্রবিশেষে ৪০ শতাংশেরও বেশি খাবার নষ্ট হয়ে যায়। আলুর জন্য বছরে প্রায় ৮০ লাখ টনের সংরক্ষণ ঘাটতি রয়েছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হয়ে যায়। দেশের প্রধান খাদ্য ধান কাটার পরেই ১০ শতাংশের বেশি নষ্ট হয়। শুধু এটির অর্থমূল্যই বছরে ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। সেই সঙ্গে উৎপাদনে ব্যবহৃত শক্তি, পানি, সার এবং শ্রমও অপচয় হয়। পরিবেশগতভাবে এই অপচয়ের ফলে প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ৩০ লাখ টন মিথেন গ্যাস নির্গত হয়, যা জলবায়ু সংকটকে আরও তীব্র করে।

বাংলাদেশের অনেক মানুষ একের অধিক পুষ্টিহীনতার বোঝা বহন করছে। লাখ লাখ শিশু খর্বাকৃতি ও জিঙ্ক, আয়োডিন ও ভিটামিন-ডি ঘাটতিতে ভুগছে। আবার শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ছে স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ। ২০২৪ সালের হিসেবে প্রায় ১ কোটি ৩৯ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, যা মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ১৩.২ শতাংশ। একদিকে জনগণের একটি অংশ পুষ্টিহীন খাবারে বেঁচে থাকে, অন্যদিকে আরেক অংশ অতিরিক্ত ভোগ ও অপচয় করে, যা পুষ্টিহীনতা ও প্রতিরোধযোগ্য রোগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। খাদ্য অপচয় সরবরাহ চেইনের প্রতিটি ধাপে ঘটে।

মাঠ পর্যায়ে জ্ঞানের ঘাটতি, অপর্যাপ্ত ফসল সংগ্রহের কৌশল, দুর্বল সরঞ্জামের কারণে উৎপাদন কমে যায়। পরিবহনে শীতল সংরক্ষণ ও রেফ্রিজারেটেড যানবাহনের অভাবে কৃষকরা দ্রুত ফল-সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হয়, নয়তো সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। বাজার অবকাঠামোর দুর্বলতা, দুর্বল প্যাকেজিং এবং গ্রেডিং প্রক্রিয়ার অভাবে ক্ষতি বেড়ে যায়। এমনকি পরিবার পর্যায়েও পরিকল্পনার অভাব, অসাবধানী সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত খাদ্যে গ্রহণের প্রবণতা সংস্কৃতি থেকে অপচয় বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৮ লাখ ২৬ হাজার মেট্রিক টন কলা উৎপাদিত হলেও এর প্রায় ২১.৬৭ শতাংশ (১ লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন) নষ্ট হয়ে যায় অযত্ন ও ভুল ব্যবস্থাপনার কারণে।

খাদ্য ক্ষতি ও অপচয় রোধ শুধু প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নয়; এটি একটি নৈতিক দায়িত্বও বটে। কৃষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জাতিকে খাদ্য জোগান দেন। অথচ সেই খাবার মাঠে, পরিবহনে, বাজারে বা ঘরে পচে গেলে তাদের শ্রম ব্যর্থ হয় এবং ক্ষুধার্তরা বঞ্চিত হয়। শীতল সংরক্ষণাগার, আধুনিক প্যাকেজিং ও দক্ষ পরিবহনে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিবছর কোটি কোটি টন খাদ্য রক্ষা করা সম্ভব। কৃষকদের উন্নত ফসল সংগ্রহ, হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণ কৌশল শেখানো জরুরী। সচেতনতামূলক প্রচারণা মানুষকে পরিকল্পিত ক্রয়, সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সচেতন ভোগে উৎসাহিত করতে পারে। খুচরা বিক্রেতা ও রেস্তোরাঁগুলোকেও উদ্বৃত্ত খাদ্য দরিদ্রদের মাঝে বিতরণের মতো উদ্যোগ নিতে পারে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য অপচয় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ২০২২ সালে বিশ্বে ১ বিলিয়ন টনেরও বেশি খাদ্য অপচয় হয়েছে, যা মাথাপিছু প্রায় ১৩২ কেজি বা প্রতি পাঁচটি খাবারের একটি। এর ৬০ শতাংশ অপচয় হয়েছে পরিবার থেকে, ২৮ শতাংশ রেস্তোরাঁ ও খাদ্য পরিবেশনা থেকে এবং ১২ শতাংশ খুচরা বাজার থেকে। যদি খাদ্য অপচয় একটি দেশ হতো, তবে এটি হতো তৃতীয় বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ। ভারত ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতের খাদ্য অপচয় হ্রাস বাধ্যতামূলক বিল এবং মালয়েশিয়ার খাদ্য ক্ষতি ও অপচয় আইন জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য অপচয় রোধে নীতি বাস্তবায়ন, প্রণোদনা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে। বাংলাদেশও একটি জাতীয় কাঠামো তৈরি করে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, উদ্বৃত্ত খাদ্য বঞ্চিতদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া এবং সবার মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণ উৎসাহিত করতে পারে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য **"ভালো খাদ্য এবং ভালো ভবিষ্যতের জন্য হাতে হাত"** বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে কৃষক, নীতিনির্ধারক, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা ও সুশীল সমাজের সমন্বিত সহযোগিতা জরুরী যাতে খাদ্য ব্যবহারে দক্ষতা, ন্যায়সংগত বণ্টন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়। এভাবেই বাংলাদেশ তার কৃষি অর্জনকে টেকসই পুষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক খাদ্যব্যবস্থা ও পরিবেশ সংরক্ষণে রূপান্তর আনতে পারে। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্তি অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য অপচয় শুধু অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত ব্যর্থতা নয়, এটি সামাজিক ও নৈতিক ব্যর্থতাও। প্রতিটি দানা, প্রতিটি সবজি, প্রতিটি আহার মূল্যবান। বাংলাদেশ যদি দৃঢ় সংকল্পে খাদ্য ক্ষতি ও অপচয় মোকাবিলা করে, তবে তার কৃষি সাফল্যকে রূপান্তর করতে পারবে প্রকৃত পুষ্টি, ন্যায়সংগত বণ্টন ও টেকসই উন্নয়নে। একসাথে হাতে হাত রেখে আমরা নিশ্চিত করতে পারি প্রতিটি আহার হবে একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও ন্যায়সংগত ভবিষ্যতের অংশ, যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

স্মার্ট খামার থেকে জলবায়ু সহনশীল জাত: ডিম শিল্পের জন্য অভিযোজন প্রযুক্তি

ডক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর, ফার্মাকোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৫-এ এসে বাংলাদেশের ডিম শিল্প একটি সংকট ও সম্ভাবনার দ্বৈত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ডিম শিল্প যখন উন্নয়নের নতুন দিগন্ত অনুসন্ধান করছে, তখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং এন্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার এই শিল্পের জন্য দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব এবং প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস ডিম উৎপাদন ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে স্মার্ট খামার ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীল জাত উন্নয়ন এবং এন্টিবায়োটিকের বিকল্প পদ্ধতিসমূহই ডিম শিল্পের টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তরের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে থেকে গেছে এন্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। এটি কেবল মুরগির স্বাস্থ্যই নয়, মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং জলবায়ু অভিযোজন কৌশলের জন্যও এক গভীর হুমকি। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ডিম শিল্পে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের বর্তমান চিত্র, এর নেতিবাচক প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশলসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ব্যপকতা ও কারণ:

বাংলাদেশের ডিম শিল্পে এন্টিবায়োটিকের ব্যাপক ব্যবহার একটি উদ্বেগজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের খামারগুলোতে এন্টিবায়োটিককে 'সর্ব রোগের মহৌষধ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর পেছনে মূল কারণসমূহ হলো:

১. অপর্যাপ্ত বায়োসিকিউরিটি: বেশিরভাগ খামারে পর্যাপ্ত বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা না থাকায় রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য খামারিরা এন্টিবায়োটিকের উপর নির্ভরশীল।

২. বৃদ্ধি উদ্দীপক হিসেবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার: অনেক খামারিতে কমডোজ এন্টিবায়োটিককে বৃদ্ধি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদিও বাংলাদেশে এটি নিষিদ্ধ, তবে বাস্তবে এর প্রয়োগ কম নয়।

৩. জ্ঞানের অভাব: এন্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, ডোজ এবং প্রত্যাহারের সময়কাল সম্পর্কে অনেক খামারির সচেতনতার অভাব রয়েছে।

৪. সহজলভ্যতা: অনেক খামারিরই এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার, প্রত্যাহারের সময়কাল (ওষুধ বন্ধ করার পর ডিম বা মাংস খাওয়ার জন্য নিরাপদ সময়) এবং এটির দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। পাশাপাশি, প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এন্টিবায়োটিক সহজলভ্য হওয়ায় এর ব্যবহার বেড়েছে।

এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব:

১. **এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ও মানবস্বাস্থ্যে ঝুঁকি:** এটি সবচেয়ে বড় বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য হুমকিগুলোর একটি। মুরগির দেহে নিয়মিত এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো ওই ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এই প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ডিমের মাধ্যমে, মুরগির মলমূত্রের মাধ্যমে মাটি ও পানি দূষণের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে, মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে সেই একই গ্রুপের এন্টিবায়োটিক নেয়, তখন তা আর কাজ করে না। সাধারণ সংক্রমণও তখন চিকিৎসাক্ষেত্রে অচিকিত্স্য হয়ে উঠার ঝুঁকি তৈরি করে।

২. **জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা হ্রাস:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট তাপ চাপ -এ মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। এন্টিবায়োটিক-নির্ভর খামারে মুরগির প্রাকৃতিক প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠে না, ফলে তারা জলবায়ুগত চাপের প্রতি বেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এটি একটি চক্রাকার সমস্যার সৃষ্টি করে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ায় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার বাড়ে, যা আবার মুরগির প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো দুর্বল করে।

৩. **পরিবেশ দূষণ:** এন্টিবায়োটিকের একটি বড় অংশ মুরগির দেহে শোষিত হয় না এবং মলমূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে পরিবেশে মিশে। এটি মাটি ও পানির ইকোসিস্টেম -কে ধ্বংস করে, উপকারী অনুজীবদের মেরে ফেলে এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে পারে। এটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থার পরিপন্থী।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিযোজন কৌশল:

১. **স্মার্ট খামার প্রযুক্তির প্রয়োগ:** জলবায়ু-নিয়ন্ত্রিত শেড: অটোমেটেড বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, কুলিং প্যাড এবং বাষ্পীভবন শীতলীকরণ ব্যবস্থা -এর মাধ্যমে খামারের ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। গবেষণায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করলে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৩০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

ইন্টারনেট অফ থিংস ভিত্তিক মনিটরিং: সেন্সরের মাধ্যমে খামারের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের গুণগতমান রিয়েল-টাইম মনিটরিং করা। এই ডেটা বিশ্লেষণ -এর মাধ্যমে রোগের প্রাদুর্ভাব পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

অটোমেটেড স্যানিটেশন: স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জীবাণুমুক্ত করা সিস্টেমের মাধ্যমে রোগজীবাণুর বিস্তার রোধ করা।

২. **জলবায়ু সহনশীল জাত উন্নয়ন:** স্থানীয় জাতের সংকরায়ন: বাংলাদেশের স্থানীয় জাত যেমন- দেশি মুরগি, যারা প্রাকৃতিকভাবে হিট স্ট্রেস -এ আরো সহনশীল, তাদের সাথে উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের সংকরায়ন করা।

জেনেটিক নির্বাচন: উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মুরগির জেনেটিক নির্বাচন -এর উপর গবেষণা জোরদার করা।

তাপসহিষ্ণু জাতের প্রবর্তন: ইতিমধ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট -এর মাধ্যমে উন্নত কিছু তাপসহিষ্ণু জাত, সোনালী, ইসা ব্রাউন চালু হয়েছে, যা এই দিক থেকে আশাব্যঞ্জক।

৩. **এন্টিবায়োটিকের বিকল্প পদ্ধতিসমূহ:**

ক) **প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক:** প্রোবায়োটিক হলো উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা মুরগির পাচনতন্ত্রে বসবাস করে প্যাথোজেন জীবাণু -এর বৃদ্ধি রোধ করে। প্রিবায়োটিক হলো এই ব্যাকটেরিয়া -দের খাদ্য। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রোবায়োটিক ব্যবহারে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৪০% পর্যন্ত বাড়ে এবং ডিমের উৎপাদন ৫-৮% বৃদ্ধি পায়।

খ) **ফাইটোজেনিক বা হার্বাল সাপ্লিমেন্ট:** তুলসী, নিম, আদা, রসুন-এর মতো ঔষধি গাছ -এর নির্যাস-এ রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুণাগুণ। এই পরিপূরক -গুলি এন্টিবায়োটিকের কার্যকর বিকল্প হতে পারে।

গ) **এনজাইম ও অর্গানিক এসিড:** খাদ্যে এনজাইম যোগ করলে যে পুষ্টিগুণের ব্যবহার বাড়ে এবং অর্গানিক এসিড প্যাথোজেন জীবাণু-এর বৃদ্ধি রোধ করে। এই পদ্ধতিগুলি হজম স্বাস্থ্য -এর উন্নতি ঘটায়।

ঘ) **ভ্যাকসিনেশন ও বায়োসিকিউরিটি:** একটি ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচি হলো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। পাশাপাশি, কঠোর বায়োসিকিউরিটি, খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিতজীবাণুমুক্ত করা ইত্যাদি) মেনে চললে রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে ভাবে কমানো সম্ভব।

৪. **নীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা: প্রাণিজাত পণ্যে এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

খামারিদের প্রশিক্ষণ: এন্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, প্রত্যাহারের সময়কাল এবং বিকল্প পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে খামারিদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গবেষণা উৎসাহিত করা: এন্টিবায়োটিকের বিকল্প পদ্ধতিসমূহের উপর স্থানীয় পর্যায়ে আরো গবেষণা করা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি উন্নত করা।

উপসংহার:

বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৫ বাংলাদেশের ডিম শিল্পের জন্য একটি মাইলফলক- হিসেবে চিহ্নিত হোক। এন্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বৈত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্মার্ট খামার প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল জাত এবং এন্টিবায়োটিকের বিকল্প পদ্ধতিসমূহের একীভূত প্রয়োগই একমাত্র টেকসই সমাধান। সরকার, গবেষক, খামারি এবং শিল্প স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি নিরাপদ, লাভজনক পরিবেশবান্ধব ডিম শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব, যা জাতির পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি এন্টিবায়োটিক-মুক্ত, জলবায়ু-সহিষ্ণু ডিম শিল্প গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিই।

ডিমের খাদ্য নিরাপদতা: বৈশ্বিক মানদণ্ড থেকে বাংলাদেশের বাস্তবতা

ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

ভূমিকা

ডিম পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। বিশ্বজুড়ে বছরে প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন ডিম উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশও ডিম উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশে ২০২২-২৩ সালে প্রায় ২৩.৩৭ বিলিয়ন ডিম উৎপাদিত হয়েছে। দৈনিক হিসেবে ৬৪ মিলিয়ন ডিম উৎপাদিত হয়েছে। অন্য সূত্র অনুযায়ী একজন মানুষের বছরে কমপক্ষে ১০৪টি ডিম খাওয়া উচিত[১]। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রতিজনের একটি করে ডিম (৩৬৫টি প্রতি বছর) খাওয়া উচিত। বাংলাদেশে প্রতি জন বর্তমানে বছরে ১৩৬টি ডিম খেতে পারছে। যেখানে জাপানে একজন মানুষ বছরে প্রায় ৩০০টি ডিম খেয়ে থাকে। ডিমের পুষ্টিগুণ নির্দ্বিধায় প্রশংসনীয় হলেও খাদ্য নিরাপদতা উপেক্ষিত হলে এটি আশীর্বাদের বদলে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

ডিমের পুষ্টিগুণ: কেন এটি সুপারফুড

USDA অনুসারে একটি মাঝারি আকারের ডিম (৫০ গ্রাম) এ থাকে:

- প্রোটিন: ৬.৫ গ্রাম
- চর্বি: ৫ গ্রাম
- ভিটামিন A: দৈনিক প্রয়োজনের ১০%
- ভিটামিন D: ১৫%
- ভিটামিন B১২: ২২%
- সেলেনিয়াম: ২৮%
- কোলিন: ১২৬ মি. গ্রা.

এছাড়া সব অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। এজন্য ডিমকে "পারফেক্ট প্রোটিন সোর্স" (প্রোটিনের আদর্শ উৎস) বলা হয়।

বাংলাদেশে ডিমের খাদ্য নিরাপদতার মূল চ্যালেঞ্জ সমূহ

১. ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ:

- **সালমোনেলা:** বাংলাদেশে খামার ও বাজার থেকে সংগৃহীত ডিমে সালমোনেলা পাওয়া গেছে; গবেষণায় দেখা গেছে ডিমের খোসায় সালমোনেলার প্রাচুর্যতা ০.১% এবং ভেতরের উপাদানে ০.০৭%। পুনঃব্যবহৃত ট্রের কারণে ঝুঁকি বহুগুণ বাড়ছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে[২]।
- **ই. কোলাই:** খামারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাধারণত পাওয়া যায়।

২. অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ:

চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের গবেষণায় ডিমে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ শনাক্ত হয়েছে। এটি দীর্ঘমেয়াদে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) সৃষ্টি করে[৩]। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) বাংলাদেশের পোলট্রি শিল্পের জন্য ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি[৪]। খামার ও বাজার থেকে সংগৃহীত ডিমে সালমোনেলা ও ই. কোলাই এর উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একটি জাতীয় পর্যবেক্ষণ কাঠামো (National Surveillance Network) গঠন প্রয়োজন। নিয়মিত PCR ও ELISA ভিত্তিক দ্রুত পরীক্ষা খাদ্য নিরাপদতা জোরদার করতে পারে[৫]।

৩. রাসায়নিক দূষণ:

বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারে কিছু বিক্রেতা ও পাইকারি সরবরাহকারী ডিমের বাহ্যিক সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নন এডিবল ওয়াক্স (মোম), তেল বা সিলিকন জাত রাসায়নিক ব্যবহার করে থাকে[৬]। এগুলোর অনেকগুলিই মূলত শিল্প-উপযোগী পলিশিং এজেন্ট, যা খাদ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী নয়। এসব পদার্থ শেলের সূক্ষ্ম ছিদ্র (pores) বন্ধ করে দেয়, ফলে ডিমের স্বাভাবিক গ্যাস এক্সচেঞ্জ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয় এবং ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া, বাজারে ব্যবহৃত কিছু অ্যান্টিফাঙ্গাল বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কেমিক্যাল পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা না হলে সেগুলো ভোক্তার জন্য বিষাক্ত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এসব রাসায়নিকের সংস্পর্শ লিভার ও কিডনি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

৪. সংরক্ষণ জনিত সমস্যা:

- WHO: ডিম ৪°C এ রাখলে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত নিরাপদ থাকে।
- বাংলাদেশে খোলা বাজারে ডিম রাখা হয় ৩০-৩৫°C তাপমাত্রায়, যা ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য আদর্শ পরিবেশ।

কোল্ড-চেইন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি:

বাংলাদেশের উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে ডিমের নিরাপদতা রক্ষায় কোল্ড-চেইন অপরিহার্য। ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য "solar-powered evaporative cooling system" কম খরচে কার্যকর সমাধান হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ-নির্ভরতা কমাতে উদ্ভাবনী সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রচলন দরকার।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

- Codex Alimentarius (CAC/RCP 15–1976): HACCP– ভিত্তিক গাইডলাইন, সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণে বায়োসেফটি ।
- EU Regulation ২১৬০/২০০৩: সালমোনেলা নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম বাধ্যতামূলক।
- USDA / FSIS: ধোয়া ডিম ৪°C তে রাখা বাধ্যতামূলক; রান্নার তাপমাত্রা ≤৭১°C রাখা।
- UK / EU: আধোয়া ডিম ২০°C স্থির তাপমাত্রায় রাখা যায় ।

বাংলাদেশের আইনি কাঠামো

- **Food Safety Act 2013:** খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) গঠিত হয়েছে[৭]।
- BFSA Codex এর সাথে স্ট্যান্ডার্ড হারমোনাইজেশনে কাজ করছে।
- সচেতনতা বৃদ্ধিতে "৫টি চাবিকাঠি" প্রচারণা চালানো হচ্ছে: হাত ধোয়া, কাঁচারান্না আলাদা রাখা, সঠিক তাপমাত্রা, নিরাপদ সংরক্ষণ, নিরাপদ পানি/উপকরণ।

ফার্ম টু ফর্ক চেইন

ধাপে ধাপে নিরাপদতা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রেসেবিলিটি ও ডিজিটাল মনিটরিং

ডিমের উৎপাদন, পরিবহন ও বিক্রয় ধাপগুলিতে ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করতে QR কোড বা blockchain প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাচের উৎস, সংরক্ষণ তাপমাত্রা ও মান যাচাই স্বচ্ছভাবে নথিবদ্ধ হবে।

খামার

- বায়োসিকিউরিটি (হাত ধোয়া, ভিজিটর নিয়ন্ত্রণ) নিশ্চিত করা।
- ফিডসোর্স ট্রেসেবিলিটি পর্যবেক্ষণ করা।
- ভেটেরিনারিয়ানের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক নয়; উইথড্রয়াল পিরিয়ড মানা।
- সালমোনেলা ভ্যাকসিনেশন নিশ্চিত করা।

সংগ্রহ পরিবহন

- ফাটা/ময়লা ডিম বাজারজাত না করা।
- ধোয়া ডিম হলে ৪°C কোল্ড-চেইন মেনে চলা।
- ট্রে পুনঃব্যবহার হলে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা।
- ডিম ছায়াযুক্ত, বাতাস চলাচল করে এমন পরিবেশ সংগ্রহ করা।
- সুপারশপে ফ্রিজড ডিসপ্লে বাধ্যতামূলক (ধোয়া ডিম হলে) করা।

ভোক্তা

- রান্নার তাপমাত্রা ≤৭১°C রাখা।
- ফ্রিজের ভিতরের শেলফে রাখা (ডোরে নয়)।
- কাঁচা ডিম ব্যবহার এড়ানো; প্রয়োজনে পাস্তুরাইজড ডিম ব্যবহার।

ভোক্তা শিক্ষা ও আচরণগত পরিবর্তন

খাদ্য নিরাপদতার অন্যতম স্তম্ভ হলো সচেতন ভোক্তা। ভোক্তাদের ফ্রিজে ডিম রাখার সঠিক স্থান (ভেতরের শেলফ, ডোরে নয়) ও সঠিক তাপমাত্রায় রান্না (≤৭১°C) সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান জরুরি[৮]। স্কুল পর্যায়ে 'খাদ্য নিরাপদতা শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত করলে এটি দীর্ঘমেয়াদে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়ক হবে।

বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সতর্কতা

শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক ও ইমিউনোকমপ্রোমাইজড (দূর্বল) ব্যক্তিদের জন্য পাস্তুরাইজড ডিম ব্যবহারই সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প। এই জনগোষ্ঠীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায়, ডিমে উপস্থিত সালমোনেলা বা ই. কোলাই এর মতো ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ দ্রুত মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

পাস্তুরাইজড ডিম ৫৭-৬০°C তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় ধরে উত্তপ্ত করা হয়, যাতে রোগজীবাণু ধ্বংস হয় কিন্তু পুষ্টিমান ও স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে। তাই এটি শিশুখাদ্য, ডেজার্ট, মেওনিজ বা প্রোটিন শেকের মতো কাঁচা ডিম-নির্ভর খাবারে ব্যবহারের জন্য আদর্শ। এছাড়া, গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে সালমোনেলা সংক্রমণ শুধু মায়ের জন্য নয়, ভ্রূণের বিকাশেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বয়স্ক বা ক্রনিক অসুস্থ ব্যক্তিদের (যেমন ডায়াবেটিস বা কিডনি রোগী) কম সিদ্ধ ডিম পরিহার করা উচিত।

সম্ভাবনা: নিরাপদ ডিমের বাজার

- **অর্গানিক ডিম:** রাসায়নিকমুক্ত, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে উৎপাদন।
- **ওমেগা৩ সমৃদ্ধ ডিম:** হৃদরোগ প্রতিরোধে উপযোগী।
- **প্যাকেটজাত ব্যান্ডেড ডিম:** ট্রেসেবিলিটি ও আস্থা তৈরি।
- **এক্সপোর্ট মার্কেট:** নিরাপদ ডিম উৎপাদন করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রবেশ করতে পারে।
- **টেকসই উৎপাদন ও পরিবেশ:** খামার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ফিডের গুণমান ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন নীতি অনুসরণ করে একটি সার্কুলার কৃষি মডেল গঠন করা সম্ভব। এটি ডিম উৎপাদনে টেকসই নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

নীতি প্রস্তাব

- BFSA–এর মাধ্যমে জাতীয় স্যাম্পলিং ফ্রেম চালু করে মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করা।
- অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কড়া মনিটরিং করা।
- সুপারশপে কোল্ডচেইন বাধ্যতামূলক করা।
- প্রতিটি ব্যাচে ট্রেসেবিলিটি কোড থাকা/নিশ্চিত করা।
- ভোক্তা সচেতনতা প্রচারণা হতে পারে– "ডিম নিরাপদ রাখুন, পরিবারকে সুরক্ষিত রাখুন"।

ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

ডিমের বায়োপ্যাকেজিং, প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল (nisin, thymol), ও AMR রিস্ক মডেলিং নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এছাড়া গ্রামীণ নারী খামারিদের জন্য Food Safety Literacy প্রোগ্রাম চালু করলে মাঠপর্যায়ে বড় প্রভাব পড়বে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নীতি-সমন্বয় বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস যৌথ উদ্যোগে খাদ্য নিরাপদতা নীতি উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং কোল্ড-চেইন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে[৯]। এ ধরনের সহযোগিতা বাংলাদেশকে Codex Alimentarius–এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ও মানদণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করছে, যা ভবিষ্যতে ডিম ও পোলট্রি খাতে রপ্তানি সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করবে[১০]।

উপসংহার

বাংলাদেশে ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভরতা আসলেও খাদ্য নিরাপদতা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। Codex অ্যালাইনড আইন বাস্তবায়ন, খামার থেকে ভোক্তা পর্যন্ত কোল্ডচেইন নিশ্চিতকরণ, এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে শৃঙ্খলা আনা গেলে বাংলাদেশ কেবল খাদ্যেই নয়, নিরাপদ খাদ্যেও স্বনির্ভর হতে পারবে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Department of Livestock Services (DLS), Bangladesh. "Livestock Economy at a Glance (Annual Report 2024)." https://dls.gov.bd/site/page/22b1143b-9323-44f8-bfd8-647087828c9b
2. ICDDR, B Ñ Food Safety. https://www.icddrb.org/food-safety
3. Drivers of Antibiotic Use in Poultry Production in Bangladesh (Frontiers). https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2020.00078/full
4. জাতীয় AMR পর্যবেক্ষণ কৌশল (বাংলাদেশ), CDC-BD. https://amr.cdc.gov.bd/wp-content/uploads/2022/03/2020-12-16_Final_National-AMR-Surveillance-Strategy.pdf
5. Antimicrobial Resistance Profile of Foodborne Pathogens (MDPI). https://www.mdpi.com/2079-6382/11/11/1551
6. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে – বিডিনিউজ২৪. https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/bitn4hib1f
7. ``Enhancing Multisectoral Collaboration for Food Safety.'' https://www.who.int/bangladesh/news/detail/13-09-2025-enhancing-multisectoral-collaboration-for-food-safety-in-bangladesh-ihr-event-communication-2025
8. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা: বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Platform-med). https://www.platform-med.org/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D
9. বাংলা নিউজ ২৪– "দেশের ৩৬ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায়." https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1196563.details
10. বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস খাদ্য নিরাপত্তা নীতি সহযোগিতা – জাগো নিউজ ২৪. https://www.jagonews24.com/national/news/995001

নিরাপদ খাদ্য হিসেবে পাস্তুরিত দুধ ও মানুষের স্বাস্থ্য

প্রফেসর ড. মো: জালাল উদ্দিন সরদার, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি

ভূমিকা: দুধ হল স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তন্যগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এক প্রকার সাদা তরল পদার্থ। দুধ মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। প্রতীক হলো- সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং শক্তির প্রতীক। দুধের অন্যান্য খাদ্যগ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠার আগে এটিই হল স্তন্যপায়ী (মানুষসহ যারা স্তন্যদুগ্ধপানকারী) বাচ্চাদের পুষ্টির প্রধান উৎস। স্তন থেকে দুগ্ধ নিঃসরণের প্রাথমিক পর্যায়ে কোলোস্ট্রাম সমৃদ্ধ শাল দুধ উৎপন্ন হয়, যাতে মায়ের দেহ হতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাচ্চাদের দেহে নিয়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত হবার ঝুঁকি কমায়। আন্তঃপ্রজাতির দুধ গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে, যারা অন্য অনেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধও গ্রহণ করে। যেমন মানুষ গরুর দুধ খায়। বহুবিদ কারণে একজন মানুষের প্রতিদিন দুধ পান করা উচিত। দুধ ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের উৎস। দুধে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ওমেগা থ্রি, ওমেগা সিক্সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দুধকে বলা হয় সুপার ফুড। এতে আছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ, যা শরীরের জন্য জরুরি। এতে প্রচুর ভিটামিন বি-১২ আছে, যা মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজন। দুধ শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া দেহের টিস্যু ও কোষ মেরামতের জন্য দারুণ উপকারী।

এক নজরে দুধের উপকারিতা:

- কম চর্বিযুক্ত দুধ মস্তিষ্কের স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিতে এবং আলঝেইমার রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। দুধ ভিটামিন বি ১২ এর একটি ভাল উৎস, চিন্তা শক্তি বজায় রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন। যাদের ভিটামিন বি-১২ এর অভাব থাকে তাদের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্কুলগামী শিশু বা ৬০ বছর বয়সী মানুষকে কম চর্বিযুক্ত দুধ পানের মাধ্যমে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ানো যায়। দুধ বার্ধক্যজনিত জ্ঞান হ্রাস থেকেও রক্ষা করে।
- দুধ ওজন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুধ ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এর একটি ভাল উৎস যা শরীরে চর্বি পোড়ানোতে প্রভাব ফেলে। দুধে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং পানি থাকে যা আপনার পেটকে দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখে। এছাড়াও, এতে রয়েছে কনজুগেটেড লিনোলিক অ্যাসিড, যা মোটা ব্যক্তিদের অতিরিক্ত চর্বি থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। ওজন কমাতে প্রতিদিন স্কিম দুধ পান করা যেতে পারে।
- দুধে আছে প্রচুর পরিমানে ক্যাসলিয়াম ও ভিটামিন ডি যা আমাদের শরীরের হাড় ও পেশিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খেলে আমাদের হাড় মজবুত ও শক্তিশালী হবে।
- দুধ শরীরের শক্তি যোগায় এবং ক্লান্তি দুর করে। শরীরে শক্তি যোগাতে দুধের উপকারিতা অনেক। মানুষ প্রতিদিন কত কাজেই না ব্যস্ত থাকে। এতে আমাদের শরীর অনেক ক্লান্ত হয়ে পরে। যদি নিয়মিত দুধ খেতে পারেন তাহলে এই ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। গরুর দুধে আছে ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও ফসফরাস সহ নানান পুষ্টিগুন।
- দুধে থাকা পুষ্টিগুন আমাদের মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করে। যদি প্রতিদিন দুধ পান করা হয় তাহলে আমাদের ক্লান্তিগুলো দূর হয়ে যাবে ফলে মন এবং শরীর তাজা থাকবে। তাই আমাদের প্রতিদিন দুধ খাওয়া অভ্যাস করা উচিত।
- প্রতিদিন দুধ খেলে হার্ট ভাল থাকে। কম ফ্যাট যুক্ত দুধ খেলে রক্তে ভালো কোলেস্টেরলের পরিমান বৃদ্ধি পায় ও খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে। হার্ট ভাল রাখতে প্রতিদিন দুখ পান করুন।
- ডায়াবেটিসের সমস্যা কমাতে দুধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুধে ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডিতে ভরপুর। যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা যদি প্রতিদিন দুধ খায় তাহলে এই সমস্যা কমবে তবে কম ফ্যাট যুক্ত দুধ খেতে হবে।
- পেটের সমস্যা ও অ্যাসিডিটি কমাতে দুধের উপকারিতা অনেক। দুধে থাকা ক্যাসলিয়াম ও ভিটিমিন ডি সমস্যা ও অ্যাসিডিটি দুর করে কিন্তু লো ফ্যাট যুক্ত দুধ খাওয়া উচিত।
- অনেকেরই রাতে ঘুম হয় না। রাতে ঘুম ভাল করতে গরম দুধ খুবই উপকারি একটি খাদ্য। ঘুমানোর আগে এক গ্লাস গরম দুধ পান করুন দেখবেন ঘুম ভাল হচ্ছে।
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের দাঁত ক্ষয় হতে শুরু করে। অনেকেরই আবার ছোট থেকেই ক্ষত শুরু হয় যা দুধে থাকা ক্যালসিয়াম হাড়ের পাশাপাশি দাঁতের ক্ষয় রোধ করে এবং দাঁত ভাল রাখে।
- গবেষনায় জানা যায় দুধ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। তাই যারা স্ট্রেসে ভুগছেন তারা প্রতিদিন অন্তত এক গ্লাস করে দুধ পান করা উচিত।
- দুধ ত্বককে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখে। নিয়মিত লো ফ্যাট দুধ খেলে ত্বক কম ফাটে, এর কারণ হল কম ফ্যাট যুক্ত দুধে থাকে ট্রাই-গ্লিসারাইড। নিয়মিত ত্বকে দুধ লাগালে ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল কমে যায়।

- দুধ চুলকে স্বাস্থ্যকর করে।
- দুধ পাকস্থলী পরিষ্কার রাখে এবং হজম শক্তি বাড়ায়। দুধ যেহেতু পানীয় খাবার তাই এটি খুব সহজেই পাকস্থলী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। যাদের হজমে সমস্যা তারা নিয়মিত দুধ খাওয়ার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।
- দুধ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। দুধে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ডি থাকার জন্য আমাদের শরীরের কোষের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা যায় যে যে দুধ ওভারিয়ান ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
- দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দুধে থাকা ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- দুধ গলা ব্যথা কমায়। গলা ব্যথা অনুভব হলে এক কাপ গরম দুধ ব্যথা উপশম করতে সাহায্য করে।

দুধ খাদ্য হিসেবে কতুটুকু নিরাপদ?

অনাদিকাল থেকেই দুধ সকল পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্দশ্য খাদ্য যা জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সকল মানুষের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। এ কারণে সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে দুধের সার্বিক গুণাগুণ রক্ষা করা একান্ত অপরিহার্য। অবস্থাভেদে সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি দুধ অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আর পদ্ধতিতে উৎপাদিত দুষিত দুধ জন স্বাস্থ্যও জন্য হানিকর কিংবা জীবননাশের অন্যতম কারণ হতে পারে। সর্বজন স্বীকৃত এরুপ বিশেষ বিবেচ্য কারণে নিরাপদ দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক যেমন-ভালো জাতের অধিক উৎপাদনকারী সুস্থ্য গাভী, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, নির্ভেজাল সুষম খাদ্য, উন্নত পালন পদ্ধতি, দুধ দোহন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, গুনগত মান রক্ষণ এবং সর্বোপরি সর্ব পর্যায়ে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। এতোকিছুর পর দুধ বিভিন্ন উপায়ে জীবানু দ্বারা দুষিত হতে পারে যেমন- দুধ দোহন, মাপামাপি, পরিবহন, সংরক্ষণের সময়, গাভী ও দোহণকারীর শরীর এবং বাতাস বা পাত্রের মাধ্যমে। এছাড়াও ময়লাযুক্ত ওলান ও ওলানের রোধ-ব্যাধি যেমন-ম্যাসটাইটিস, দুগ্ধজ্বর এর কারণে দুধ দুষিত হতে পারে।

দুধ সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও পরজীবি দ্বারা সংক্রামিত হয়ে থাকে। তবে দুধ দুষিত হওয়ার প্রধার কারণ হলো-ব্যাকটেরিয়া। দুধে উপকারী ও ক্ষতিকর দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। উপকারী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস প্রধান যা দৈই তৈরীতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, কাঁচা দুধে সালমোনেলা, ই কলাই, টিউবারকুলোসিস এবং লিস্টোরিয়া এর মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, যা অসুস্থতা ঘটাতে পারে। আমাদের দেশে দুধ সাধারনত গরু ও মহিষ থেকে সংগ্রহ করা হয়। দুধ খামারীর নিকট হতে ফ্রেস বা কাঁচা দুধ সংগ্রহ করে সংগে সংগে বা ফ্রিজে রেখে তা জ্বাল দিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়া মিল্ক ভিটা, ব্র্যাক, প্রাণ ডেইরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে প্যাকেটজাত দুধ পাওয়া যায় যা শহর অঞ্চলের কিছু কিছু মানুষ তা খেয়ে থাকে। তবে বেশীভাগ মানুষের বিশ্বাস সরাসরি গরু বা ফার্ম থেকে দুধ সংগ্রহকে খাঁটি বলে মনে করেন। তবে প্রশ্ন হলো খামারের টাটকা দুধ, দোকানের প্যাকেটজাত দুধ নাকি টেট্রা প্যাকের দুধ, কোনটা শরীরের জন্য বেশি নিরাপদ? অনেকটা সেই প্রশ্নেরই উত্তর অনেকেই আমরা জানি না।

কোন ধরনের দুধ আমাদের জন্য অধিক নিরাপদ?

দুধ ফুটিয়ে খাওয়ার ফলে ভিটামিন (বিশেষ করে বি ভিটামিন) এবং প্রোটিন সহ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান কমে যেতে পারে এবং এর স্বাদ এবং গঠন পরিবর্তন হতে পারে। অতিরিক্ত ফুটিয়ে প্রোটিনকে বিকৃত করতে পারে, যার ফলে হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং পেটে অস্বস্তি হয়। তবে, ফুটিয়ে কাঁচা দুধ থেকে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াও দূর করে। ফুটন্ত দুধ সরাসরি ক্ষতিকর না হলেও, এটি দুধের পুষ্টিগুণ কমাতে পারে এবং অতিরিক্ত পরিমান খাওয়া হলে শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি ঘটতে পারে যেমন- ভিটামিন সি, আয়রন এবং ফাইবার। এছাড়াও ফুটানো দুধের স্বাদ ভিন্ন হতে পারে এবং এর গঠন পরিবর্তন হতে পারে। দুধের গুণমান এবং দুধে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সঠিক রাখতে এবং ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে দুধ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর দুধ সংরক্ষণের যুগান্তকারী ধারণাটি দেন ১৮৬৫ সালে। দুধ উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে খুব দ্রুত তা ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করার সূত্র আবিষ্কার করেন তিনি। এই প্রক্রিয়াকে পাস্তুরিতকরণ বলা হয়।

দুধ কেন পাস্তুরিত করা হয়?

পাস্তুরাইজেশন হল একটি গরম করার প্রক্রিয়া যা খাবার এবং পানীয় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে দুধ খাওয়ার জন্য নিরাপদ। ১৮৮৬ সালে প্রথম দুধের জন্য প্রস্তাবিত, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল কাঁচা দুধে সাধারণত যে জীবাণুগুলি বাহিত হয়, যেমন- যক্ষা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। আজও দুধের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পাস্তুরাইজেশন অব্যাহত রয়েছে। এই প্রক্রিয়াটির নামকরণ করা হয়েছে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের নামে, যিনি ১৮৬০-এর দশকে দেখিয়ে ছিলেন যে ওয়াইন এবং বিয়ার গরম করলে তা নষ্ট হওয়া রোধ করে। ১৮৮৬ সালে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রাঞ্জ ভন সক্সলেট পরামর্শ দেন যে ভোক্তাদের সুরক্ষার জন্য দুধকেও পাস্তুরিত করা উচিত। ১৯২০-এর দশকের মধ্যে পাস্তুরিতকরণ অনেক দেশে আদর্শ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল এবং শিশুমৃত্যু এবং দুধবাহিত মহামারী কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পাস্তুরাইজেশন প্রক্রিয়া

কাঁচা দুধে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বা রোগজীবাণু থাকতে পারে যা অসুস্থতার কারণ হতে পারে। পাস্তুরাইজেশন কাজ করে দুধকে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় অল্প সময়ের জন্য গরম করে এবং তারপর আবার ঠান্ডা করে, যা দুধকে জীবাণুমুক্ত না করে বা এর মৌলিক গুণাবলী পরিবর্তন না করেই এই জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে। সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি, যাকে বলা হয় উচ্চ-তাপমাত্রা-স্বল্প-সময় (HTST) পাস্তুরাইজেশন, দুধকে প্রায় 72°C (162°F) তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ডের জন্য গরম করে। আরেকটি পদ্ধতি, অতি-উচ্চ-তাপমাত্রা (UHT) পাস্তুরাইজেশন, দুধকে 138-150°C (280-302°F) এর উপরে কয়েক সেকেন্ডের জন্য গরম করে। বর্তমানে গ্রহণযোগ্য আল্ট্রা হাই টেম্পারেচার বা ইউএইচটি পদ্ধতি পাস্তুরিত করার একটি রূপ। এই পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফ্রিজ ছাড়াই সংরক্ষণ করা যায় দুধ। ইউএইচটি পদ্ধতিতে দুধ ১৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চার সেকেন্ড গরম করে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করার পর দ্রুত ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা হয়। ৬টি স্তরে তৈরি বিশেষ প্যাকে প্যাকেজিং করা হয়। ফলে বাতাস, আর্দ্রতা ও সূর্যালোক এই ছয় স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই এটি নিশ্চিত করে যে যতক্ষণ প্যাকটি খোলা না হবে, ততক্ষণ দুধ নষ্ট হবে না।

ইউএইচটি দুধ প্রস্তুতের আরেকটি প্রক্রিয়া হচ্ছে রিকনস্টিটিউশন বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ। অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় এটি পাউডার দুধের সঙ্গে যথাযথ অনুপাতে পানির মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এটি উচ্চমানসম্পন্ন ও সাধারণ দুধের মতোই পুষ্টিকর। অতিসম্প্রতি বৈশ্বিক ডেইরি সমবায় আরলা ফুডস একই প্রক্রিয়ায় দেশে 'ডানো রেডি' ব্র্যান্ডের ইউএইচটি দুধ বাজারজাত করেছে।

নতুন পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি

খাবারের পুষ্টিকর এবং সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব কমাতে এবং তাপ-ক্ষয়কারী পুষ্টির অবক্ষয় রোধ করার জন্য খাবারের পাস্তুরাইজেশনের জন্য নতুন প্রক্রিয়া, তাপীয় এবং অ-তাপীয়, তৈরি করা হয়েছে। পাস্তুরাইজেশন বা উচ্চ চাপ প্রক্রিয়াকরণ (HPP), স্পন্দিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র (PEF), আয়নাইজিং বিকিরণ, উচ্চ চাপের পাস্তুরাইজেশন, ঠণ্ড দূষণমুক্তকরণ, স্পন্দিত উচ্চ তীব্রতা আলো, উচ্চ তীব্রতা লেজার, স্পন্দিত সাদা আলো, উচ্চ ক্ষমতার আল্ট্রাসাউন্ড, দোলনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র, উচ্চ ভোল্টেজ আর্ক ডিসচার্জ এবং স্ট্রিমার প্লাজমা হল এই অ-তাপীয় পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতির উদাহরণ যা বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোওয়েভ ভলিউমেট্রিক হিটিং (MVH) হল নতুন পাস্তুরাইজেশন প্রযুক্তি। এটি তরল, সাসপেনশন বা আধা-কঠিন পদার্থকে একটানা প্রবাহে গরম করার জন্য মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে। যেহেতু MVH একটি প্রবাহিত পণ্যের পুরো শরীরে সমানভাবে এবং গভীরভাবে শক্তি সরবরাহ করে, তাই এটি মৃদু এবং স্বল্প সময়ের জন্য গরম করার সুযোগ দেয়, যার ফলে দুধের প্রায় সমস্ত তাপ-সংবেদনশীল পদার্থ সংরক্ষণ করা হয়।

পাস্তুরাইজেশনকৃত তরল দুধের সুবিধাসমূহ:

- এ ধরনের দুধের স্বাদ ও গন্ধ সাধারণ তরল দুধের মতো। এটি উৎপাদনের সময় খুবই অল্প সময়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয়। অল্প কিছু পুষ্টি উপাদান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও তা তাপমাত্রা প্রয়োগের আগেই ফর্টিফাইড করে নেওয়া হয়। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি সাধারণ তরল দুধের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর হয়ে থাকে।
- এই দুধ সংরক্ষণে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় না। তবু প্যাকেট না খোলা অবস্থায় একটি শুকনো, ঠান্ডা ও পরিষ্কার জায়গায় ছয় মাস পর্যন্ত নিরাপদ থাকে।
- যেসব এলাকায় সরবরাহ কিংবা হিমায়ন (রেফ্রিজারেশন) বা পরিবহনের জন্য স্থানীয় তরল দুধ সহজলভ্য নয়, সেসব এলাকায় ইউএইচটি তরল দুধ খুব সহজে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ফলে এর প্রাপ্যতা সহজ।
- ইউএইচটি দুধের বড় সুবিধা হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্যাকেট খুলে নিরাপদে সরাসরি পান করা যায়। আলাদা করে ফোটানো বা গরম করার প্রয়োজন হয় না। ১৮ মাসের ওপরে সবার জন্য এই দুধ নিরাপদ। সরাসরি খাওয়া এবং দুধ দিয়ে তৈরি হয় এমন যেকোনো খাবারের জন্য ইউএইচটি দুধ সহজে ব্যবহার করা যায়।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পাস্তুরাইজেশন দুধের প্রধান পুষ্টিগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না। প্রোটিন, চর্বি এবং খনিজ পদার্থ অপরিবর্তিত থাকে এবং ভিটামিন সি-এর মতো কিছু তাপ-সংবেদনশীল ভিটামিনের সামান্য ক্ষতি হয়। যেহেতু দুধ ভিটামিন সি-এর একটি প্রধান উৎস নয়, তাই এই ক্ষতির পুষ্টির উপর খুব কম প্রভাব পড়ে। পাস্তুরাইজড দুধ ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে চলেছে।

- রেফ্রিজারেটেড পাস্তুরাইজড দুধের শেল্ফ লাইফ কাঁচা দুধের চেয়ে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ-তাপমাত্রা, স্বল্প-সময় (HTST) পাস্তুরাইজড দুধের রেফ্রিজারেটেড শেল্ফ লাইফ সাধারণত দুই থেকে তিন সপ্তাহ থাকে, যেখানে অতি-পাস্তুরাইজড দুধ অনেক বেশি সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে, কখনও কখনও দুই থেকে তিন মাস। যখন অতি-তাপ চিকিৎসা (UHT) জীবাণুমুক্ত হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার প্রযুক্তির (যেমন অ্যাসেপটিক প্যাকেজিং) সাথে একত্রিত করা হয়, তখন এটি ৯ মাস পর্যন্ত ফ্রিজে না রেখেও সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- এইচএসিসিপি অনুসরণ করার কারণে প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণু সংক্রমণের কোনো সুযোগ নেই। তাই ইউএইচটি দুধ পানের জন্য নিরাপদ। হাসপাতালে থাকা অসুস্থ ব্যক্তিদের দুধ ফুটিয়ে পান করানোর সুযোগ কম থাকে। সে ক্ষেত্রে ইউএইচটি দুধ তাদের জন্যও নিরাপদ।

উপসংহার

প্যাকেট তরল দুধ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের মনেই একটি নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত আছে যে তরল প্যাকেট দুধ প্রকৃত গরুর দুধের চেয়ে কম পুষ্টিমানসম্পন্ন এবং এতে ক্ষতিকর উপাদান থাকে। এ ধারণা ঠিক নয়। সঠিক সময় এবং তাপমাত্রা অনুসরণ করতে পারলে সাধারণ তরল দুধের মতোই ইউএইচটি দুধও নিরাপদ এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন থাকে। ইউএইচটি তরল দুধে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান প্রয়োজনীয় অনুপাতে থাকে, তাই এটি স্বাস্থ্যকর। এ ধরনের তরল দুধ উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালো এইচএসিসিপি মেনে চলা হয়। তাই এই পদ্ধতিতে দুধের মধ্যে কোনো অণুজীব প্রবেশের সুযোগ নেই। সহজ সংরক্ষণ পদ্ধতি ও সহজ প্রাপ্যতার কারণে ইউএইচটি দুধের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে দুধের কিছু পুষ্টি উপাদান ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই শুরুতে সেসব পুষ্টি উপাদান তরল দুধে ফর্টিফাইড করা হয়। ফলে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষেও দুধের গুণাগুণ অটুট থাকে। পাস্তুরিত দুধ নিরাপদ, কেননা পাস্তুরিকরণে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়। অতি উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় অণুজীব জন্মাতে ও বংশবিস্তার করতে পারে না। পাস্তুরিকরণ পদ্ধতিতে দুধের পচন ঘটানোর জন্য দায়ী অণুজীবকে তাপ দিয়ে (62.8°C তাপে ৩০ মিনিট, 72.2°C তাপে ১৫ সেকেন্ড এবং 137.80° C তাপে ২ সেকেন্ড) ধ্বংস করা হয়। ফলে ল্যাকটিক এসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুর (যেমন- স্ট্রেপটোকক্কাই) সংখ্যা কমে যায়। পাস্তুরিকরণে দুধের পুষ্টিমান ঠিক থাকে এবং কোনো বিস্বাদের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং আমরা টাটকা দুধের উপর নির্ভরতা কমিয়ে পাস্তুরিত দুধ অধিক নিরাপদ হওয়ায় নিশ্চিন্তে গ্রহণ করতে পারি।

বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবেলা ও খাদ্য অপচয়রোধে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী, খাদ্য প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষক ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতে বর্তমানে বিশ্ব এখন ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এ তালিকায় সবচেয়ে কঠিন হুমকীর মধ্যে পড়েছে যা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে বেরিয়ে এসেছে। চাহিদার তুলনায় প্রতিনিয়ত কৃষিপণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে হিমসিম খেতে হচ্ছে যেখানে কৃষিই অর্থনীতির একমাত্র চালিকাশক্তি ও শিল্প হিসেবে বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নত দেশগুলোর রপ্তানি ও শুল্কনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি, ভূরাজনীতি, কৌশলগত কারণে উন্নতদেশগুলোর যুদ্ধে জড়িয়ে পরাসহ করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক টানাপোড়ান মোকাবেলা কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পুরো বিশ্বকে খাদ্য চাহিদা ও সংকট মোকাবেলায় টাল-মাটাল করেছে। জাতিসংঘের ৫ টি সংস্থা-এফএও, ইফাদ, ডব্লিউএফপি, ডব্লিউএইচও এবং ইউনিসেফ এর গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস ২০২৫ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ তীব্র খাদ্য সংকটের শীর্ষ ১০ টি দেশের মধ্যে রয়েছে যা আমাদের জন্য ভবিষ্যতের প্রস্তুতিকে ইঙ্গিত করছে। যদিও যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য আমাদের মজুদ রয়েছে। তবুও প্রাকৃতিক দূর্যোগ তথা ঝড়, বৃষ্টি, খরা ও জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষিকে প্রতিনিয়ত হুমকীর মধ্যে রেখেছে। শুধুমাত্র খাদ্য সংকটই নয় সুষম খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও সার্বিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দশকে কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত থাকলেও এখনও ৭ কোটি ৭১ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য সম্মত খাবার গ্রহণ থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মানুষই অপুষ্টির শিকার হচ্ছে যা জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এর তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষিতে দেশের সাফল্য অভূতপূর্ব এবং দৃশ্যমান যা বিশ্ববাসীকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কৃষি উৎপাদনে অনেক ফসলের সফলতা সারা বিশ্বে শীর্ষ ১০ এর মধ্যে বিদ্যমান।

বিশ্বে বর্তমানে ৫৩ টি দেশের ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখী অবস্থানে রয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবারের অর্থ সংকটের কারণে খাদ্য ক্রয়ের অক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীর্ষ ৩টি দেশের মধ্যে নাইজেরিয়া, সুদান ও কঙ্গোপ্রজাতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ফিলিস্থিনের গাজা উপত্যকা শীর্ষ খাদ্য সংকটে রয়েছে যা চলমান ইযরাইলের দখলদারিত্ব পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এখানে শতভাগ মানুষই চরম খাদ্য সংকটে ভুগছে। এর পরে রয়েছে দক্ষিণ সুদান ও সুদানের অর্ধেকের বেশি এবং ইয়েমেন ও হাইতির অর্ধেক জনসাধারণ। পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য বিবেচনায় সবচেয়ে শীর্ষে রয়েছে পাকিস্থান যেখানে ৬০ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। গত দুই দশকে কিছুটা কমিয়ে বর্তমানে ৪৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি ৭১ লক্ষ মানুষ এ সুবিধা পাচ্ছে না। ভারত রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে অর্থাৎ ৪০ শতাংশ মানুষ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার থেকে বঞ্চিত। এ দিক থেকে ভুটানের মাত্র ৪ শতাংশ ও নেপালের ২০ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ মালদ্বীপের মানুষ এ সুবিধা পাচ্ছে না। উক্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়েছে যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অপুষ্টিজনিত কারণে ওজন কম হওয়ার হার বাংলাদেশে ১০ শতাংশ, ভারতে ১৮ শতাংশ ও পাকিস্থানে ৭ শতাংশ। আমাদের দেশে এ বয়সী শিশু খর্বকায় কমপক্ষে ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতে ৩৩ শতাংশ এবং পাকিস্থানে ৩৭ শতাংশ। এ দিক থেকে নেপাল ও শ্রীলংকা এগিয়ে রয়েছে। নেপাল মোট জনসংখ্যার ৫.৩ শতাংশ এবং শ্রীলংকা ৭.৪ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। যথাযথ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যথেষ্ট খাদ্য থাকলেও খাদ্যের সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকায় খাদ্য সংকট হচ্ছে। আবার নিরাপদ খাদ্য বা স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যেও অভিগম্যতার সমস্যা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে গত কয়েক দশকে কৃষি তথা খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে এবং মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদস্বত্ত্বেও ফসলের পর্যাপ্ত সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ও খাদ্য অপচয়ের কারণে খাদ্য সংকট বা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যা বিভিন্ন জরিপে প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশের মানুষ ক্রয়ক্ষমতার সক্ষমতা অনুসারে সুষম খাদ্য পেতে জনপ্রতি ৪ দশমিক ৪৯ ডলার ব্যয় করে যা একজন মানুষের দৈনিক ২৩৩০ কিলোক্যালরি শক্তির চাহিদা পূরণ করে। এখানে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী খাদ্য ক্রয় করাকে বুঝানো হয়েছে। গত বছরের যা ছিল ৪ দশমিক ৩৩ ডলার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এক্ষেত্রে ভুটান শীর্ষে রয়েছে। সার্বিক দিক থেকে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় একদিকে যেমন খাদ্য অপচয় কমানো অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষির যে ক্ষতি হচ্ছে সে অনুযায়ী গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে খাপ-খাওয়ানোর উপযোগী ফসলের জাত একদিকে যেমন উদ্ভাবন করা অপরদিকে উচ্চফলনশীল ফসলের সম্প্রসারণ বাড়ানো এবং ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তৈরি করা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের কৃষিখাত যা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে। খাদ্য সংকট মোকাবেলা ও খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য অপচয়রোধের পরিকল্পনার বিকল্প নেই। ফসল উৎপাদন থেকে স্থানান্তর পর্যন্ত প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের অপচয় হচ্ছে যা আমাদের দেশে মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ এবং অর্থনৈতিক বিচারে ত্রিশ হাজার কোটি টাকার উপরে যা খুবই উদ্বেগজনক।

উৎপাদন, বাজারজাত, প্রক্রিয়াজাত, বিপণন ও খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিস্তরে জনসচেতনতা সৃষ্টি এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এর তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর অপচিত খাবারের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন যার অর্থনৈতিক মূল্য ২৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার। বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে আমরা খাবার নষ্ট করে থাকি। এ খাবারগুলোর অধিকাংশই যায় ময়লার ঝুড়িতে। তবে জনসাধারণকে সচেতন করা গেলে খাবার নষ্ট হওয়াকে কিছুটা কমানো সম্ভব। এতে অল্প পরিমাণে কমলেও পরবর্তীতে অন্যের নিকট দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। আবার খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ বা নষ্ট হওয়া খাবার জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট যেমন কমবে তেমনি মাটির স্বাস্থ্যও কিছুটা সমৃদ্ধ হবে। মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করেই খাবার উপযোগি হয়েছে।

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ইউনেপের ২০২৪ তথ্য অনুযায়ী খাদ্য অপচয় বেড়েছে ৩৫ লক্ষ টন। ইউনেপের চলতি বছরের প্রতিবেদন বলছে আমাদের দেশে বাসাবাড়িতে একজন ব্যক্তি প্রতিবছর ৮২ কেজি পরিমাণ খাবার নষ্ট করে থাকে যা ২০২১ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক ১৭ কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ আয়ের পরিবার মাসিক মাথাপিছু ২৬ কেজি খাবার অপচয় বা নষ্ট করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও ভারত আমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এ বিপুল পরিমাণে খাদ্য অপচয় জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শঙ্কা তৈরি করেছে। জাতিসংঘের ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে একটি হচ্ছে খাদ্যের অপচয় কমানো। এখানে ১২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যের অপচয় অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।

খাদ্য সংগ্রহ থেকে রান্না করা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে থাকে। উৎপাদন থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ খাবার নষ্ট হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক নিরাপদ খাদ্য ফোরাম এবং এফএও এর গবেষণা প্রতিবেদন জুন ২০২৪ থেকে জানা যায় উৎপাদন থেকে আমাদের খাবার টেবিলে পৌঁছাতেই প্রায় ১৮ শতাংশ দানা শস্য নষ্ট হয় এবং ফল ও সবজি থেকে ১৭-৩২ শতাংশ পর্যন্ত অপচয় হয়ে থাকে। অপরপক্ষে বাড়ী বা পরিবার থেকে ৬১ শতাংশ, হোটেল বা রেস্তোরা থেকে ২৬ শতাংশ এবং বাকী অংশটুকু নষ্ট হচ্ছে বিক্রয় প্রতিষ্ঠান, সুপারশপ, দোকান ও বাজার থেকে।

এদিকে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্ষুধার্থ মানুষের সংখ্যাও। গত ২০১৪ সাল থেকে পৃথিবীতে ক্ষুধার্থ মানুষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এফএও এর তথ্য মতে পৃথিবীতে প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন মানুষ চরমভাবে প্রতিদিন ক্ষুধার সম্মুখীন হচ্ছে। কাজেই খাদ্যের পরিমিত ব্যবহার, যথাযথ ক্রয় পরিকল্পনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অপচয় কমানো সম্ভব। শুধুমাত্র এক-চতুর্থাংশ খাবার নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে ৮৭০ মিলিয়ন মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

কৃষি উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত যথাযথ পরিচর্যা, উপযুক্ত সংগ্রহোত্তার ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অপচয় কমানোর যথাযথ সুযোগ রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে এ ক্ষেত্রে খাদ্য সংরক্ষণের বিশেষায়িত সংরক্ষণাগার, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, মোড়কজাতকরণ, প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তর এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ সামগ্রীকভাবে পুরো ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং খাবার অপচয়রোধে জাতীয় পরিকল্পনা (ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি) তৈরি ও বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত জনসচেতনা সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ ও যথাযথ পরিকল্পনা খাদ্য অপচয়রোধে তথা খাদ্য সংকট মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তায়ও অবদান রাখবে।

অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত মাছ উৎপাদন: খাদ্য নিরাপত্তায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

প্রফেসর ড. শেখ আহমাদ আল নাহিদ, ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২
সাইফুদ্দিন রানা, প্রভাষক, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২
অন্তর সরকার, প্রভাষক, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২
মুহাম্মদ শাকিল খান, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বর্তমানে বৈশ্বিক মাছ উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দেশের মোট প্রাণিজ প্রোটিনের প্রায় ৬০ শতাংশই আসে মাছ থেকে। ফলে মাছ শুধু একটি খাদ্য নয়, বরং জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্যচাষে অ্যান্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত মাছ উৎপাদন এখন সময়ের দাবি, যা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও তার পটভূমি

মৎস্যচাষে অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত মাছের রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত বৃদ্ধি এবং উচ্চ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যেমন এ্যারোমোনাস, ভিব্রিও, এডওয়ার্ডসিয়েলা সংক্রমণ রোধে ব্যবহৃত হয় অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, সালফোনামাইড, ইরিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি ওষুধ। কিন্তু এ ধরনের ওষুধের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাছের শরীরে অবশিষ্টাংশ রেখে যায় (antibiotic residue), যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। অতিরিক্তভাবে, এই অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার মাছের মাইক্রোবায়োম পরিবর্তন করে পরিবেশে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া (antimicrobial resistance-AMR) ছড়িয়ে দেয়, যা শুধু মানুষ নয়, প্রাণী ও বাস্তুতন্ত্রের জন্যও বিপজ্জনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ আগামী দশকে বৈশ্বিক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রভাব: স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি

১. **মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি:** মাছের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে মানুষের শরীরে ওষুধের প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এতে সাধারণ সংক্রমণও জটিল হয়ে যায় এবং প্রচলিত চিকিৎসা অকার্যকর হতে পারে।

২. **খাদ্যের মানহানি:** অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ মাছের স্বাদ, গুণমান এবং রপ্তানিযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক দেশ অ্যান্টিবায়োটিক অবশিষ্টাংশযুক্ত মাছ আমদানি নিষিদ্ধ করেছে।

৩. **পরিবেশ দূষণ:** অপ্রয়োজনে ব্যবহৃত ওষুধ পানির মাধ্যমে পুকুর, নদী ও মাটিতে মিশে যায়, যা অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর।

৪. **অর্থনৈতিক ক্ষতি:** আন্তর্জাতিক মান না থাকায় অনেক সময় বাংলাদেশি মাছের রপ্তানি ব্যাহত হয়, যা জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত মৎস্যচাষের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে "নিরাপদ মাছ উৎপাদন" এখন অন্যতম অগ্রাধিকার। অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত উৎপাদন শুধু রোগমুক্ত মাছই নয়, বরং স্বাস্থ্যকর, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার প্রতীক। এটি SDG লক্ষ্য ২ (ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব) ও লক্ষ্য ১২ (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন) বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত মাছ উৎপাদনের কৌশল ও প্রযুক্তি

১. **প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক ব্যবহার:** অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে প্রোবায়োটিক (*Bacillus subtilis, Lactobacillus* spp. ইত্যাদি) ব্যাকটেরিয়া মাছের পরিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি দমন করে এবং পানির গুণমান উন্নত করে। প্রিবায়োটিক উপাদান (যেমন ইনুলিন, ওলিগোস্যাকারাইড) মাছের অন্ত্রের উপকারী জীবাণুকে সক্রিয় রাখে।

২. বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা: অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এড়াতে প্রথম পদক্ষেপ হলো বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখা। এর মধ্যে রয়েছে-

- পুকুর প্রস্তুতির আগে জীবাণুনাশক প্রয়োগ
- পানির গুনগত মান পর্যবেক্ষণ (pH, DO, তাপমাত্রা ইত্যাদি)
- নতুন মাছ ছাড়ার আগে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা
- বন্য প্রাণী বা বাহক থেকে মাছকে বিচ্ছিন্ন রাখা

৩। **রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবহার:** কিছু ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধে ফিশ ভ্যাকসিন ব্যবহার একটি কার্যকর বিকল্প। গবেষণায় দেখা গেছে, টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগের প্রকোপ ৬০-৮০% পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

৪। **প্রাকৃতিক ও ভেষজ প্রতিকার:** নিমপাতা, হলুদ, রসুন, আদা, তুলসী ইত্যাদি ভেষজ উপাদান মাছের রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। যেমন-রসুনে থাকা allicin উপাদান প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে, যা মাছের বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৫। **ইকো-ফ্রেন্ডলি ইনটিগ্রেটেড সিস্টেম:** "ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-ট্রফিক অ্যাকুয়াকালচার (IMTA)" পদ্ধতিতে মাছ, শামুক, শৈবাল একসাথে চাষ করলে পানির গুণমান প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না।

৬। **গুড অ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিস** (GAP) ও HACCP: FAO ও DOF (Department of Fisheries) কর্তৃক প্রদত্ত GAP এবং HACCP নীতিমালা অনুসারে চাষাবাদ করলে মাছের মান নিশ্চিত করা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ফিড ম্যানেজমেন্ট, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ

যদিও অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত মাছ উৎপাদনের ধারণা ইতিবাচক, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে-

- খামারী পর্যায়ে সচেতনতার অভাব: অনেক চাষি এখনো রোগ প্রতিরোধের সহজ উপায় হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন।
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও টেকনিক্যাল সাপোর্টের অভাব: গ্রামীণ পর্যায়ে প্রোবায়োটিক বা ভ্যাকসিন ব্যবহারের দক্ষতা সীমিত।
- মান নিয়ন্ত্রণ ও ল্যাব সুবিধার ঘাটতি: মাঠ পর্যায়ে দ্রুত পরীক্ষা বা মনিটরিংয়ের সুবিধা অপর্যাপ্ত।
- অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা: বিকল্প পদ্ধতির প্রাথমিক খরচ তুলনামূলক বেশি হওয়ায় ছোট চাষিদের জন্য এটি চ্যালেঞ্জ।
- নীতি ও প্রয়োগের দুর্বলতা: অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ওপর আইন থাকলেও মাঠপর্যায়ে তদারকি দুর্বল।

সম্ভাবনা ও করণীয়

বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত মৎস্যচাষের সম্ভাবনা ব্যাপক। সরকারের "সেফ ফুড অ্যাক্ট ২০১৩" এবং "ন্যাশনাল অ্যাকুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি" ইতোমধ্যে নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগকে আরও গতিশীল করতে নিম্নোক্ত করণীয় বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ-

- কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি: মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
- গবেষণা ও উদ্ভাবন: দেশীয় ভেষজ বা প্রোবায়োটিক বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বাড়াতে হবে।
- নিয়মিত মান পর্যবেক্ষণ: অ্যান্টিবায়োটিক অবশিষ্টাংশ শনাক্তে জেলা পর্যায়ে দ্রুত পরীক্ষাগার স্থাপন প্রয়োজন।
- বাজারে সনদপ্রাপ্ত "অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত" লেবেল: এটি ভোক্তার আস্থা বাড়াবে ও উৎপাদককে উৎসাহিত করবে।
- রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে রপ্তানিযোগ্য মাছ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি

সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও কৃষকের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। নিরাপদ মাছ উৎপাদন কেবল স্বাস্থ্য নয়, বরং খাদ্যনীতি, অর্থনীতি ও টেকসই উন্নয়নের অংশ। "ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ" অনুসারে মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্য একসঙ্গে বিবেচনা করলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

উপসংহার

অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত মাছ উৎপাদন বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। এটি জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। যদিও এর বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে সচেতনতা, প্রযুক্তি ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে এটি সম্ভব। একটি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই বাংলাদেশ গঠনের জন্য এখনই সময় অ্যান্টিবায়োটিক নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ উৎপাদনে মনোযোগ দেওয়ার। কারণ নিরাপদ মাছ মানেই নিরাপদ খাদ্য-আর নিরাপদ খাদ্যই একটি জাতির সুস্থ ভবিষ্যতের ভিত্তি।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

রেস্টুরেন্ট ও স্ট্রিট ফুড : খাদ্য সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাস্তবতা

আব্দুল্লাহ সাঈদ তালুকদার, জার্নাল অফ অ্যাডভান্সড ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল রিসার্চ, ৫৩/১, সারদা ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

ভূমিকা

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একসময় ঘরোয়া রান্নাই ছিল মানুষের খাদ্যের প্রধান ভরসা। কিন্তু কর্মব্যস্ততা, সময়ের সংকট ও ভোক্তার রুচির বদলের কারণে মানুষ এখন ক্রমেই 'রেস্টুরেন্ট' ও 'স্ট্রিট-ফুড'-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ নতুন প্রবণতা যেমন ভিন্নধর্মী এক খাদ্যাভ্যাসের জন্ম দিয়েছে, তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন সংকটের দরজা খুলে দিয়েছে।

নগরায়ন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটসহ দেশের বড় শহরগুলোতে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা এখন একটি সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত হয়েছে। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়, অফিসপাড়া, পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রের চারপাশে স্ট্রিট-ফুডের বিস্তার বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। তরুণদের দৃষ্টিতে স্ট্রিট-ফুড মানে শুধু খাবার নয়, বরং আড্ডা ও সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে এই পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসের সাথে জড়িয়ে আছে নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি, যার প্রধান কারণ হলো সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধির অপ্রতুলতা।

রেস্টুরেন্টের বাস্তবতা

বাংলাদেশে অধিকাংশ রেস্টুরেন্টে খাবার রান্না করে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা পুনরায় গরম করে পরিবেশন করা হয়। রান্নাঘরের পরিস্থিতি সাধারণত ভোক্তাদের চোখের আড়ালে থাকে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, অনেক রেস্টুরেন্টেই রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক নয়; খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়, ফলে ধুলোবালি ও জীবাণু সহজেই প্রবেশ করতে পারে। মাংস, মাছ বা দুগ্ধজাত খাদ্য যথাযথ হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয় না, যার কারণে সেগুলো দ্রুত পঁচে যায়। একই তেল বারবার ব্যবহার করার প্রবণতাও বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে দেখা যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে রেস্টুরেন্টগুলোকে নিয়মিত জরিমানা করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জে "প্রজেক্ট হিলসা" ও "লিফ লাউঞ্জ" রেস্টুরেন্টকে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের কারণে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়[১]। ময়মনসিংহে রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্নতা, তেলাপোকা এবং বাসি খাবার রাখার দায়ে সারিন্দা রেস্টুরেন্ট ও ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্ট-কে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়[২]। কক্সবাজারে চারটি রেস্টুরেন্টকে অস্বাস্থ্যকর খাবার সংরক্ষণ ও অনিয়মের কারণে এক লাখ পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়[৩]। চট্টগ্রামের খুলশীতে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে চারটি রেস্টুরেন্টকে সোয়া লাখ টাকা জরিমানা করা হয়[৪]। একইভাবে সিলেটের বিশ্বনাথে নোংরা পরিবেশ ও ভেজাল খাদ্য বিক্রির দায়ে রেস্টুরেন্ট ও দোকানগুলোতে এক লাখ টাকার বেশি অর্থদণ্ড দেওয়া হয়[৫]। রাজধানীর গুলশান-১ এলাকায় ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্টকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়[৬]। এমনকি ঢাকার নিকুঞ্জ এলাকায় হোটেল রিজেন্সির অবৈধ রেস্টুরেন্টও বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মালিককে জরিমানা করা হয়[৭]।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে আইন প্রয়োগ বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে এবং বিভিন্ন জেলায় প্রায় একই ধরনের অপরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান।

স্ট্রিট ফুডের বাস্তবতা

"স্ট্রিট-ফুড" বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়, বিশেষ করে কর্মজীবী মানুষ, ছাত্রছাত্রী ও নিম্নআয়ের মানুষের কাছে। ফুচকা, চটপটি, সিঙ্গারা, পাকোড়া, ঝালমুড়ি, ভাজাপোড়া, বার্গার, পিজ্জা, নুডুলস, স্যান্ডউইচ, বিভিন্ন ফলের জুস, বিভিন্ন চাইনিজ এবং থাই জাতীয় খাবার প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ খেয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ স্ট্রিটফুড খোলা জায়গায় তৈরি হয়, যা ধুলোবালি ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পানি অপরিশোধিত বা দূষিত থাকে, ব্যবহৃত পাত্র অপরিচ্ছন্ন এবং উপকরণ নিম্নমানের হয়। নানা ধরনের রাসায়নিক রং, কৃত্রিম ফ্লেভার এবং নিম্নমানের তেলও ব্যবহার করা হয়।

২০২৫ সালের ঈদুল ফিতরের মেলায় যশোরের অভয়নগরে ফুচকা খাওয়ার পর দুই শতাধিক মানুষ খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে এবং তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় স্থানান্তর করা হয়। দোকানদারের বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করা হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়[৮]। এই ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে স্ট্রিটফুড আমাদের 'ফুড-কালচার'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হলেও, স্বাস্থ্যঝুঁকির বিচারে তা আজ এক মারাত্মক হুমকিতে রূপ নিয়েছে।

সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

রেস্টুরেন্ট ও স্ট্রিট ফুড উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাংস, মাছ ও দুধ যথাযথ হিমাগারে সংরক্ষণ না করার কারণে দ্রুত জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়। রান্না করা খাবার দীর্ঘ সময় উন্মুক্ত রাখলে সালমোনেলা বা ই-কোলাইয়ের মতো ক্ষতিকর জীবাণুর জন্ম হয়। একই তেল পুনঃব্যবহার করলে ধীরে ধীরে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয়, যা ক্যানসার ও অন্যান্য অসুখের কারণ। ফলে, ভোক্তারা একদিকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য বিষক্রিয়া, ডায়রিয়া ও হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হন, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি ও লিভারের জটিলতায় ভোগেন । শিশু ও কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশও এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক দিক

খাদ্য নিরাপত্তা শুধু জনস্বাস্থ্যের বিষয় নয়, বরং এর সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক দিকও গভীরভাবে সম্পর্কিত। খাদ্যবাহিত রোগের কারণে শ্রমশক্তি হ্রাস পায়, চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায় এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পর্যটন শিল্পেও এর প্রভাব স্পষ্ট। নিরাপদ খাবারের নিশ্চয়তা না থাকলে বিদেশি পর্যটকদের চোখে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা মানে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ভোক্তার অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন থাকলেও খাদ্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ এখনো সীমিত। অনেক সময় ভোক্তারা অভিযোগ করতে দ্বিধা করেন বা কার্যকর সহায়তা পান না। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে ভোক্তাদের সচেতন হতে হবে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার কেনা এড়িয়ে চলা, মানসম্মত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অনিয়ম চোখে পড়লে অভিযোগ জানানো জরুরি। একইসঙ্গে ব্যবসায়ীদেরও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ভূমিকা

বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে মাছ ট্রেসেবিলিটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে[৯]। স্মার্ট সেন্সর ও IoT প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংককসহ বিভিন্ন শহরে স্ট্রিটফুড ট্রলি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সেখানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা তাৎক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা যায়, আর ক্রেতারা ছজ কোড স্ক্যান করে সহজেই তথ্য যাচাই করতে পারেন[১০]। একইভাবে উন্নত দেশে ইন্টেলিজেন্ট প্যাকেজিং ও ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেন্সরের মাধ্যমে খাবারের গুণগত মান ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে[১১, ১২]।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত

থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে স্ট্রিটফুড সংস্কৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও সেখানে স্থানীয় সরকার বিক্রেতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট জোনে পরিচালনার ব্যবস্থা করেছে। ফলে খাবারগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং পর্যটকদের কাছে গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশেও একই ধরনের নীতি গ্রহণ করলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে এবং খাদ্য সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করবে।

মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও প্রভাব

আজকের তরুণ প্রজন্ম নিয়মিত সপ্তাহে একাধিকবার বাইরে খাচ্ছে। ঘরে রান্না করা খাবারের প্রচলন ধীরে ধীরে কমছে। এর ফলে প্রক্রিয়াজাত ও তেল-ভাজা খাবারের গ্রহণ বেড়ে গেছে। এ পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস অসংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে। দেশে স্থূলতা ও ডায়াবেটিসের হার ইতোমধ্যেই বেড়েছে, যার অন্যতম কারণ এই খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন।

সরকারি উদ্যোগ ও সীমাবদ্ধতা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" এবং "বিএসটিআই"র মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, জরিমানা আর নিয়মিত অভিযান এসব উদ্যোগের অংশ। তবে বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। অধিকাংশ রেস্টুরেন্ট ও স্ট্রিটফুড বিক্রেতা নিয়মিত তদারকি বা পরীক্ষার আওতায় পড়ে না। পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার এবং খাবারের মান ও নিরাপত্তা নিরীক্ষণের জন্য দক্ষ জনবলও নেই। আইন থাকলেও প্রয়োগে ঘাটতি স্পষ্ট। ফলশ্রুতিতে খাদ্য নিরাপত্তা এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

শিক্ষা ও গণসচেতনতা

খাদ্য নিরাপত্তা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও গণসচেতনতা অপরিহার্য। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালানো উচিত। সচেতন ভোক্তা তৈরি করা গেলে খাদ্য নিরাপত্তা আর শুধু সরকারনির্ভর থাকবে না, বরং তা এক ধরনের সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে।

করণীয়

বাংলাদেশে রেস্টুরেন্ট ও স্ট্রিট ফুডের মানোন্নয়নের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। লাইসেন্স নবায়নের সময় খাদ্য নিরাপত্তা সনদ প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে। রেস্টুরেন্টে 'ওপেন কিচেন'-এর ব্যবস্থা রাখা উচিত, যাতে ভোক্তারা নিজের চোখে রান্নাঘরের পরিবেশ ও খাবার প্রস্তুতির প্রতিটি ধাপ দেখতে পান। একই তেল বারবার ব্যবহার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। স্ট্রিট ফুড বিক্রেতাদের নিবন্ধিত করে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি, যাতে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার প্রস্তুত করে। নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত পানি ও অন্যান্য উপকরণের গুণগত মান পরীক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভোক্তাদের সচেতন করতে গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্ট্রিটফুডের ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রচারণা চালানো যায়। একইভাবে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ক্লাস, সেমিনার এবং সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও স্ট্রিটফুড ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। মানুষকে নিরাপদ বিকল্প খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা প্রযুক্তির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা দরকার। হিমাগারের সংখ্যা ও ব্যবহার বাড়ালে খাবার সংরক্ষণের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

উপসংহার

রেস্টুরেন্ট ও স্ট্রিট ফুড বর্তমানে বাংলাদেশের 'ফুড-কালচার'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তবে সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধির দুর্বলতার কারণে এগুলো ক্রমেই জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকিতে রূপ নিচ্ছে। নগরায়ন ও ব্যস্ত জীবনধারার ফলে এ খাদ্যাভ্যাসের প্রসার ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিঃসন্দেহে মারাত্মক হয়ে উঠবে। দৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সচেতন ভোক্তা এবং দায়িত্বশীল বিক্রেতার সমন্বয় ছাড়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যের সুস্থতার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।

স্লোগান: "নিরাপদ খাবার, সুস্থ জীবন।"

তথ্যসূত্র

১. প্রজেক্ট হিলসা ও লিফ লাউঞ্জকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
NewsBangla24. https://www.newsbangla24.com/news/239014/Project-Hilsa-and-Leaf-Lounge-restaurant-fined-five-lakh-taka
২. ময়মনসিংহে সারিন্দা ও ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্টকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা, বাংলাদেশ প্রতিদিন.
https://www.bd-pratidin.com/country/2024/01/31/963235
৩. কক্সবাজারে ৪ রেস্টুরেন্টকে লাখ টাকা জরিমানা
Dhaka Post. https://www.dhakapost.com/country/397610
৪. চট্টগ্রামে ৪ রেস্টুরেন্টকে সোয়া লাখ টাকা জরিমানা
Banglanews24. https://www.banglanews24.com/daily-chittagong/news/bd/1341838.details
৫. সিলেটে রেস্টুরেন্ট ও দোকানে লাখ টাকা জরিমানা, বাংলাদেশ প্রতিদিন
https://www.bd-pratidin.com/chayer-desh/2025/02/26/1089859
৬. গুলশান ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্ট জরিমানা
Banglanews24. https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1293133.details
৭. হোটেল রিজেন্সির রেস্টুরেন্ট বন্ধ ও জরিমানা, ইত্তেফাক
https://www.ittefaq.com.bd/680438
৮. যশোরে ফুচকা খেয়ে অসুস্থ ২৩৫ জন, প্রথম আলো
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/72f6ixbwl1
৯. বাংলাদেশে মাছের ব্লকচেইন ট্রেসেবিলিটি প্রকল্প,
Ledger Insights. https://www.ledgerinsights.com/bangladesh-food-security-blockchain-fish-traceability-bana-byteally
১০. ব্যাংককে স্ট্রিট ফুড নিরাপত্তায় স্মার্ট ট্রলি
Food Poisoning News. https://www.foodpoisoningnews.com/street-food-safety-in-megacities-innovations-combat-climate-driven-pathogen-risks
১১. স্মার্ট প্যাকেজিং প্রযুক্তি
ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043452624000548
১২. খাদ্য দূষণ শনাক্তকরণে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেন্সর
ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224425002456

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ডিমের গ্রেডিং এবং সাইজিংঃ প্রয়োজনীতা ও করণীয়

ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক ও গবেষক, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫

ভূমিকা

ডিম (মুরগির ডিম) বিশ্বের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ উৎসভিত্তিক খাদ্য। প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এ খাদ্য নিরাপদ ও উচ্চমানের হওয়া উচিত। তবে শুধু মান বজায় রাখলেই হবে না – বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় "গ্রেডিং (Grading)" ও "সাইজিং (Sizing)" ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ডিম সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারে পৌঁছানো পর্যন্ত মান সুরক্ষা ও সঠিক গ্রেডিং থাকে না। এতে করে ভোক্তা অধিকার ক্ষুনন হয়, ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ কঠিন হয় এবং খাদ্য সুরক্ষা ঝুঁকি বাড়ে। সেজন্য বাংলাদেশে ডিমের গ্রেডিং ও সাইজিং প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেডিং ও সাইজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ও চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় বিষদ আলোচনার দাবী রাখে।

গ্রেডিং (Grading)

"গ্রেডিং" বলতে ডিমের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গুণগত মান অনুযায়ী শ্রেণি ভাগ করা। সাধারণত গ্রেডিংয়ের সময় নিচের দিকগুলোর মূল্যায়ন করা হয়:

- বাহ্যিক গুণমান: খোসার অসাম্য, ফাটল, দাগ, অপরিষ্কার অংশ, আকার ও আকৃতির স্বাভাবিকতা ।
- অভ্যন্তরীণ গুণমান: আলবুমেনের (egg white) উচ্চতা, হ (Haugh) ইউনিট, বায়ু কোষ এর (air cell) আকার, ব্লাড বা মিট স্পট ইত্যাদি।
- সুচীত পদ্ধতি: Candling বা লাইট দিয়ে ডিমের ভিতর আলো প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ইত্যাদি । উদাহরণস্বরূপ, USDA-এর গ্রেডিং মান অনুসারে ডিমের জন্য তিন ধরণের গ্রেড (১) AA, (২) A এবং (৩) B প্রযোজ্য।

(১) গ্রেড AA - ডিমের সাদা অংশ ঘন এবং শক্ত; কুসুম উঁচু, গোলাকার এবং কার্যত ত্রুটিমুক্ত (রক্তের দাগ এবং মাংসের দাগ মুক্ত); এবং পরিষ্কার, অক্ষত খোসা। বায়ু কোষের গভীরতা ৩.২ মিমি এর বেশি হতে পারবে না।

(২) গ্রেড A- এ ধরণের ডিমের বৈশিষ্ট্য AA গ্রেডের ডিমের মতো, তবে সাদা অংশগুলি "যুক্তিসঙ্গতভাবে" শক্ত। অধিকাংশ দোকানগুলিতে প্রায়শই এই মানের ডিম বিক্রি হয়।

(৩) গ্রেড B- এ ধরণের ডিমের সাদা অংশ পাতলা হতে পারে এবং কুসুম উচ্চ মানের ডিমের তুলনায় চওড়া এবং চ্যাপ্টা হতে পারে। খোসা অবশ্যই অক্ষত থাকতে হবে, তবে সামান্য দাগ দেখা যেতে পারে। খুচরা দোকানে সাধারণত এই ধরণের ডিম খুব কমই পাওয়া যাওয়ার কথা কারণ এগুলি সাধারণত উন্নত দেশে তরল, হিমায়িত, শুকনো ডিমের পণ্য, এবং অন্যান্য ডিমযুক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

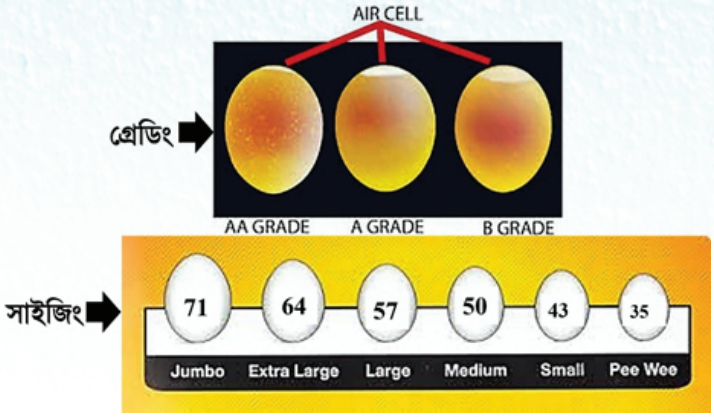

চিত্র-১. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের এবং সাইজের ডিম।

সাইজিং (Sizing)

"সাইজিং" বলতে ডিমের ওজন অনুযায়ী শ্রেণি নির্ধারণ করা। অর্থাৎ, একই গ্রেডের ডিম হলেও ওজন বিভিন্ন হলে আলাদা সাইজ বিভাগে রাখার প্রয়োজনে সাইজিং করা হয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড যেমন UNECE নীতিমালা অনুসারে, ডিমকে ওজন ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রেড হিসেবে ভাগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, UNECE অনুযায়ী:

টেবিল-১। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ডিমের বিভিন্ন গ্রেড এবং সাইজ।

গ্রেড (weight grade) বা শ্রেণী	ওজন (গ্রাম)	মন্তব্য
	বেশি	
গ্রেড ২ বা অতিরিক্ত বড়	< ৭০ থেকে ≥ ৬৫	...
গ্রেড ৩ বা বড়	< ৬৫ থেকে ≥ ৬০	...
গ্রেড ৪ বা মাঝারি	< ৬০ থেকে ≥ ৫৫	...
গ্রেড ৫ বা মাঝারি	< ৫৫ থেকে ≥ ৫০	...
গ্রেড ৬ বা ছোট	< ৫০ থেকে ≥ ৪৫	...
গ্রেড ৭ বা অতি ছোট	< ৪৫	**সবচেয়ে ছোট শেণী**

একইভাবে, যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মুলা অনুযায়ী ডিমগুলিকে 'Jumbo', 'Extra Large', 'Large', 'Medium', 'Small', এবং 'Peewee',শ্রেণীতে ভাগ করা হয় (টেবিল-১)।

সাইজিং করার ফলে বিক্রেতা ও গ্রাহকের কাছে স্বচ্ছ হয়-একই সাইজের ডিমের মূল্য তুলনামূলকভাবে নির্ধারণ করা যায়।

বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা

গবেষণামূলক মুল্যায়নের অভাব: বাংলাদেশে ডিমের গুণমান, সাইজ ও ধরনের গবেষণা কিছু হলেও সুসংগঠিত জাতীয় গ্রেডিং ও সাইজিং পদ্ধতি এখনও সাধারণের কাছে পরিলক্ষিত নয়। কিছু প্রাসঙ্গিক গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ডিমের ওজন ও গুণমানের বিচিত্রতা রয়েছে এবং সঠিক সাইজিং ও গ্রেডিংয়ের অভাবে প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্র খামারী এবং ভোক্তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে যা পোল্ট্রি শিল্পের অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রতিবন্ধক।

চ্যালেঞ্জ ও বাস্তব সমস্যা:

১। **মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব:** অনেক ছোট ও মাঝারি আকারের ডিম গ্রেডিং ও সাইজিং সিস্টেমে না আসার কারনে ডিমের সঠিক মান উন্নয়ন ও যথেষ্ট বিনিয়োগ হয় না। অধিকাংশ ডিম সরাসরি বাজার বণ্টনকারীর নিকট বিক্রি হয়, যেখানে মান নিয়ন্ত্রণের কোন বালাই নাই ।

২। **প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাব:** ক্যান্ডলিং (Candling), স্বয়ংক্রিয় ওজন পরিমাপক যন্ত্র ইত্যাদি সরঞ্জামের অভাব অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

৩। **জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ ঘাটতি:** ডিম উৎপাদনকারী খামারী, ক্রেতা, বিক্রেতা এবং মধ্য সত্ত্ববিতরণের অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই গ্রেডিং ও সাইজিংয়ের মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নন।

৪। **বাজারে মানবিহীন ডিমের প্রবেশ:** গ্রেডিং ও সাইজিং না থাকায় নিম্নমান এবং ফাটল-ভাঙা ডিম বাজারে প্রবেশ করে এবং সেটা পুরো বাজারের প্রতি ভোক্তাদের বিশ্বাস হ্রাস/নষ্ট করে।

৫। **নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অনুপস্থিতি:** বাংলাদেশে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো একক সংস্থা এখনও ব্যাপকভাবে ডিম গ্রেডিং ও সাইজিং করে বাজারজাতকরণের জন্য কার্যকর নিয়ম জারি করেনি।

৬। গ্রাহক সচেতনতার অভাব: সাধারণ ভোক্তা গ্রেড বা সাইজের পার্থক্য জানে না, তাই দাম ও গুণমানের ভিত্তিতে তারা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তা বুঝতে পারেন না।

কেন গ্রেডিং ও সাইজিং প্রয়োজন

১। **ভোক্তাকে মানের নিশ্চয়তা:** গ্রেডিং ও সাইজিং থাকলে গ্রাহক নিশ্চিন্তে ডিম কিনতে পারবেন-তারা নিশ্চিত হতে পারবেন তাদের প্রদেয় অর্থে তারা সঠিক মানের ডিম পাচ্ছেন যা উল্লেখ আছে।

২। **ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ:** একই ধরণের ও সাইজের ডিমকে একই মূল্য দেওয়া সম্ভব হবে। এতে করে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়েই লাভবান হবেন।

৩। **বাণিজ্যিক অ্যাপিল ও বাজার সম্প্রসারণ:** স্ব-স্ব মান অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস থাকলে শীতল চেইন (cold chain), ন্যায্য ট্রেড ও রপ্তানি সম্ভাবনা বাড়ে।

৪। **বর্জ্য ও ক্ষয় হ্রাস:** নিম্নমান ও ফাটল ডিম সনাক্ত করা যাবে এবং সেগুলি অপচয়ের মাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্পের ক্ষতির মুখে পড়া রোধ করা যানে।

৫। **স্বাস্থ্য সুরক্ষা:** ফাটল বা নষ্ট ডিম বাজারে প্রবেশ করলে খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ে। গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে এসব ডিম সরিয়ে ফেলা যাবে। এতে করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে।

৬। **উৎপাদনে উৎসাহ:** উৎপাদকরা গুণমান বজায় রেখে উৎপাদন চালিয়ে গেলে শিল্পে গুণগত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ হবে যার ফলে খামারীগণ লাভবান হবেন।

করণীয়-বাস্তবায়ন ও সুপারিশ

নিচে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিম গ্রেডিং ও সাইজিং সফলভাবে প্রবর্তনের জন্য কিছু সুপরামর্শ এবং করণীয় উপস্থাপন করছি।

১। **নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি:**

- কেন্দ্রীয় নিয়ম ও মান কায়দা গঠন: সরকারের বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (যেমন- প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়) কে ডিম গ্রেডিং ও সাইজিংয়ে বাধ্যতামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI): এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।
- নীতি বাস্তবায়ন ও নজরদারি সংস্থা: একটি নির্ধারিত সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত এজেন্সি গ্রেডিং স্টেশন অনুমোদন, পরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে।

২। **প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়ন**

- গ্রেডিং সেন্টার সম্প্রসারণ: দেশজুড়ে যোগ্য গ্রেডিং স্টেশন স্থাপন করা, বিশেষ করে উৎপাদন কেন্দ্রে।
- উপকরণ সরবরাহ: ক্যান্ডালার (Candler) ল্যাম্প, ওজন পরিমাপক যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় সাইজার ইত্যাদি প্রযুক্তি সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া।
- রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশন: যন্ত্রগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে সঠিকভাবে কাজ করে।

৩। **প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা গঠন:**

- গ্রেডার ও অপারেটর প্রশিক্ষণ: ডিম গ্রেডিং, সাইজিং ও চালানোর কৌশল, গুণমান পরিমাপ শেখানো।
- খামারী ও মধ্যবর্তী বিক্রেতা সচেতনতা: প্রতি স্তরের অংশগ্রহণকারীকে এই পদ্ধতির প্রয়োজন ও সুবিধা সম্পর্কে জানানো।
- মান নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ: গুণমান সচেতনতা এবং দায়বদ্ধতার মানসিকতা গড়ে তোলা।

৪। **উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রণোদনা**

- প্রণোদনা ও ভর্তুকি: নতুন গ্রেডিং যন্ত্রাবলী কেনার ক্ষেত্রে কৃষক ও ফার্ম মালিকদের জন্য ছাড় বা অনুদান।
- মানযুক্ত ডিম বিপণনে সহায়তা: মানযুক্ত ডিমের মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং জন্য সরকারি সমর্থন।
- সনদ ও ব্র্যান্ডিং: গ্রেড ও সাইজ যুক্ত ডিমকে ব্র্যান্ড করে "মানকৃত ডিম" নামে বাজারে তুলে ধরা।

৫। **বাজার ও ভোক্তা সুরক্ষা**

- লেবেলিং ও প্যাকেজিং নিয়ম: প্রতিটি প্যাকেট বা খাঁচার গায়ে গ্রেড ও সাইজ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- মান অনুসন্ধান ও বার্নিং: বাজারে কঠোর মান পরীক্ষণ–নিম্নমান বা গ্রেডবহির্ভূত ডিম বিক্রি নিষিদ্ধ করা।
- ভোক্তা শিক্ষা: গ্রাহকদের গ্রেড ও সাইজ বুঝতে শিক্ষা দেওয়া (টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদিতে প্রচারণা)।

৬। **পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ও উন্নয়ন**

- মান পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ: সময়-সাপেক্ষ গ্রেড ও সাইজ বিভাগগুলোর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা।
- গবেষণা ও উন্নয়ন: স্থানীয় প্রজাতির ডিমের জন্য উপযোগী গ্রেডিং ও সাইজিং মান নির্ধারণে গবেষণা।
- সংশোধন ও আপডেট: আন্তর্জাতিক মান ও প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তি ও পরিকল্পনার হালনাগাদ করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ডিম গ্রেডিং ও সাইজিং প্রবর্তন একটি সময়োপযোগী ও অপরিহার্য উদ্যোগ। এটি শুধু উৎপাদন থেকে বাজার পর্যন্ত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে না, বরং উৎপাদক ও ভোক্তাকে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও আশ্বাস যোগাবে। এটি কার্যকর হলে বাজারে গিয়ে আর বলতে হবে না "ভাই ভালো আর বড় ডিম দেন"।

এই উদ্যোগ সফল করতে হলে সরকারি নীতি, প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, বাজার সহায়ক ব্যবস্থা ও সচেতনতা – এই সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত কাঠামো গঠন করা অনস্বীকার্য।

আপনি কি এখনও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায়
মাশরুম সংযোজন করেননি!
তাহলে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন-
নিকটস্থ হর্টিকালচার সেন্টার,
উপজেলা কৃষি অফিস এবং মাশরুম উদ্যোক্তার সাথে
অনলাইনে তথ্য পেতে ভিজিট করুন -
www.mushroomproject.gov.bd
www.youtube.com/@MushroomProject-DAE
প্রচারে: মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন
ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাশরুম-একটি অপ্রচলিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় স্বাস্থ্যকর খাবার

ডঃ জীবুন্নাহার খন্দকার, (মাশরুম গবেষক) সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ লাইফ সাইন্স, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা-১২২৯

মাশরুমকে আমরা ব্যাঙের ছাতা বলে প্রায়শই অবমূল্যায়ন করে থাকি। কিন্তু হাজার বছর ধরে এটি মানুষের খাদ্য তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। একই সাথে এটি প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকেই প্রাকৃতিক মেডিসিন হিসেবে মানব চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক দশকগুলো ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে তা নিরসন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ বৈশ্বিক অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাশরুম চাষ ও এর স্বাস্থ্য উপকারিতা কার্যকরী অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া, প্রচলিত খাদ্য উৎপাদনে কার্বন নিঃসরণ একটি বড় সমস্যা, মাশরুম কম কার্বনযুক্ত খাদ্য হওয়ার কারণে কার্বন নিঃসরণ করে না একই সাথে নিজের বায়োমাস বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের বডিতে ও মাটিতে কার্বণ জমা করার ক্ষমতা রাখে। এর ফলে মাশরুম চাষ খাদ্য উৎপাদনে পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাত কমাতে পারে। অধিকন্তু, মাশরুম চাষ Circular Economic এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ এটি কৃষিজ ও অন্যান্য র্বজ্য পদার্থকে ব্যবহার করে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করে। এতে করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বোঝা কমে এবং সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে। এসব সম্ভাবনার কারণে বর্তমান সময়ের মাশরুম বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়সহ সাধারন মানুষের মনোযোগ আর্কষণ করেছে।

সবজি হিসেবে বিবেচিত হলেও মাশরুম উদ্ভিদ বা প্রাণী নয়। এটি একটি ছত্রাক, যা ব্যাসিডিওমাইকোটা এবং অ্যাসকোমাইকোটা পর্বের অর্ন্তগত। একে প্রাণীজ প্রোটিনের যেমন মাছ, মাংসের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এতে প্রোটিনের পরিমান অনেক বেশি, একই সাথে কার্বহাইড্রেট, ক্যালোরি ও চর্বির পরিমান কম। অপরদিকে, মাছ, মাংসে প্রোটিনের পাশাপাশি ক্যালোরি ও চর্বির পরিমান বেশী থাকে যা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক। প্রোটিন সমৃদ্ধ এ মাশরুম অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের দিক থেকেও খুবই মূল্যবান। এতে আছে উন্নতমানের ফাইবার, প্রয়োজনীয় ভিটামিন (বিশেষ করে Vit B complex এবং Vit D), সেলেনিয়াম, পটাশিয়াম, জিংক, এবং কপারে মতো খনিজ পদার্থ। মাশরুম শুধু এ বৈচিত্র্যময় পুষ্টির জন্যই নয়, বরং বিভিন্ন জৈব সক্রিয়, অ-পুষ্টিকর যৌগের জন্যও উল্লেখযোগ্য, এর মধ্যে অন্যতম হলো পলিস্যাকারাইড, ইন্ডোল, পলিফেনল এবং ক্যারোটিনয়েড। এসব যৌগের উপস্থিতির কারণে এটি ঔষধীগুন সম্পন্ন খাদ্য হিসেবে বহুল পরিচিত। বিভিন্ন কোষীয় এবং প্রাণী গবেষণায় প্রমানিত ঔষধীগুন হলো Antioxident, Anti-Inflamation, Anti-Diabetics, এবং Anti-Cholestorol অন্যতম। নিম্নে মাশরুমের উল্লেখযোগ্য কিছু ঔষধীগুনের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

মাশরুম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকারীতা: আমাদের প্রতিদিনকার কাজের ও মানসিক চাপের কারণে শরীরে নানাধরনের ফ্রি র‍্যাডিকেল উৎপন্ন হয়। এসব ফ্রি র‍্যাডিকেল দেহের কোষ নষ্ট করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং ত্বকের মসৃণতা নষ্ট করে বলিরেখা বাড়িয়ে দেয়, যে কারণে তাড়াতাড়ি বয়স্ক দেখায়। মাশরুমের ফেনোলিকস, পলিস্যাকারাইডস, এরগোথিওনিন, গ্লুটাথিয়ন, টকোফ্যারোল এবং ভিটামিন সি এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এসব জৈব যৌগ শরীরের উৎপন্ন ফ্রি র‍্যাডিকেলগুলিকে নিরপেক্ষ করে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং শরীরের প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে। এর ফলে শরীরের কোষগুলি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বয়স সম্পর্কিত দীর্ঘস্থায়ী রোগ কমায়।

মাশরুমের অ্যান্টিইনফ্লামেশন কার্যকারীতা: মাশরুমে জৈব-সক্রিয় যৌগের উপাদান যেমন পলিস্যাকারাইড (বিশেষত β-গ্লুকান), ফেনোলিক যৌগ, ফ্যাটি অ্যাসিড, টারপেনয়েড এবং মাইকোস্টেরয়েড থাকে। এই যৌগগুলি শরীরের ইনফ্লামেশন কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। একাধিক মেটাবলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব জৈব-সক্রিয় পদার্থগুলি ইনফ্লামেশন কমাতে পারে। যেমন প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান তৈরিতে বাধা দেয় যার মধ্যে রয়েছে ইন্টারলিউকিন- ১β (IL-১ β) এবং টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর-আলফা (TNF-α) এর মতো সাইটোকাইন, সে সাথে সাইক্লোঅক্সিজেনস-২ (COX-2)এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিন্থেটেজের মতো এনজাইম।

মাশরুমের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রন কার্যকারীতা: পলিস্যাকারাইড (বিশেষত β-গ্লুকান) এবং টরেপেনয়েডের মতো সক্রিয় জৈব যৌগের উপস্থিতির কারণে মাশরুম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এই যৌগগুলি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, ইনসুলিন সংকেত উন্নত করা এবং কার্বোহাইড্রেট শোষণ বিলম্বিত করা সহ একাধিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে পারে। β-গ্লুকান গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল উপাদানের সান্দ্রতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কার্বোহাইড্রেটের হজম এবং শোষণ ধীর হয়ে যায়। এছাড়াও তারা ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য অগ্ন্যাশয়ের β- কোষগুলি সুস্থ্য রাখে এবং একই সাথে কোষের কার্যকারিতাকেও বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া β-গ্লুকান প্রোবায়োটিক হিসেবে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটার সঠিক উপস্থিতি নিশ্চিত করে, ডিসবায়োসিস কমায় এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে।

টেরপেনয়েড α-গ্লুকোসিডেসের মতো কার্বোহাইড্রেটের হাইড্রোলাইজিং এনজাইম তৈরিতে বাধা দেয়, যার ফলে গ্লুকোজ উৎপাদন হ্রাস পায়। রক্তে উপস্থিত কার্বোহাইড্রেটের গঠন পরিবর্তন করে দেয় যেমন কার্বোহাইড্রেটের স্পাইক কমে যায়। এসবগুলো প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করে বিধায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনের জন্য মাশরুমকে কার্যকরী খাবার হিসেবে সমাদৃত করে।

মাশরুমের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রন ও ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ কার্যকারীতাঃ

রক্তে অতিরিক্ত চর্বি থাকলে তা ধমনীতে জমা হয়, যাকে রক্তের কোলেস্টেরল বৃদ্ধি নির্দেশ করে। রক্তের এ কোলেস্টেরল বৃদ্ধির প্রবনতা থাকলে হৃদরোগ ও স্টোকের ঝুকি থাকে। অনেক কারণেই রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমান বাড়তে পারে এর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অন্যতম। মাশরুম একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও সে সাথে এর মধ্যে আছে β-গ্লুকান এবং এরিটেডিনিন নামক জৈব যৌগ, যা রক্তের কোলেস্টেরল শোষণ ও উৎপাদন উভয়ই কমায়। ফলশ্রুতিতে রক্তের কোলেস্টেরল উল্লেখ্যযোগ্য মাত্রায় কমে আসে। মজার বিষয় হলো খাদ্যতালিকায় প্রাণীজ আমিষ যেমন মাংসের সাথে মাশরুম খেলে কোলেস্টেরলের পরিমাণ সরাসরি কমে যায়। মাশরুম আমাদের জন্য ভিটামিন ডি এর ভালো ও নিরাপদ একটি উৎস । বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শরীরে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি দেখা দেয়। মাশরুমে থাকে অ্যারগোস্টেরল যা ভিটামিন ডি এর প্রিকরসর ।এই অ্যারগোস্টেরল অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে আসলে তা ভিটামিন ডি তে রূপান্তরিত হয়। তাই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা মাশরুম সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে আসার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি উৎপাদন করে, যা মানুষের দৈনিক প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর জন্য যথেষ্ট।

স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি, মাশরুম খাবারের রুচি বৃদ্ধিতেও কর্যিকরী ভূমিকা রাখে। মাশরুমে পর্যাপ্ত পরিমানে গ্লুটামেট-এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকার কারণে "উমামি" নামক বিশেষ ধরনের সুস্বাদু স্বাদ তৈরি করে। এধরনের স্বাদ মাংস, মাছ, পনির এবং ধীরে রান্না করা স্যুপেও পাওয়া যায়। তাই, আমাদের দৈনন্দিন খাবারের টেবিলে স্বাস্থ্যকর সংযোজন হলো মাশরুম। "মাশরুম খাই সুস্থ্য থাকি"।

খাদ্যে অ্যাক্রিলামাইডের গঠন, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

প্রফেসর ড. মারুফ আহমেদ, ফুট প্রসেসিং এন্ড প্রিজারভেশন বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর-৫২০০

অ্যাক্রিলামাইড হল একটি ছোট অসম্পৃক্ত অ্যামাইড অণু যা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ই খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শোষিত হয় এবং সারা শরীরে বিতরণ করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াজাতকরণ বা রান্নার সময়, কিছু খাদ্যদ্রব্যে, বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবারে অ্যাক্রিলামাইড উৎপন্ন হয়। অ্যাক্রিলামাইড এর আণবিক সূত্র C3H5NO এবং ওজন ৭১.০৮ ডাল্টন । ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (IARC) অ্যাক্রিলামাইডকে সম্ভাব্য কার্সিনোজেন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে এবং প্রাণী গবেষণায় নিশ্চিত হওয়ার পর; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে[1&2]।

অ্যাক্রিলামাইড তৈরি হয় বাদামী প্রক্রিয়ার (browning process) এর সময় যখন উচ্চ তাপমাত্রায় (>110-120° সেলসিয়াস) শর্করা এবং অ্যাসপারাজিনের (asparagine) সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। চিনি এবং অ্যাসপারাজিন (asparagine) হল প্রধান বিক্রিয়াকারী যা অ্যাক্রিলামাইড তৈরি করে। কার্বোহাইড্রেট বিক্রিয়া, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড বিক্রিয়া এবং লিপিড বিক্রিয়ার মতো আরও বেশ কিছু সম্ভাব্য কারণ অ্যাক্রিলামাইড গঠনের সাথে জড়িত। লিপিড জারণ ভাজা (frying) এবং বেকিংয়ের (baking) সময় অ্যাক্রিলামাইড গঠন কমাতে পারে । অ্যাক্রিলামাইডের সর্বাধিক প্রক্রিয়াজাত খাবারে পাওয়া যায় যেমন আলু থেকে তৈরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, রুটি, চিপস, চানাচুর, বিস্কুট, কেক, এবং ক্র্যাকার । টেবিল ১-এ নির্বাচিত খাবারের জন্য অ্যাক্রিলামাইড (µg/kg) এর পরিমাণ দেখানো হয়েছে[1&2]।

কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ অনেক কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ শস্য উৎপাদন করে, যেমন ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি এবং জোয়ার। বাংলাদেশে এমন শিকড় (roots) এবং কন্দও (tubers) উৎপন্ন হয় যার মধ্যে উচ্চ জলীয় উপাদান (প্রায় ৭০-৮০%) এবং উচ্চ স্টার্চের পরিমাণ (প্রায় ১৬-২৪%) থাকে। আলু উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ৭ম স্থানে রয়েছে। তাই জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্বেগ মোকাবেলায় বাংলাদেশে সাধারণত ব্যবহৃত প্রক্রিয়াজাত খাবারে অ্যাক্রিলামাইডের সর্ম্পকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাক্রিলামাইড নির্ধারণের জন্য গ্যাসক্রোমাটোগ্রাফি এবং ভর স্পেকট্রোমেট্রি (GC-MS/MS) ব্যবহার করা হয়। একটি গবেষণা বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, ১৫% বিস্কুট, ২৫% রুটি, ২০% কেক এবং ১০% ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের নমুনায় LOQ (limit of quantification) মান কম পাওয়া গেছে। বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখা গেছে যে ২০টি নমুনার মধ্যে ৪টি আলুর চিপস নমুনা, ১টি চানাচুর নমুনা, ৩টি আলুর কুঁচি নমুনা, ৩টি বিস্কুটের নমুনা, ২টি কেকের নমুনা, ৩টি রুটির নমুনা, ৪টি ক্র্যাক নমুনা, ২টি ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের নমুনা এবং ৪টি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নমুনায় ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডের চেয়ে বেশি অ্যাক্রিলামাইডের মাত্রা পাওয়া গেছে[1&2]। তাই অ্যাক্রিলামাইড খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এটি সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব নয়, তবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রান্নার কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে এর মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়। কিছু নিয়ন্ত্রণের উপায় নিম্নে দেয়া হলঃ

- খাবার ভাজার তাপমাত্রা ও সময় কমানো
- হালকা রঙ (light golden) হওয়া পর্যন্ত রান্না করা
- কাঁচা আলু ঠান্ডা ফ্রিজে না রাখা (এতে চিনি বেড়ে যায়, ফলে অ্যাক্রিলামাইড বেশি তৈরি হয়)
- প্রক্রিয়াজাত খাবারে অ্যাসপারাজিন কম রাখতে উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা

- **Tables 1: Acrylamide (ug/kg) contains selected foods**

Food category	Benchmark level (ug/kg)
French fries (ready-to-eat)	500 (EUR-Lex)
Potato crisps, snacks, crackers (potato-based)	750 (EUR-Lex)
Bread (wheat-based soft bread)	50 (EUR-Lex)
Other soft bread	100 (EUR-Lex)
Breakfast cereals (wheat, rye, whole grain, etc.)	300 (EUR-Lex)
Biscuits, wafers, crispbread	350 (EUR-Lex)
Gingerbread	800 (EUR-Lex)
Roasted coffee	400 (EUR-Lex)
Instant coffee	850 (EUR-Lex)
Biscuits for infants / young children	150 (EUR-Lex)
Cereal-based foods for infants / young children	40 (EUR-Lex)

European Union law (EUR-Lex)
Food Safety, European Union

References

1. G. M. M. Anwarul Hasan, Anuj Kumer Das, Mohammed A. (2022) Satter Detection of acrylamide traces in some commonly consumed heat-treated carbohydrate-rich foods by GC-MS/MS in Bangladesh. Heliyon 8 (2022) e11092.
2. Youssef, M. M., H. A. Abou-Gharbia and H. A. Abou-Bakr (2004). Acrylamide in food: Alexandria Journal of Food Science and Technology, 1,1-22.

জুনোটিক পরজীবী ও নিরাপদ খাদ্যঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

প্রফেসর ড. মোইজুর রহমান, চেয়ারম্যান, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল, রাজশাহী-৬২০৫

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ, যেখানে পশুপালন ও কৃষিজ উৎপাদন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এ খাদ্যচক্রে জুনোটিক পরজীবীর (zoonotic parasites) উপস্থিতি জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জুনোটিক পরজীবী হলো সেসব পরজীবী জীব, যেগুলো প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। এগুলো সাধারণত দূষিত খাদ্য, পানি বা অপরিষ্কার পরিবেশের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্যসচেতনতার ঘাটতি, অপর্যাপ্ত পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব এসব কারণ জুনোটিক পরজীবীর ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য এসব পরজীবী নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের জুনোটিক পরজীবী বিদ্যমান। এর মধ্যে কয়েকটি মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ:

প্রোটোজোয়া : *Giardia lamblia,* যা দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে মানুষের অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায় এবং শিশুদের মারাত্মক পানিশূন্যতার কারণ হতে পারে। *Entamoeba histolytica* যা মানুষের আমাশয়ের প্রধান কারণ। *Cryptosporidium* spp. প্রোটোজোয়া শিশু ও কম রোগপ্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে ডায়রিয়া সৃষ্টি করে।

কৃমি : *Taenia solium* (শূকরের ফিতা কৃমি) এবং *Taenia saginata* (গরুর ফিতা কৃমি) যারা কাঁচা বা আধা-সিদ্ধ মাংস খাওয়ার মাধ্যমে মানুষের ক্ষুদ্রান্তে সংক্রমণ করে খাদ্য শোষণসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা তৈরী করতে পারে। এমনকি এদের লার্ভা আক্রান্ত ব্যক্তির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রেও সংক্রমণ করতে পারে। *Ascaris lumbricoides* মানুষের দেহে প্রাপ্ত অন্যতম গোলকৃমি, যা বাচ্চাদের শারীরিক গঠণ ও বৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। *Trichinella spiralis* একটি অতি সুক্ষ কৃমি যা যথাযথভাবে রান্না না করা শূকরের মাংস খেলে সংক্রমণ হতে পারে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংশে প্রদাহ তৈরী করা সহ অনেক মারাত্মক ব্যাথা হতে পারে। *Ancylostoma* spp. (হুক ওয়ার্ম) মাটি ও দূষিত পরিবেশের মাধ্যমে ছড়ায় এবং মূলত চামড়াভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে। এই কৃমি আক্রান্ত শিশুর দেহের চামড়ায় বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ তৈরী করতে পারে।

বহিস্থঃ পরজীবীঃ *Sarcoptes scabiei* (স্ক্যাবিস মাইট) ত্বকে সংক্রমণ ঘটায়, যা খুব সহজেই অন্য ব্যক্তির শরীরে ছড়াতে পারে। উকুন ও আঠালী পশুর শরীর থেকে মানুষের শরীরে রক্ত শোষণ করে রোগ ছড়াতে পারে।

মানুষের দেহে জুনোটিক পরজীবী সংক্রমণের উৎস ও পথ

বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জুনোটিক পরজীবী সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে:

খাদ্যজনিত সংক্রমণ:

কাঁচা বা অপর্যাপ্ত সিদ্ধ মাংস, মাছ, দুধ, ডিম ও সবজি খাওয়ার মাধ্যমে। যেমন, Taenia saginata কাঁচা গরুর মাংস থেকে, Clonorchis sinensis বা Opisthorchis কার্প জাতীয় কাঁচা মাছ থেকে সংক্রমিত হতে পারে।

পানিজনিত সংক্রমণ:

দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে Giardia, Entamoeba, I Cryptosporidium ছড়ায়।

পরিবেশগত সংক্রমণ:

অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার, খোলা জায়গায় মলত্যাগ, ও পশুর মল মানুষের খাদ্যে মিশে গেলে ডিম বা লার্ভা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

সরাসরি সংক্রমণ:

গৃহপালিত পশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা কিংবা বহিস্থঃ পরজীবীর কামড় বা সংস্পর্শে।

স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

জুনোটিক পরজীবীর প্রভাবে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে পরিপাকতন্ত্রের রোগ যেমন আমাশয়, ডায়রিয়া, বমি, পেটব্যথা, ও অপুষ্টি হতে পারে। রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টি: হুকওয়ার্ম ও ফিতা কৃমি রক্ত শোষণ করে অ্যানিমিয়া ঘটায়।

- **স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা:** *Taenia solium* থেকে নিউরোসিস্টিসারকোসিস, যা খিঁচুনি ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
- **শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত:** বারবার ডায়রিয়া ও কৃমি সংক্রমণ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবে বেশ কিছু সমস্যা বিরাজমান:

- পশুপালন খামারে স্বাস্থ্যবিধি ও বায়োসিকিউরিটির অভাব।
- পশুর মল সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করায় সবজি ক্ষেতে ও পানির উৎসে দূষণ।
- কাঁচা বা আধা-সিদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রচলন।
- মাছ ও মাংস বাজারে অপর্যাপ্ত ও অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা।
- খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকানুন বাস্তবায়নের ঘাটতি।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার উপায়

জুনোটিক পরজীবী নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক উদ্যোগ প্রয়োজন যা নিম্নরূপ:

- খাদ্য প্রস্তুত ও রান্নার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ
- মাংস ও মাছ সম্পূর্ণ সিদ্ধ করা।
- কাঁচা শাকসবজি ভালোভাবে ধোয়া।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
- বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার।
- হাত ধোয়ার অভ্যাস।
- রান্নাঘর ও খাদ্য সংরক্ষণের জায়গা পরিষ্কার রাখা।
- পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ
- গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত কৃমিনাশক ও চিকিৎসা দেওয়া।
- খামারে বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ।
- খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও আইন বাস্তবায়ন
- খাদ্য ভেজাল ও দূষণ রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ।
- মাংস, দুধ ও মাছের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ল্যাব টেস্টিং ব্যবস্থা।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি
- সাধারণ জনগণকে খাদ্যবাহিত রোগ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করা।
- গণমাধ্যম ও শিক্ষাক্রমে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা।
- নিজস্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান সবার মাঝে প্রচার করা।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য অর্জনের পথে জুনোটিক পরজীবী একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা। এগুলো শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, বরং জাতীয় অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ রান্নার অভ্যাস, পশুপালন ব্যবস্থায় উন্নয়ন, এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ একসঙ্গে কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে "One Health" দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ মানুষ, পশু ও পরিবেশের স্বাস্থ্যকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

প্রজন্মের রক্ষায় নিরাপদ খাবার চাই

প্রফেসর ডঃ আবদুল আউয়াল খান, আইন বিভাগ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা-১২২৯

বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজালের নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা আজ এক গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশটি এখনও ব্যাপক খাদ্যদূষণের সমস্যায় ভুগছে। বাংলাদেশে আজ এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে একজন ক্রেতা সে বাজারের যত ভালো জায়গা থেকেই খাদ্যপণ্য ক্রয় করুক না কেন মনের ভিতরে একটা সন্দেহ থেকেই যায় যে খাবারটা আসলেই নিরাপদ ও ভেজাল মুক্ত কিনা। শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে সব ধরনের খাবারে ভয়ংকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এখন আর নতুন কিছু নয়। এসব ভেজাল ও বিষাক্ত উপাদান আমাদের শরীরে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করছে, যার প্রভাব পড়ছে পুরো জাতির স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর।

২০২৪ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সূত্রমতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর ভেজাল বা অনিরাপদ খাদ্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতিদিন দেশের প্রায় ৫% জনগণ ডায়রিয়া বা খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ও শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর একটি বড় অংশ অনিরাপদ খাদ্যের কারণে হচ্ছে। ভেজাল খাদ্যের কারণে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। মেয়াদোত্তীর্ণ, রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত, অপরিষ্কার পরিবেশে উৎপাদন, ইত্যাদি কারণে অন্ত্র, লিভার ও কিডনির সমস্যা, ক্যান্সার সহ নানা প্রাণঘাতী অসুখে প্রতিনিয়ত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এত কিছুর পরেও বাংলাদেশ খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্যের রক্ষায় আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ সন্তোষজনক বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের সংবিধান জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুযায়ী, জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। অথচ এখন পর্যন্ত কোন সরকারই জনগণের এই সাংবিধানিক অধিকারকে পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারেনি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ অনুসারে জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত আছে। তাই নিরাপদ খাদ্যের অধিকারের সাথেই জীবনের অধিকার সম্পর্কিত । এই কারণে, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয় ।

বাংলাদেশে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (Special Powers Act, ১৯৭৪) আইনের ধারা ২৫সি অনুসারে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ বা প্রসাধনীতে ভেজাল মেশানো বা বিক্রির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে। এই আইন অনুসারে কেউ খাদ্য, পানীয়, ঔষধ বা প্রসাধনীতে ভেজাল মেশায় বা বিক্রি করে, তাহলে অপরাধের মাত্রা ভেদে মৃত্যুদণ্ড, আজীবন কারাদণ্ড, বা যে কোনো মেয়াদে কঠোর কারাদণ্ড, যা ১৪ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

২০১৩ সালে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণীত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ভিতরে রয়েছে খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা, খাদ্যের ভেজাল নিয়ন্ত্রন ও মান নিরূপন, আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ, খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বা রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি বা মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ সহ জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সংশ্লিস্থ সকল বিষয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ব্যাপক ক্ষমতা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে এই আইনের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছে কিন্তু সেখানে সাধারন জনগন বা ভোক্তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়নি। নিরাপদ খাদ্য আইনের মাধ্যমে দৃশ্যমান যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বাবস্থা নেয়া। কিন্তু বেশিরভাগ মোবাইল কোর্ট ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পরিচালিত হওয়ার কারনে ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রনে সারাদেশে কার্যকর কোন প্রভাব ফেলছেনা। বাংলাদেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করার কারনে সস্তা ও ভেজাল খাবারের অবৈধ সরবরাহ বন্ধ করা কঠিন হয়ে যায়। এ জন্য সরকারকেই নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। অন্য দিকে ভেজাল খাবারের প্রকৃতি ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারন মানুষের সচেতনাতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নাই। সরকার ও সচেতন নাগরিকদের আইনের যথাযত প্রয়োগে পরপস্পরকে সহযোগিতা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর উপর ভিত্তি করে যে প্রবিধানমালা ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নমানের, ঝুকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা, ২০২১, নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০, খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭ ইত্যাদি। তবে শুধু আইন দিয়েই এই সঙ্কট কাটানো সম্ভব না। আমাদের প্রজন্ম রক্ষায় আমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে যেন আগামি দিনটি যেন নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে শুরু করতে পারি।

খাদ্য নিরাপত্তায় এক অভিন্ন কৌশল

ড. মোঃ মাসুদ রানা, পিএসও (প্রাণিসম্পদ), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সিএসও (প্রাণিসম্পদ), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
মোঃ ইউসুফ আলী, এসএসও, পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১

প্রতিদিন আমরা বাজারে বা সোস্যাল মিডিয়ায় কি দেখছি, বাজারে গিয়ে কি কিনছি এবং নিত্যদিন কি খাচ্ছি তা নিয়ে আমাদের নানান কৌতুহল ও প্রশ্ন। আসলে প্রতিদিন আমরা খাবার টেবিলে যা দেখছি বা খাচ্ছি সবই কি দূষিত উৎস থেকে আসা বা বিষাক্ত কিংবা প্রক্রিয়াজাতকরণে সঠিকতার অভাব এসব নিয়ে আমাদের জানার যেমন শেষ নেই, তেমনি জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প উৎস খোঁজার ক্ষেত্রে আগ্রহ বা চেষ্টারও কোন কমতি নেই। তবুও এসব বিছু জেনে-শুনে বা বুঝে আমরা যেন অনেকটাই নিরুপায় বা আঁধারে নিমজ্জিত ভোক্তা। তবে হ্যাঁ, আমাদের সুস্থ্য জীবনযাপনের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য উপাদানের কোন বিকল্প নেই, ইহাই অন্যতম প্রধান শর্ত। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চয়তার অভাবে প্রতিদিন আমরা নানারকম খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। বর্তমান এই আধুনিক কৃষি, পশুপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, রাসায়নিক দূষণ, প্রাণিজ উৎস থেকে উদ্ভূত সংক্রামক রোগ, খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, ভারী ধাতুর উপস্থিতি ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ। এসব সমস্যা একক কোনো খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ, প্রাণি ও পরিবেশ-এই তিনটি খাত একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইহার ভারসাম্য নষ্ট হলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে One Health Approach খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইহার মূল লক্ষ্য হলো মানুষ, প্রাণি ও পরিবেশ-এই তিনটির ভারসাম্য বজায় রেখে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা করা।

One Health Approach-ধারণাটি শতাধিক বছরের পুরোনো হলেও মূলত ১৯৯০-সালের দিকে প্রথম এর প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের ধারণা প্রকাশ পায়। এই ধারণার মূল ভাবনা হলো-মানুষ ও প্রাণির স্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভশীল এবং তারা যে পরিবেশে একসঙ্গে বসবাস করে, সেই পরিবেশের স্বাস্থ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ, প্রাণি ও পরিবেশের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য বা ভারসাম্য নিশ্চিতে One Health Approach প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশে ২০০৮ One Health-এর যাত্রা শুরু হয় সাধারণত One Health Bangladesh নামে একটি সিভিল সোসাইটি ফোরাম গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত One Health-ধারণাকে মানুষের কাছে পরিচিত ও প্রচার করা এবং মানুষ, প্রাণি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কাজ করেছিল। বর্তমানে সরকারীভাবে One Health প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে এবং Bangladesh One Health Strategeic Framwork (২০২৫-২০৩০) বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয়ে একটি মাল্টি সেক্টরাল সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোর মূল লক্ষ হলো বাংলাদেশ ও বিশ্বকে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং একটি বৈষম্যমুক্ত দেশ ও সমাজ গড়ে তোলা।

সাম্প্রতিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর দূষিত খাবারের কারণে প্রায় ৬ কোটি মানুষ অসুস্থ্য হয়ে পড়ছে এবং প্রায় ৪ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে সকলের জন্য 'খামার থেকে টেবিল পর্যন্ত (From farm to table)' খাদ্য নিরাপত্তা একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে, যা খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের উপর নির্ভর করে। আর এই সঠিক স্বাস্থবিধি অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Agricultural Practices (GAP), Good Livestock Husbandry Practices (GLHP), Good Manfacturing Practices (GNP), traceabilit নির্ণয়ে সাশ্রয়ী ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা মানদন্ড মেনে চলা, কার্যক্রর আইন ও প্রতিরোধ কাঠামো গড়ে তোলা, নিয়মিত পরিদর্শন ও অডিটিং, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO, ২০১৭), খাদ্য নিরাপত্তা, জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ মোকাবেলার জন্য One Health Approach প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে উন্নত দেশেগুলোতে জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণে One Health পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে। এই রোগ প্রাকৃতিকভাবে মানুষ ও প্রাণির উভয়ের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। তথ্যমতে মানুষের সংক্রামক রোগের (Infectious disease) প্রায় ৬০% এবং উদ্ভূত সংক্রামক রোগের (emerging infectious disease) প্রায় ৭৫% জুনোটিক জীবাণু দায়ী। কারণ এই জুনোটিক জীবাণুসমূহ মূলত দূষিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ করে দূষিত প্রাণিজাত খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

বর্তমানে আর একটি বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অর্থ্যাৎ অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের শরীরে কাজ করছে না বা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে পারছে না। এর মূল কারণ মানব ও প্রাণি চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিকের অতিব্যবহার বা যথাযথ নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে ববহার করা। ফলে রোগ-প্রতিরোধ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এখন একটি বৈশ্বিক উদ্যেগের বিষয় যা মানব ও প্রাণিস্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে, সামাজিক ও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি করছে এবং পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৫০ সালা নাগাদ প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সংক্রমণের কারণে মারা যেতে পারে। তাই এখন থেকেই আমাদের একটি সুপরিকল্পিত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, গবেষণা ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষ, প্রাণি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিবেশে মাইক্রোবায়োটার মধ্যে দ্রুত জেনেটিক পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের যত্রতত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য One Health Approach বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকির এসব বিষয়কে বিবেচনা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে One Health এর মূল লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এখন বৈশ্বিকভাবে ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (CDC, USA)-এর মতো প্রধান সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো One Health প্রতিষ্ঠার জন্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন রোগসমূহ প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই প্রোগ্রামগুলো প্রধানত প্রাণি ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর কেন্দ্রীভূত আছে। তবে One Health মডেলকে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও মানবিকবিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন যাতে মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষের স্বাস্থ্যে উদ্ভূত জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য সত্যিকারের একটি আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা গড়ে ওঠে।

সর্বোপরি, আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে One Health Approach একটি কার্যকর ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ইহা বাস্তবায়নে শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে চললেই হবে না বরং একটি সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরী। যদিও এই পদ্ধতি বাস্তবায়নে নানা চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা রয়েছে , এসবের মধ্যে গবেষণা, রোগ নির্ণয়, নজরদারির ক্ষেত্রে তহবিলের স্বল্পতা এবং তথ্য আদান-প্রদানের সীমাবদ্ধতা অন্যতম, তবে সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বয়ে এসব মোকাবেলা করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে, বায়োমেডিকেল ও কৃষিবিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি Holistic Vision গড়ে তুলতে হবে যা গবেষক, একাডেমিক ও পরিবেশবিদদের One Health বাস্তবায়নে দক্ষ পেশাজীবীতে রূপান্তর করবে এবং উদ্ভূত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সমাধানে কাজ করবে। এভাবে আমাদের সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় One Health Approach-কে শক্তিশালী করে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশকে স্বাস্থুঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে।

খাদ্য অপচয়ঃ কারণ ও প্রতিকার

ড. মো. আব্দুল ওয়ারেছ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

খাদ্য অপচয় বা ভোজনবর্জ্য বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাজাসহ পৃথিবীতে ৮০ কোটির উপরে মানুষ যেখানে অনাহারে ভুগছে, অপুষ্টিতে রয়েছে এবং নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে, সেখানে প্রতি বছর প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যমানের খাবারের অপচয় মানবতার প্রতি চরম অপমান। এই অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনাটি পৃথিবীব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাকে চরম হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে, পরিবেশ বিপর্যয়ে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, বিশ্বব্যাপী খাদ্য অপচয়ের কারণ ও প্রভাবগুলো জানা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধান করা সময়ের একান্ত দাবী।

খাদ্য অপচয় বলতে সাধারণভাবে অভুক্ত খাদ্যকে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়ার ঘটনাকে বোঝায়। খাদ্য ব্যবস্থার সর্বত্র যেমন খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ, বিতরণ, বিপণন এবং গ্রহণ ইত্যাদি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাদ্য অপচয় হয়ে থাকে। তবে, খাদ্য ক্ষতি (Food Loss) ও খাদ্য অপচয়ের (Food Waste) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। খাদ্য ক্ষতি ঘটে থাকে খাদ্য সরবরাহের প্রাথমিক পর্যায়ে, যেমন কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহন পর্যায়ে খাদ্যের গুণগত মান হারানো যা মূলত নির্ভর করে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি কর্মদক্ষতার উপর। তাই, নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে সাধারণত খাদ্য ক্ষতি বেশি ঘটে। অপরদিকে, খাদ্য অপচয় ঘটে মূলত খাদ্য সরবরাহের শেষ পর্যায়ে, যেখানে খাদ্য মানুষের জন্য পুষ্টিকর ও গ্রহণযোগ্য অবস্থায় বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেয়া হয় যা নির্ভর করে মানুষের সচেতনতা, ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের উপর। সেজন্য, উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে খাদ্য অপচয়ের মাত্রা তুলনামূলক বেশী। উল্লেখ্য, FAO খাদ্য ক্ষতি (Food Loss) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) খাদ্যের অপচয় (Food Waste) পরিমাপের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে, ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বাংলায় খাদ্য অপচয় বলতে Food Waste এবং Food Loss দুটোকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর সর্বশেষ Food Waste Index-এর ২০২৪ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী মোট ১.০৫ বিলিয়ন টন খাবার অপচয় (Food Waste) হয়েছে, যা মোট খাদ্যের প্রায় ১৯ শতাংশ এবং FAO-এর প্রতিবেদন অনুযায়ি, খাদ্য ক্ষতির (Food Loss) হয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। মোট খাদ্য অপচয় ও ক্ষতির পরিমাণ ৩২ শতাংশ যা মোট খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। প্রকাশিত UNEP রিপোর্টে ১০২টি দেশের মধ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য অপচয়ের প্রবণতা ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। একজন বাংলাদেশী গড়ে বছরে খাদ্য অপচয় করেছেন ৮২ কেজি, যা ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫৫ কেজি, ৩৩ কেজি, ৭৬ কেজি ও ৭৩ কেজি। অন্যদিকে, ভুটান ও মঙ্গোলিয়ায় এই অপচয়ের হার অনেক কম, যথাক্রমে, ১৯ কেজি ও ১৮ কেজি।

খাদ্য অপচয়ের বহুবিধ কারণ ও মাত্রা রয়েছে। উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ ও প্রান্তিক ভোক্তা পর্যায়ে ভোগ পর্যন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই খাদ্য ক্ষতি, বিনাশ, বর্জ্যকরণ ও ফেলে দেয়া ইত্যাদি উপায়ে অপচয় হয়ে থাকে। প্রথমত, কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত ক্ষেত্র; যেমন ফসল মাড়াইয়ের সময় মাঠে ফেলে রাখা রাখা হয়। বাংলাদেশে ধান কাটার পরে শুকানোর জন্য কয়েকদিন জমিতে ফেলে রাখা হয় যেসময়ে কিছু ধান মাটিতে পড়ে যায়, কিছু পশুপাখি খায় এবং নষ্ট করে। এছাড়া, পাতলা বা ছোট আকারের শস্য বা ফলমূল সংগ্রহের অদক্ষতা থেকে কিছু অংশ অপচয় হয়। এরপর রয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা, যা খাদ্যের দাবদাহ, দুর্ঘটনা বা নষ্টের কারণ হতে পারে। যেমনঃ চাল সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত আর্দ্রতার পরিমাণ হলো ১৪-১৫% (নতুন চালে) এবং ১০-১২% (পুরনো চালে), যা চালের স্থিতিশীলতা এবং গুণমান নিশ্চিত করে। এই আর্দ্রতার মাত্রা কমে গেলে চালের গুণমান কমে যায়, আর বেশি হলে তাতে পোকা বা ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে। সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থতাও খাদ্য অপচয়ের অন্যতম কারণ যেমন-হিমায়িত মাংস বা মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা অস্থিতিশীলতার কারণে খাদ্যমাণ কমে যেতে পারে। বিপণন ও খুচরা পর্যায়ে চাহিদার বিপরীতে অতিরিক্ত পরিমাণ সরবরাহও খাদ্য নষ্টের অন্যতম কারণ যার ফলশ্রুতিতে কাঁচা বাজারের পাশে প্রায়ই উদ্বৃত্ত সবজি পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেই সাথে, খাদ্য পণ্যের বাহ্যিক আকার বা রঙে এবং মানদণ্ড বাজার চাহিদায় একটি জোরালো প্রভাব ফেলে যেমন একটু বেশী পেঁচানো ঝিঙ্গা বা চিচিঙ্গা চোখে পড়লেই আমরা স্বহস্তে সেটিকে পাল্লা থেকে নামিয়ে রাখি। তবে, খাদ্য অপচয়ের সবচেয়ে মারাত্মক পর্যায় হচ্ছে বাসাবাড়ি, রেস্টুরেন্ট বা খাদ্য সেবা ও খুচরা পর্যায়ে; যা মোটের ৬০ শতাংশ। ঘরোয়া বা প্রান্তিক পর্যায়ে ভুলগুলোর মধ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত ক্রয়, খাদ্য শেষ না করা, প্যাকেটজাত খাবারের লেবেল বুঝতে না পারা, অতিরিক্ত পরিমাণ রান্না, ভুল সংরক্ষণ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্ডার এবং সব খাবার একটু চেখে দেখার প্রবণতা।

খাদ্য অপচয় আমাদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। খাদ্য অপচয়ের অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাপক; পরিবারিক থেকে শুরু করে জাতীয় অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অপচয়ের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সংকট ও মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।

অপচয় হওয়া খাদ্যের বাজার মূল্য হারানোর পাশাপাশি কৃষি ও খাদ্য শিল্পে বিনিয়োগকৃত কর্মঘন্টা ও পুঁজি নষ্ট হয়। তাই, খাদ্য অপচয় কমলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহযোগিতা পাবে, খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহজপ্রাপ্য হবে।

UNEP-এর ২০২৪ সালের ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্ট অনুযায়ী, খাদ্য অপচয় বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সংকটের একটি মূল কারণ, যা জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয় করে। খাদ্য অপচয় বিশ্বব্যাপী ১০ শতাংশ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, ২০২২)। অপচয় হওয়া খাদ্যের কারণে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়, যা জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। অধিকন্তু, অপচয়কৃত বা নষ্ট খাদ্য পুনর্ব্যবহার যেমন কম্পোস্ট সার তৈরী না করলে সেগুলি পরিবেশের উপর নানা নেতিবাচক পরিণাম বয়ে আনে। উদাহরণস্বরূপ, জৈব বর্জ্যের জীবাণু কর্তৃক অবাত হজমের (Anaerobic Digestion) ফলে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। খাদ্য বর্জ্যের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ক্ষয় হয় যা জলবায়ুর ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। এছাড়া, খাদ্য অপচয়ের ফলে প্রকৃতপক্ষে খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, পানি, শক্তি ও শ্রম ইত্যাদি সম্পদের অপচয় ঘটে। তাই, পরিবেশ সুরক্ষায় ও টেকসই উন্নয়নে খাদ্য অপচয় কমানো অতীব জরুরি।

খাদ্য অপচয়ের সবচেয়ে নিষ্ঠুর বাস্তবতা হলো একপাশে আমাদের উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপচয় হয় অন্যপাশে পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮০০ মিলিয়ন। অর্থাৎ বিশ্বে প্রকৃত অর্থে কোন খাদ্য সংকট নেই; মূল সমস্যা খাদ্য অপচয়, অসম বন্টন ও প্রাপ্যতা ঘাটতি। এছাড়াও, FAO-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ি ২০৫০ সালের ৯.৭ বিলিয়ন জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ৭০ শতাংশ বাড়াতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য অপচয় অবশ্যই যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খাদ্য অপচয়কে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশেষ করে, লক্ষ্য ২: ক্ষুধা দূরীকরণ, লক্ষ্য ১২: পরিমিত উৎপাদন ও ভোগ, লক্ষ্য ১৩: পরিবেশ কার্যক্রম এবং লক্ষ্য ১৪: জলজ প্রাণ সরাসরি জড়িত। বিশেষত, লক্ষ্যমাত্রা ১২.৩ অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যের খুচরা বিক্রয় ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু খাদ্য অপচয় অর্ধেকে নামানো এবং উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষতি হ্রাস করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তদুপরি, মাছ এবং প্রাণিজ খাদ্য অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে। তাই, কার্যকর নীতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য অপচয় রোধ করা টেকসই ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য।

খাদ্য অপচয় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ সময়ের জোরালো দাবী। যেমন, নীতি প্রণয়ন, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, পুনর্বিনিয়োগ, পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি। রেস্টুরেন্ট ও খাদ্য সেবা পর্যায়ে এমনকি নিজের বাসায় খাবার গ্রহণের সময় অল্প অল্প করে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার প্লেটে নেয়া। যেসকল ফল, সবজি বা অন্য খাবার রং বা আকারের কারণে ক্রেতারা কিনতে অনাগ্রহী, সেগুলো খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানিতে সরবরাহ করা। খাদ্য মানের সাথে সংগতিপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ। খাদ্য অপচয় ট্র্যাকিং, বিশ্লেষণ সিস্টেম চালু করা এবং অব্যবহৃত খাবার নিজে বা দাতব্যপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাহিদাসম্পন্ন স্থানে সম্মানের সাথে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। বাড়িতে সঠিক ক্রয় ও রান্না পরিকল্পনা জরুরী। বিনষ্ট খাদ্য পশু খাদ্য, কম্পোস্টিং ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে যা পরিবেশবান্ধব। অপচয় রোধে পারিবারিক পর্যায়ে ও বৃহত্তর পরিসরে সংরক্ষণাগার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা বেশ কার্যকর।

খাদ্য অপচয় রোধে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কিছু চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ফ্রান্স ২০১৬ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপারমার্কেটগুলোতে অবিক্রিত খাবার ফেলে না দিয়ে দাতব্য প্রতিষ্টানে দান করা বাধ্যতামূলক করেছে। একই সালে ইতালি কর্তৃপক্ষ দাতব্য প্রতিষ্টানে দান করা খাবারের হিসেব অনুপাতে প্রণোদনা হিসেবে কর কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। বিশেষ করে, যুক্তরাজ্যের "লাভ ফুড, হেট ওয়েস্ট" ক্যাম্পেইনের সচেতনতায় ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বাসাবাড়িতে ১৫% খাদ্য অপচয় কমানো সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন দেশে পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে খাদ্য অপচয় হ্রাসে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে খাদ্য পুনর্ব্যবহার অন্যতম।

খাদ্য অপচয় বিশ্বব্যাপী একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ, যা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। খাদ্য অপচয় হ্রাসের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। হাসপাতাল, রেস্তোরাঁ এবং ঘরোয়া পর্যায়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে খাবার পুনর্বিতরণ, ট্র্যাকিং ও বিশ্লেষণ এবং পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে। উদ্যোগ গুলো বিকাশমান দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করবে এবং টেকসই খাদ্য পরিবেশ নির্মাণে সহায়ক হবে। ফলশ্রুতিতে, খাদ্যব্যবস্থার কার্বন তীব্রতা (Carbon intensity) অধিকতর দক্ষভাবে হ্রাস করা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তিই পারে খাদ্য ক্ষতি কমাতে

আবুল বাশার মিরাজ, কৃষিবিদ ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

খাদ্য নিরাপত্তা কেবল উৎপাদন বাড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উৎপাদনের পর খাদ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাজারে পৌঁছে দেওয়াটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর উৎপাদিত মোট খাদ্যের প্রায় ১৩.২ শতাংশ বাজারে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়। ভোক্তা পর্যায়ের অপচয় যোগ করলে এই সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছে, যা দিয়ে অনায়াসে কোটি কোটি মানুষের অনাহার দূর করা সম্ভব হতো। দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক; এখানে মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশে আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, আম, কলা ও অন্যান্য ফল-সবজির গড়ে ২৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত পোস্ট-হার্ভেস্ট ক্ষতি রেকর্ড করা হয়েছে। এর ফলে শুধু কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, জাতীয় অর্থনীতিও বড় ধরনের ধাক্কা খায়, পাশাপাশি জমি, পানি, সার, কীটনাশক ও শ্রমের অপচয় ঘটে, যা পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর।

এই ক্ষতি কমাতে প্রযুক্তিই হতে পারে মূল হাতিয়ার। বাংলাদেশের মতো বিদ্যুৎ ঘাটতিপূর্ণ দেশে সৌরশক্তিচালিত কোল্ড স্টোরেজ ফল ও সবজি সংরক্ষণে আশার আলো দেখিয়েছে। কয়েকটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া এসব কোল্ড রুমে দেখা গেছে, যেখানে আগে তিন-চার দিনে নষ্ট হয়ে যেত, সেখানে এখন ১০-১২ দিন ভালো থাকে। এর ফলে কৃষকরা আর বাধ্য হয়ে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে না; বরং সুবিধাজনক সময়ে ভালো দামে বিক্রি করতে পারছেন। ধান, গম, ডাল সংরক্ষণে হর্মেটিক ব্যাগ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, কারণ এতে বাতাস ও আর্দ্রতা ঢুকতে না পারায় খাদ্য দীর্ঘদিন ভালো থাকে। আফ্রিকায় এ ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করে খাদ্য ক্ষতি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে, যা বাংলাদেশেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। ফল ও সবজির ক্ষেত্রে উন্নত ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণের মাধ্যমে রপ্তানি সময় পণ্য দীর্ঘসময় ভালো রাখা যায়।

এছাড়া ডিজিটাল প্রযুক্তি কৃষকদের হাতে বাজারসংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দিয়েছে। মোবাইল অ্যাপ ও অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে কৃষকরা এখন জানতে পারেন কোথায়, কখন এবং কোন ফসলের চাহিদা বেশি। ফলে এক এলাকায় অতিরিক্ত সরবরাহ জমে গিয়ে দাম পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে। ভারতে এ ধরনের ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থার সফলতা দেখা গেছে, যেখানে কৃষকরা সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। বাংলাদেশেও "কৃষক বন্ধু অ্যাপ" ও স্থানীয় সংগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষক ও বাজারকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা সম্ভব।

মৌসুমি ফসল যেমন আম, টমেটো বা দুধ অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ছোট স্কেল প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তুলে এগুলো থেকে জ্যাম, জুস, আচার, সস বা পাউডার তৈরি করলে তা সারা বছর বিক্রি করা সম্ভব। এতে শুধু অপচয় রোধ হয় না, নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানও তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ছোট ও মাঝারি এগ্রো প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তুললে পোস্ট-হার্ভেস্ট ক্ষতি ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। একইভাবে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন স্মার্ট সেন্সর ও আইওটি ব্যবহারে সংরক্ষণাগারে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও গ্যাস পর্যবেক্ষণ করা যায়, যাতে দ্রুত খাদ্য নষ্ট হওয়ার আগেই সতর্কবার্তা পাওয়া যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কোথায় কোন ফসলের চাহিদা বাড়বে তা আগেভাগেই জানা যায় এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ভারতে "ন্যাশনাল কোল্ড চেইন গ্রিড" চালু হয়েছে, যেখানে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত একীভূত ঠান্ডা সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। নেপালে পাহাড়ি অঞ্চলে সৌরশক্তিচালিত কোল্ড স্টোরেজ বসানো হয়েছে এবং শ্রীলঙ্কায় ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের প্রেক্ষাপটে কার্যকর সমাধান খুঁজে নিতে পারে।

তবে কিছু চ্যালেঞ্জও আছে। উন্নত প্রযুক্তির দাম বেশি হওয়ায় ছোট কৃষকের পক্ষে তা বহন করা কঠিন। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোর ঘাটতি রয়ে গেছে। কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা সীমিত এবং নীতি সহায়তা ও সহজ ঋণের ঘাটতি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই খাদ্য ক্ষতি কমাতে হলে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কৃষকদের হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের মূল শিক্ষা হলো, খাদ্য অপচয় মানে শুধু খাদ্যের ক্ষতি নয়, বরং কৃষকের শ্রম, সময়, অর্থ ও পরিবেশের অপচয়। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যদি খাদ্য ক্ষতি অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারি, তবে বাংলাদেশ কেবল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবেও উঠে আসতে পারে। "হাতে হাতে: উন্নত খাদ্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ"- এই প্রতিপাদ্য বাস্তবায়িত হবে তখনই, যখন প্রযুক্তি, নীতি সহায়তা ও সহযোগিতা মিলিত হয়ে বাংলাদেশের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থাকে টেকসই ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে।

খাদ্যে বায়ো ইনোভেশনঃ বিজ্ঞানের স্পর্শে পুষ্টির নতুন দিগন্ত

তাসনিম হায়দার, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দী মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়, যেখানে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন একত্রে আমাদের জীবনধারার প্রতিটি ক্ষেত্রকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। আগে খাদ্য মানে ছিল কেবল পেট ভরানোর উপাদান, কিন্তু আজ খাদ্য মানে হলো স্বাস্থ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও টেকসই ভবিষ্যতের প্রতীক। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে একটি শব্দ বায়ো ইনোভেশন, অর্থাৎ জৈব উদ্ভাবন। খাদ্যের উৎপাদন, পুষ্টিগুণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণে জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠছে এক নতুন দিগন্ত, যেখানে খাদ্য শুধু প্রয়োজন নয় বরং এক বিজ্ঞাননির্ভর আশ্বাস।

বায়ো ইনোভেশন কী ও কেন গুরুত্বপূর্ণ

বায়ো ইনোভেশন হলো জীববিজ্ঞান, জিন প্রকৌশল, বায়োকেমিস্ট্রি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার এক নবযুগ। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে প্রাকৃতিক জৈব কার্যক্রমকে উন্নত করে তৈরি করা হয় আরও পুষ্টিকর, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব খাদ্য। উদাহরণস্বরূপ, জিন সম্পাদনা (CRISPR-Cas9) প্রযুক্তিতে এমন ধান তৈরি হয়েছে যা কীট প্রতিরোধী এবং একই সঙ্গে পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বায়োফর্টিফিকেশন পদ্ধতিতে ফসলের ভেতরেই ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যোগ করা হচ্ছে, যেমন ভিটামিন অ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস। ল্যাব গ্রোন মাংস ও দুধ প্রাণী হত্যা ছাড়াই উৎপাদন করা সম্ভব, যা খাদ্যকে নৈতিকতার সীমানায় নিয়ে যাচ্ছে। এইসব উদাহরণ প্রমাণ করে, বায়ো ইনোভেশন ইন ফুড কেবল প্রযুক্তি নয়, এটি মানবতা, বিজ্ঞান ও ভবিষ্যতের এক সম্মিলিত দর্শন।

খাদ্য উৎপাদনে বায়োটেকনোলজির বিপ্লব

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে কৃষি উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে হুমকির মুখে। এই প্রেক্ষাপটে বায়ো ইনোভেটিভ কৃষি প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার আলো দেখাচ্ছে।

জেনেটিকালি মডিফায়েড (এগ) ফসলঃ এমন ফসল তৈরি হচ্ছে যা পোকামাকড়, রোগ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে নিজেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের Bt বেগুন এরই উজ্জ্বল উদাহরণ, যা কীটনাশক ব্যবহার ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি করেছে।

মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ফার্টিলাইজারঃ রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষতি পূরণে জৈব সার বা বায়োফার্টিলাইজার একটি কার্যকর বিকল্প। এতে মাটির প্রাকৃতিক গুণ বজায় থাকে, কৃষিজমির দীর্ঘস্থায়িত্ব বাড়ে এবং পরিবেশ থাকে সুরক্ষিত।

প্রিসিশন ফার্মিং (Precision Farming): AI ও সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন প্রতিটি জমির সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী সার, পানি ও কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়। এতে অপচয় কমে, উৎপাদন বাড়ে এবং খাদ্য হয় আরও নিরাপদ। ফলস্বরূপ, কৃষি আজ শুধু শ্রম নয়, এটি এক ডেটা নির্ভর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি ও মান নিয়ন্ত্রণে বায়ো ইনোভেশন

খাদ্যের মান ও পুষ্টিগুণ এখন আর প্রাকৃতিক উপাদানেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে উন্নত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো বায়োফর্টিফিকেশন এবং ফাংশনাল ফুড। বায়োফর্টিফিকেশনে জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শস্যে ভিটামিন, আয়রন, জিঙ্ক বা প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, যেমন আয়রন রাইস বা প্রোটিন সমৃদ্ধ ভুট্টা। ফাংশনাল ফুড হলো এমন খাদ্য যাতে প্রোবায়োটিক, ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত থাকে, যা শুধু পুষ্টিই নয় বরং রোগ প্রতিরোধেও সহায়ক। এছাড়া উঘঅ ট্রেসিং প্রযুক্তি এখন খাদ্যের উৎস ও গুণমান যাচাইয়ে অত্যন্ত কার্যকর। অও চালিত স্ক্যানার ও বিশ্লেষণ প্রযুক্তি দিয়ে খাদ্যের ভেতরের রাসায়নিক উপাদান পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়, যা মান নিয়ন্ত্রণকে আরও নিখুঁত করছে।

খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে জৈব উদ্ভাবন

বায়ো ইনোভেশন শুধু ফসল উৎপাদনেই নয়, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বায়োপলিমার প্যাকেজিংয়ে পচনশীল প্লাস্টিকের পরিবর্তে কর্ন স্টার্চ বা প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি প্যাকেজিং এখন পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ বিকল্প। ন্যানো কোটিং প্রযুক্তি খাদ্যের ওপর অদৃশ্য প্রতিরোধ স্তর তৈরি করে অক্সিডেশন ও ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করছে। সংরক্ষণে রাসায়নিকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক এনজাইম ব্যবহারে খাদ্যের স্বাদ, পুষ্টি ও গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে। ফলে খাদ্য সংরক্ষণ আজ এক জীববৈজ্ঞানিক প্রকৌশলের সাফল্য, যেখানে বিজ্ঞান নিরাপত্তার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে পরিবেশের সুরক্ষাও।

খাদ্যাভ্যাস ও ভোক্তা আচরণে জৈব উদ্ভাবনের প্রভাব

আজকের মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা শুধু খাবারের স্বাদে নয়, উৎস ও উপাদানেও আগ্রহী। তারা জানতে চায়, এই খাবার কোথা থেকে এসেছে, এতে কী আছে, এটি কি সত্যিই নিরাপদ।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছে বায়ো ইনোভেটিভ প্রযুক্তি। ডিজিটাল ফুড লেবেলিং, ব্লকচেইন ট্র্যাকিং এবং জিন ট্রেসিং এখন খাদ্য বিপণনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে। একই সঙ্গে ওয়্যারেবল ডিভাইস ও স্মার্টফোন অ্যাপ মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক খাদ্য পরিকল্পনা তৈরি করছে, যেখানে বিজ্ঞান, পুষ্টি ও প্রযুক্তি একত্রিত হয়ে গড়ে তুলছে স্মার্ট নিউট্রিশন সংস্কৃতি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বায়ো ইনোভেশন

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বায়ো ইনোভেশনের প্রয়োগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARC) ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক জেনেটিক ফসল উদ্ভাবনে কাজ করছে। মাছ চাষে বায়োফ্লক প্রযুক্তি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যেখানে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পানি বিশুদ্ধ রাখা হয় এবং উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দুধ উৎপাদনে প্রোবায়োটিক কালচার ব্যবহারের ফলে সংরক্ষণকাল ও মান উভয়ই উন্নত হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তারা বায়োপ্যাকেজিং, অর্গানিক প্রসেসিং এবং খাদ্য প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন। এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের খাদ্যব্যবস্থাকে টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

তবে উন্নতির এই যাত্রায় কিছু প্রতিবন্ধকতা এখনো বিদ্যমান। পর্যাপ্ত গবেষণা তহবিল ও উন্নত ল্যাব সুবিধার ঘাটতি, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার অভাব, জেনেটিকালি মডিফায়েড খাদ্য নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং দক্ষ মানবসম্পদের স্বল্পতা। এই বাধাগুলো দূর করতে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১০ বিলিয়নে। এত বিশাল জনসংখ্যাকে খাদ্য সরবরাহের একমাত্র টেকসই উপায় হলো বায়ো ইনোভেশন। ভবিষ্যতে আমরা দেখব ল্যাব গ্রোন প্রোটিন ও প্ল্যান্ট বেসড মাংস, জিন এডিটেড পুষ্টিকর ফসল এবং বায়োসেন্সর নিয়ন্ত্রিত খাদ্য ট্র্যাকিং ব্যবস্থা। এই প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে খাদ্য হবে আরও নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশ যদি এখন থেকেই গবেষণা, শিক্ষা ও নীতিগত সহায়তায় বিনিয়োগ বাড়ায়, তাহলে বায়ো ইনোভেশন ইন ফুড হতে পারে আমাদের টেকসই খাদ্য ভবিষ্যতের রূপরেখা।

উপসংহার

খাদ্য আর কেবল প্রকৃতির দান নয়, এটি এখন বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও মানবতার সমন্বিত এক ফল। বায়ো ইনোভেশন সেই বিজ্ঞানের হাত ধরে খাদ্যের প্রতিটি স্তরে উৎপাদন, পুষ্টি, সংরক্ষণ, বিপণন ও নিরাপত্তায় নতুন সংজ্ঞা যোগ করছে। যে জাতি বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্য ব্যবস্থায় দক্ষ, সেই জাতিই হবে টেকসই ও সমৃদ্ধ। আমাদের ভবিষ্যতের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নির্ভর করছে এই জৈব উদ্ভাবনের সফল প্রয়োগের ওপর। তাই বলা যায়, বায়ো ইনোভেশনই আগামী দিনের খাদ্য বিপ্লবের নাম।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (BFSA), ২০২৪।

২. FAO, Biotechnology Applications in Food Security and Nutrition, 2024.

৩. IFPRI, Biofortification for Nutrition Improvement, 2022.

৪. WHO, Food Safety and Modern Biotechnology, 2023.

৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC), জৈব উদ্ভাবন ও খাদ্য প্রযুক্তি প্রতিবেদন, ২০২৩।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা প্রযুক্তি: মাছ ও মাংস সংরক্ষণের নতুন দিগন্ত

সাইদুজ্জামান, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

ভূমিকা

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশের বাস্তবতা বিশ্ব খাদ্যব্যবস্থায় নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা বর্তমানে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে উৎপাদিত মোট খাদ্যের প্রায় ১৪ শতাংশ বাজারে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়, যার সিংহভাগই মাছ ও মাংসজাতের মতো দ্রুত পচনশীল পণ্য। বাংলাদেশে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত হিমায়ন-শৃঙ্খল সুবিধা (কোল্ড-চেইন) এবং ভোক্তা সচেতনতার অভাব মিলিয়ে খাদ্য অপচয় ব্যাপক হারে ঘটে।

বাংলাদেশের খাদ্য অপচয়ের ভয়াবহতা: বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যের প্রায় ৩৪ শতাংশ নষ্ট হয়, যার অর্থনৈতিক মূল্য দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ শতাংশ-এর সমান। মাছের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির হার প্রায় ৩৬ শতাংশ। প্রায় ২০২৫ শতাংশ মাছ ও মাংস নষ্ট হওয়ার কারণে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, যা দেশের জিডিপি-তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ১৩ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমনের জন্য দায়ী।

বাংলাদেশের অর্থনীতি, পুষ্টি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য মাছ ও মাংস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালে দেশ প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করেছে, যা বৈশ্বিকভাবে চতুর্থ অবস্থান। এই বিপুল উৎপাদনের পরও খাদ্য অপচয় এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রবন্ধে আমরা মাছ ও মাংস সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক দিক, আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের দিগন্ত নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা: মাছ ও মাংস মানব শরীরের জন্য "সম্পূর্ণ প্রোটিন" এর উৎস। এগুলিতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড (ইপিএ/ডিএইচএ), ভিটামিন ডি, সেলেনিয়াম এবং আয়রন বেশি থাকে, যা হৃদ-সংবহনতন্ত্র, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ও জ্ঞানীয় স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (যেমন ভিটামিন ই, উদ্ভিজ্জ পলিফেনল) ব্যবহার করে লিপিড জারন (অক্সিডেশন) এবং পুষ্টি হ্রাস কমানো অপরিহার্য।

সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ঝুঁকি: মাছ ও মাংসে উচ্চ জলীয় অংশ (৭০-৮০%) থাকে এবং এতে উচ্চ পরিমাণে প্রোটিন ও ফ্যাট বিদ্যমান। মৃত্যুর পর মাছের পেশীতে এটিপি (অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট) ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যা পিএইচ কমিয়ে দেয় এবং দ্রুত পচন শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াতে অটোলিসিস (স্বয়ং-ভঙ্গন), অণুজীবের কার্যকলাপ এবং রাসায়নিক জারন ঘটে। প্রোটিন ও ফ্যাট ভেঙে বিকৃত গন্ধ সৃষ্টিকারী যৌগ (যেমন টিএমএ, টিভিবি-এন) এবং ক্ষতিকর অণুজীবের (যেমন লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেনেস) দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করতে আধুনিক সংরক্ষণ কৌশল অত্যাবশ্যক।

জলবায়ু ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা: নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, এবং বন্যা উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ উৎপাদনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু সহনশীল মোড়কীকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ কৌশলকে অপরিহার্য করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য হ্যাসেপ (HACCP), আইএসও ২২০০০, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা আধুনিকীকরণ আইন-এর কঠোর মানদণ্ড মেনে চলতে অতি উচ্চ চাপ প্রক্রিয়াকরণ (এইপি), বিকিরণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-ভিত্তিক শনাক্তকরণ (ট্রেসেবিলিটি) জরুরি।

আধুনিক টেকসই সংরক্ষণ প্রযুক্তি: বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও হার্ডল কৌশল

আধুনিক পদ্ধতিগুলো পণ্যের গুণমান ও পুষ্টি বজায় রেখে শেলফ-লাইফ বাড়াতে এবং অণুজীবের লোড কমাতে সক্ষম:

১. উন্নত হিমায়ন ও অ-তাপীয় প্রক্রিয়া

- **ক্রায়োজেনিক হিমায়ন (LN2):** তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে তাপমাত্রা অতি দ্রুত ১৯৬° C এ নামানো হয়। এই দ্রুত শীতলীকরণে স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে বরফ কণা মাত্র ৩৫ ক্রস আকারের হয়। এটি কোষ প্রাচীরের ক্ষতি কমিয়ে প্রোটিনের বিকৃতকরণ (ডিন্যাচারেশন) রোধ করে এবং ডিফ্রস্ট করার পর "জলীয় ক্ষতি" মাত্র ১২ শতাংশ-এ নামিয়ে আনে।

- **অতি উচ্চ চাপ প্রক্রিয়াকরণ (High Pressure Processing - HPP):** ৩০০-৬০০ মেগাপাস্কাল উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে লে শ্যাটেলিয়ারের নীতি অনুসারে, তাপ ছাড়াই প্যাথোজেন, ইস্ট ও মোল্ডকে নিষক্রিয় করা হয়। চাপ প্রয়োগে শুধুমাত্র অণুজীবের কোষ ঝিল্লি এবং কিছু কোয়ার্টারনারি স্ট্রাকচার প্রোটিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সমযোজী বন্ধন বা ভিটামিন নষ্ট হয় না, ফলে মাংসের রঙ, স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।
  পালসড ইলেকট্রিক ফিল্ড (PEF): মাছ ও মাংসের টিস্যুর মধ্যে স্বল্প-সময়ের জন্য ২০৮০ kV/cm উচ্চ ভোল্টেজ পালস প্রয়োগ করা হয়। এই পালস কোষ ঝিল্লিতে ইলেকট্রোপোরেশন ঘটায়, যার ফলে প্যাথোজেনের মৃত্যু ঘটে। যেহেতু প্রক্রিয়াকরণ তাপমাত্রা কম থাকে, তাই এটি ভিটামিন, স্বাদ ও টেক্সচার অক্ষুণ্ন রাখে।
- **বিকিরণ (Irradiation - গামা, এক্স-রে, ইলেকট্রন বিম):** এই পদ্ধতিটি আয়নাইজিং রেডিয়েশন ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের প্রজননক্ষমতা হারায়। এটি রোগসৃষ্টিকারী জীব, ইস্ট ও মোল্ড দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর এবং পণ্যের দীর্ঘমেয়াদী শেলফ-লাইফ নিশ্চিত করে।

২. **বায়ো-সংরক্ষণ, সক্রিয় মোড়কীকরণ ও হার্ডল কৌশল**

- **হার্ডল কৌশল (Hurdle Technology):** এটি একটি অত্যাধুনিক কৌশল যেখানে একাধিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি (যেমন: সংশোধিত বায়ুমণ্ডল মোড়কীকরণ + বায়ো-প্রিজারভেটিভ + এইপি) একসাথে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি প্রযুক্তি অণুজীবের জন্য একটি "প্রতিবন্ধক" তৈরি করে, যার ফলে অণুজীবের পক্ষে কোনো একটি প্রযুক্তিকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।
- ব্যাক্টেরিওসিনস ও স্থানীয় বায়ো-সংরক্ষক: নিসিন বা পেডিওসিন-এর মতো ল্যানথিওনিন-যুক্ত পেপটাইড ব্যবহার করে গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিদ্র গঠন ঘটানো হয়। স্থানীয় উৎস যেমন নিম, হলুদ, সজিনা পাতার নির্যাস ব্যবহার করেও প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তৈরি করা যেতে পারে।
- **সক্রিয় ও ভোজ্য মোড়কীকরণ (Active & Edible Packaging):** ভোজ্য প্রলেপ (চিটোসান, অ্যালজিনেট), এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যৌগ (থাইমল) মিশ্রিত মোড়কীকরণ উপাদান ব্যবহার করে পণ্যকে দীর্ঘ সময় সক্রিয় সুরক্ষা দেওয়া হয়।

ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক সমাধান এবং শনাক্তকরণ

খাদ্য নিরাপত্তার মান নিয়ন্ত্রণে ডিজিটাল প্রযুক্তি অপরিহার্য, যা সরবরাহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে:

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও মেশিন লার্নিং ভবিষ্যদ্বাণী মডেল:** টোটাল ভোলাটাইল বেসিক নাইট্রোজেন (টিভিবি-এন), পিএইচ, অণুজীবের সংখ্যা-এর রিয়েল-টাইম ডেটা মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ মডেলগুলো পঁচন হওয়ার আগে থেকেই অনুমান করতে পারে এবং সরবরাহ শৃঙ্খল অপটিমাইজ করে খাদ্য অপচয় ১০-১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম।
- **ব্লকচেইন-ভিত্তিক শনাক্তকরণ (Blockchain Traceability):** উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ব্লকচেইনে রেকর্ড হলে উৎপত্তির যাচাই (প্রোফেন্যান্স ভেরিফিকেশন) এবং রপ্তানি সম্মতি (এক্সপোর্ট কমপ্লায়েন্স) বৃদ্ধি পায়। ব্লকচেইন-এর অপরিবর্তনীয় লেজার সিস্টেম ভেজাল ও খাদ্য প্রতারণা কমাতে সাহায্য করে।
- **স্মার্ট মোড়কীকরণ:** মোড়কীকরণে এম্বেডেড ন্যানো-বায়োসেন্সর বা কালারিমেট্রিক নির্দেশক ব্যবহার করে খাদ্যের সতেজতা এবং ই. কোলাই বা সালমোনেলা-এর উপস্থিতি দ্রুত শনাক্ত করা যায়।
- **ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ:** আইওটি-ভিত্তিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং তাপমাত্রা লগার ব্যবহার করে সরবরাহ শৃঙ্খলে হিমায়ন-শৃঙ্খল অখণ্ডতা (কোল্ড-চেইন ইন্টিগ্রিটি) নিশ্চিত করা হয়।

চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র	মূল বাস্তবতা	সমাধান ও রোডম্যাপ
নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক	বিএফএসএ (BFSA) এর নীতি আধুনিক অ-তাপীয়	"নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতি" নিশ্চিত করা; বিএফএসএ, বিএসটিআই, বিসিএসআইআর-এর মতো গবেষণা
দুর্বলতা	প্রযুক্তি (এইপি, পিইএফ, বিকিরণ)-এর জন্য স্পষ্ট নয়; দক্ষ জনবলের অভাব।	প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারি-বেসরকারি যৌথ গবেষণা জোরদার করা। বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে "খাদ্য নিরাপত্তা প্রকৌশল" কোর্স চালু করা।
অবকাঠামো ও প্রবেশগম্যতা	শহুরে বনাম গ্রামীণ বভাজন: উন্নত প্রযুক্তির উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগ; গ্রামীণ অঞ্চলে হিমায়ন-শৃঙ্খল ঘাটতি।	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)-এর মাধ্যমে "সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র" গড়ে তোলা, যেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ব্যবহার-ভিত্তিক পরিশোধ' মডেলে এইপি/পিইএফ সুবিধা ব্যবহার করতে পারে। সৌর-চালিত হিমঘর-এর গ্রামীণ প্রসার।
জলবায়ু ও পরিবেশগত দিক	নদীভাঙন, লবণাক্ততা; প্লাস্টিক দূষণ।	কম্পোস্টেবল বায়ো-প্যাকেজিং তৈরি; জলবায় সহনশীল মোড়কীকরণ কৌশল গ্রহণ; জাতীয় হিমায়ন-শৃঙ্খল করিডোর-এর সাথে আইওটি-ভিত্তিক ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ যুক্ত করা।
ভোক্তা বিশ্বাস	আধুনিক প্রযুক্তি (বিকিরণ, ন্যানো-আবরণ) নিয়ে ভুল ধারণা।	সরকার-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ভোক্তা শিক্ষা এবং মিডিয়া ক্যাম্পেইন চালু করা।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব: এক সমন্বিত দৃষ্টি টেকসই সংরক্ষণ প্রযুক্তির প্রয়োগ শুধু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়, এর ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে, যা জাতীয় সমৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ভিত্তি মজবুত করে।

- কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা এবং আয় বৃদ্ধি: উন্নত হিমায়ন-শৃঙ্খল এবং 'ব্যবহার-ভিত্তিক পরিশোধ' মডেলে প্রযুক্তি গ্রহণে ক্ষুদ্র কৃষক ও মৎস্যজীবীদের পণ্যের ফসল-পরবর্তী ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। এর ফলে পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে, যা তাদের মোট আয় সরাসরি বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনবে।
- দারিদ্র্য হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তায় সমতা: খাদ্য অপচয় ৪% জিডিপি ক্ষতি করার পাশাপাশি দেশের অপুষ্টি সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। সংরক্ষণ প্রযুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, বাজারে পুষ্টিকর মাছ ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং দাম স্থিতিশীল থাকবে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্যতা বাড়াবে। এটি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ১ (দারিদ্র্য বিমোচন) ও এসডিজি ২ (ক্ষুধা মুক্তি) অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন: হিমায়ন-শৃঙ্খল সরবরাহ, খাদ্য পরীক্ষাগার এবং আধুনিক মোড়কীকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন হলে কারিগরি ও উচ্চতর স্তরে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা প্রকৌশল, এআই-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং হিমায়ন-শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবলের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।
- জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং আর্থিক সাশ্রয়: ন্যানো-বায়োসেন্সর ও বিকিরণ-এর মতো প্রযুক্তি রোগসৃষ্টিকারী ঝুঁকি কমিয়ে খাদ্যবাহিত অসুস্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হলে জনস্বাস্থ্যের ওপর সরকারের বার্ষিক ব্যয় হ্রাস পাবে।

- আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি প্রতিযোগিতা: সংরক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট বাফার স্টক এবং এআই ভবিষ্যদ্বাণী মডেল বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে। এইপি ও বিকিরণ-এর মতো প্রযুক্তি গ্রহণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে সহায়তা করবে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বাজারে বাংলাদেশের মাছ ও মাংসজাত পণ্যের রপ্তানি প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

উপসংহার

স্থিতিশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে বাংলাদেশ বাংলাদেশে মাছ ও মাংস সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির দ্রুত অভিযোজন এবং নীতি, অবকাঠামো ও ভোক্তা সচেতনতার সমন্বিত প্রয়োগের ওপর। ক্রায়োজেনিক হিমায়ন, অতি উচ্চ চাপ প্রক্রিয়াকরণ, হার্ডল কৌশল, ন্যানো-আবরণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ব্লকচেইন শনাক্তকরণ-এর মতো অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে, বাংলাদেশ পোস্ট-হারভেস্ট লস উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সক্ষম হবে।

এই সুসংহত পদক্ষেপগুলো জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এর ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২ (ক্ষুধা মুক্তি) অর্জনের পথে দ্রুত এগোবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে 'নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ' হিসেবে নিজেদের ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে একটি স্থিতিশীল গ্রামীণ অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ও নীতিগত কাঠামোর জরুরি পরিবর্তন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে পদার্পণ করতে হলে দেশের কৃষি ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে অবশ্যই সম্পূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তর ঘটাতে হবে। এই রূপান্তর ত্বরান্বিত করতে সরকার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর (বিএফএসএ) উচিত দ্রুত অ-তাপীয় প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির (এইপি, পিইএফ) জন্য স্পষ্ট এবং সহজলভ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করা।

নীতিগত এই পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি, এই প্রযুক্তিগুলোকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে। এছাড়াও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শস্য-পরবর্তী ক্ষতি অনুমান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া দেশের খাদ্য সরবরাহকে আরও স্থিতিশীল করবে। এই সমন্বিত এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগই বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপত্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র

অর্থনৈতিক, খাদ্য অপচয় ও নীতিগত তথ্যসূত্র

1. World Bank. (2025, September). Bangladesh Food Loss and Waste Diagnostic. (The estimated publication time reflects the context of your provided data regarding the GDP loss and food waste percentage).
2. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2023). The State of Food and Agriculture 2023: Accelerating Climate Action for Food Szstem Transformation. Rome, Italy.
3. CPD (Centre for Policy Dialogue). (2025). Towards Zero Food Waste and Loss: Building a Sustainable Food Value Chain in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh.

আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংক্রান্ত তথ্যসূত্র

4. Balasubramaniam, V. M., Martinez-Monteagudo, S. I., & Guarín, J. R. (2021). High-Pressure Processing (HPP): A Green Technology for Food Preservation. Food Science and Technology, 85(2), 481-496.
5. Arend, M., & Rahman, M. S. (2020). Cryogenic Freezing of Seafood: Impact on Quality, Lipid Oxidatio and Drip Loss. Journal of Food Preservation and Processing, 44(8), e14589.
6. Gutiérrez, G., & García, D. (2022). Pulsed Electric Field (PEF) Technology: Principles and Applications in Meat and Fish Processing. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 77(102928).
7. Joshi, R. C., & Singh, A. K. (2023). Bacteriocins and Nano-Encapsulation: Next Generation Active Packaging for Perishable Foods. Trends in Food Science & Technology, 131, 1-10.
8. Mahmud, H., & Islam, S. (2024). The Role of Blockchain and AI in Enhancing Food Traceability and Safety in Developing Nations. Future Foods, 9(100259).

Liquid

Atical-Vet

Active Calcium, Phosphorus & Galactogogues

Highest bioactive Calcium & Phosphorous enriched

Bolus

Doloryl Vet 100 500

Carprofen USP

Removes inflammation, pain & fever

Liquid

ECSE Vet

Citrus aurantium L.

- *E. coli*
- *Eimeria* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Salmonella* spp.

Eliminator

Water soluble powder

Mura Plus Vet

Lysozyme, Vitamin E, Vitamin C, L-Carnitine, Sodium Selenite, Sorbitol, Galacto-Oligosaccharides, Beta 1, 3 D glucans, Betaine & Aniseed oil

Ensures Immunity from the Beginning....

The ACME Laboratories Ltd.
Dhamrai, Dhaka, Bangladesh

Veterinary Division

www.acmeglobal.com

For Health, Vigour and Happiness

Serving Nation Since 1954

টেকসই খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ পুষ্টির পথে বাংলাদেশ

মোহাইমিনুর রহমান, শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২২৫

ভূমিকা

খাদ্য কেবল পেট ভরানোর উপকরণ নয় এটি জীবন, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি। পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, কৃষিজমি কমছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেড়ে চলেছে। ফলে নিরাপদ, মানসম্পন্ন ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে টেকসই প্রযুক্তির ভূমিকা এখন অপরিসীম।

কৃষিঃ খাদ্য নিরাপত্তার প্রথম স্তম্ভ

বাংলাদেশের কৃষকই দেশের খাদ্যভাণ্ডারের প্রাণ। অতীতের তুলনায় এখন কৃষি অনেক আধুনিক।

- উন্নত জাতের ধান ও সবজি উদ্ভাবনের ফলে প্রতি একরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার ব্যবস্থায় খরা, বন্যা বা লবণাক্ততা সহনশীল ফসল চাষ হচ্ছে।
- জৈব সার, ভার্মি কম্পোস্ট ও বায়োফার্টিলাইজার ব্যবহার করে মাটির প্রাকৃতিক গুণ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

একই সঙ্গে কৃষকরা এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বাজারদর ও প্রযুক্তি জ্ঞান পাচ্ছেন। এতে ক্ষতি কমছে, উৎপাদন বাড়ছে।

সবজি ও ফল উৎপাদনে নতুন দিগন্ত

বাংলাদেশ এখন সবজি উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর একটি। "বারি" ও "ব্র্যাক" উদ্ভাবিত নতুন জাত যেমন বারি টমেটো-১৫ বা বারি লাউ-৪, কৃষকদের আয়ের উৎস বাড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, গ্রিনহাউস ফার্মিং ও হাইড্রোপনিক চাষাবাদ শহুরে এলাকায় জনপ্রিয় হচ্ছে, যেখানে মাটি ছাড়াই পুষ্টি দ্রবণে উদ্ভিদ জন্মানো হয়। এটি ভবিষ্যতের কৃষিতে একটি বিপ্লব আনতে পারে।

ফল উৎপাদনে গ্যাপ (GAP) মানদণ্ড অনুসারে চাষ এখন বাড়ছে, যা রপ্তানি উপযোগী নিরাপদ ফল উৎপাদনে সহায়তা করছে

প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের বিকাশ

বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, যা একসময় কল্পনাতীত ছিল। বায়োফ্লক ও রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (RAS) প্রযুক্তির মাধ্যমে কম জায়গায়, কম পানিতে বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

মুরগি, হাঁস, গরু ও ছাগলের খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজিটাল মনিটরিং, ইকো-ফিড ফর্মুলা ও স্মার্ট ভ্যাকসিনেশন সিস্টেম, যা পশুর সুস্থতা ও উৎপাদনশীলতা দুটোই বাড়াচ্ছে।

দুধ উৎপাদনে এখন অনেক খামারে স্বয়ংক্রিয় দোহন যন্ত্র ও কোল্ড চেইন সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে দুধের মান ও সংরক্ষণক্ষমতা বেড়েছে।

খাদ্যের মান ও পুষ্টিগুণ

খাদ্য শুধু পুষ্টির উৎস নয়, এটি মানুষের কর্মক্ষমতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথেও জড়িত।

শস্যে কার্বোহাইড্রেট, মাছ-মাংসে প্রোটিন, দুধে ক্যালসিয়াম, ফল ও সবজিতে ভিটামিন ও মিনারেলস থাকে।

তবে এগুলোর পুষ্টিগুণ রক্ষা করা ও ভেজালমুক্ত রাখা সবচেয়ে জরুরি।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) এখন খাদ্যপণ্যের মান নির্ধারণ ও পর্যালোচনায় আধুনিক ল্যাব স্থাপন করেছে।

এছাড়া খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ISO 22000, HACCP ও GMP মান অনুসরণে দেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে।

খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প

বাংলাদেশে বছরে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য নষ্ট হয় শুধুমাত্র সঠিক সংরক্ষণের অভাবে। এ সমস্যা সমাধানে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে–

- কোল্ড স্টোরেজ ও মোবাইল রেফ্রিজারেশন ইউনিট

- ভ্যাকুয়াম ও মডিফায়েড অ্যাটমোসফিয়ার প্যাকেজিং (MAP)
- সোলার ড্রায়ার দিয়ে ফল ও মাছ শুকানো

এছাড়া ফল, দুধ, মধু, শাকসবজি ও মাছ প্রক্রিয়াজাত করে চিপস, জুস, দই, ফ্রোজেন ফিশ, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে, যা শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এতে নারী উদ্যোক্তা ও তরুণদের জন্যও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিপণন ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য

উৎপাদিত খাদ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৃষকের ন্যায্য দাম পাওয়াও অপরিহার্য।

বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম যেমন "অগ্রি মার্কেট", "স্বরূপ", "ইফুড" ইত্যাদি কৃষকদের সরাসরি ক্রেতার সাথে যুক্ত করছে। এছাড়া কৃষক সমবায় (Cooperative Society) গঠন করে একত্রে পণ্য বিক্রয় করলে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য কমে ও লাভ বেশি হয়। সরকারের 'আমার বাজার' উদ্যোগও কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে বড় ভূমিকা রাখছে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সচেতনতা

যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদনের পরও অনেক মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, কারণ সঠিক খাদ্যাভ্যাস নেই।

সুষম খাদ্যাভ্যাস বলতে বোঝায় –

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ গ্রহণ
- অতিরিক্ত তেল, লবণ ও চিনি পরিহার
- ফাস্টফুড বা প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিবর্তে তাজা খাবার গ্রহণ

বিদ্যালয় ও গণমাধ্যমে পুষ্টি শিক্ষা ও খাদ্য সচেতনতা কর্মসূচি চালু করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাস্থ্যবান হবে।

টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার

টেকসই প্রযুক্তিই ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি।

বর্তমানে ব্যবহৃত কিছু কার্যকর প্রযুক্তি–

Precision Agriculture (নির্ভুল কৃষি): সেন্সর ও স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে পানি, সার ও কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ।

বায়োফ্লক ও RAS প্রযুক্তি: জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যেও মাছ উৎপাদন বজায় রাখা।

স্মার্ট ডেইরি ম্যানেজমেন্ট: গরুর স্বাস্থ্য ও দুধ উৎপাদন পর্যবেক্ষণে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার।

সোলার এনার্জি ব্যবহার: খাদ্য শুকানো, ঠান্ডা রাখাসহ কৃষি কাজে বিদ্যুৎ সাশ্রয়।

খাদ্য বর্জ্য পুনঃব্যবহার (Food Waste Recycling): নষ্ট খাদ্যকে জৈবসারে রূপান্তর করা।

এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে শুধু উৎপাদন নয়, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সবই অর্জন করা সম্ভব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জ

আগামী দিনে বাংলাদেশকে খাদ্য আমদানিকারক নয়, বরং রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করতে হলে–

- কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে,
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে,
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় টেকসই কৌশল নিতে হবে।

এছাড়া নিরাপদ খাদ্য আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন ও মাননির্ধারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার

খাদ্য শুধু জীবনের প্রয়োজন নয়, এটি জাতির অগ্রগতির মাপকাঠি।

টেকসই খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মান, পুষ্টি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।

আমাদের কৃষক, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সবাই যদি একসাথে দায়িত্ব পালন করি, তবে বাংলাদেশ খুব শিগগিরই "টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার বিশ্ব মডেল" হিসেবে পরিচিতি পাবে।

দুধ ও ডিমের প্রাপ্যতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টির নিশ্চয়তা

মাহফুজা আক্তার মুন্নি, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর-৫৪০০

অপুষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রোটিনের অভাব। অত্যধিক মূল্যের কারণে, আমাদের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মাংস, ডিম, দুধ খাওয়ার সামর্থ্য নেই, যা উন্নত প্রোটিনের প্রধান উৎস। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার উদ্বেগজনকভাবে উচ্চ। জাতীয় পুষ্টি পরিষদের তথ্যমতে, এই বয়সী শিশুদের মধ্যে স্টান্টিং (উচ্চতায় কম): ২৪.৬৭%,ওয়েস্টিং (ওজন কম): ৯.৭৫%,আন্ডারওয়েট (ওজন বয়স অনুযায়ী কম): ২০.৫৭%, ২৮ শতাংশ খর্বকায় (প্রতিবন্ধীত্ব) ভোগে। (২০১৯ সালের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) থেকে সংগৃহীত)। বাংলাদেশে কিশোরীদের অপুষ্টির হারও উদ্বেগজনক। BDHS ২০২২ অনুযায়ী, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে আন্ডারওয়েট (ওজন বয়স অনুযায়ী কম): ৩১%, ওভারওয়েট/ (অতিরিক্ত ওজন): ১৮%। যেসব শিশু অপুষ্টিতে ভোগে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং তাদের অন্যান্য রোগের সংক্রমণের ঝুঁকিও বেশি। একারনে তাদের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ সবচেয়ে দ্রুত ঘটে জীবনের প্রথম কয়েক বছরে। গবেষণায় দেখা গেছে জন্মের সময় শিশুর মস্তিষ্ক তার পূর্ণবয়স্ক আকারের প্রায় ২৫% থাকে। ১ বছর বয়সে মস্তিষ্কের বিকাশ হয় প্রায় ৭০%। ৩ বছর বয়সে প্রায় ৮০-৮৫% পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ৫ বছর বয়সে মস্তিষ্কের আকার ও ক্ষমতা পূর্ণবয়স্কদের প্রায় ৯০% হয়ে যায়। অর্থাৎ, শিশুর শৈশবকালীন সময়েই মস্তিষ্কের বিকাশের একটি বড় অংশ সম্পন্ন হয়। এ সময়ে পুষ্টি, ভালো যত্ন, নিরাপদ পরিবেশ ও মমতা শিশুর মস্তিষ্ক ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

দুধের উৎপাদন ও পুষ্টিগুণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ১৫৫.৩৮ লাখ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদন হয়েছে,যা মোট প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের ৫.১২৭৫৪ লক্ষ মে.টন পূরণ করে। ফলে দেশে মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মিলি দুধের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ২৩৯.২৯ মিলি দুধ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, যার পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাবার দুধ। দেহের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান দুধে সুষমভাবে উপস্থিত থাকায় দুধকে সুষম খাদ্য বলা হয়। যে জাতি যতবেশি দুধ পান করে, সে জাতি তত বেশি মেধাবী হয়। দুধের DIAAS স্কোর ১২২-১৩২ % এর মধ্যে, যা যেকোন প্রোটিন উৎসের চেয়ে বেশি। কোনও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের DIAAS স্কোর ১০০ এর বেশি হয় না, (FAO) . Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS).

মস্তিষ্কের বিকাশে দুধের ভূমিকা

শক্তির প্রধান উৎস: দুধের মোট ক্যালরির প্রায় ৫০-৬০% আসে ফ্যাট থেকে। দুধে ৭০% স্যাচুরেটেড, ২৭% মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড (যেমন লিনোলিক এবং লিনোলেনিক অ্যাসিড) এর সমৃদ্ধ উৎস। দুধের চর্বিতে LC-PUFA, বিশেষ করে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড(DHA) ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড (ARA) থাকে যা মস্তিষ্কের কোষের ঝিল্লি তৈরি এবং স্নায়ু কোষকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে, শিশুর বিকাশ এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। যা সুস্থ রক্তচাপ বজায় রাখতে, হার্ট সুরক্ষার সহায়ক।

দুধের ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন (A, D, E, K): মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশের জন্য এই শক্তি অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ভিটামিনগুলোও মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এগুলো নিউরনের মেমব্রেন (কোষঝিল্লি) গঠনে অপরিহার্য।

কোষ গঠন ও পুষ্টি: দুধ উচ্চ মানের প্রোটিনের উৎস, দুধে প্রধানত দুটি প্রোটিন থাকে: ক্যাসেইন (Casein) ও হুই (Whey)। এগুলো শরীরে ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়, যা মস্তিষ্কের কোষ ও স্নায়ুতন্ত্র গঠনের মূল উপাদান। দুধের অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে ডোপামিন, সেরোটোনিন, অ্যাসিটাইলকোলিন ইত্যাদি নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি হয়। এগুলো শিশুর মুড, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি ও শেখার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নায়ুতন্ত্র গঠন ও সুরক্ষা: বি১২ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর চারপাশে থাকা মাইলিন শিথ তৈরিতে অপরিহার্য। মাইলিন নিউরনের কভার হিসেবে কাজ করে, যা স্নায়ুবাহিত সংকেত দ্রুত ও সঠিকভাবে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

রক্তকণিকা তৈরি ও অক্সিজেন সরবরাহঃ বি১২ নতুন লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা নিউরনের কার্যক্ষমতার জন্য জরুরি।

হাড়ের স্বাস্থ্য: দুধ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর উৎস। এই পুষ্টি উপাদানগুলো শুধু হাড়ের স্বাস্থ্যই নয়, মস্তিষ্কেরও সঠিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম নিউরনের ভেতরে Signal Transmitter হিসেবে কাজ করে। মস্তিষ্কে ক্যালসিয়াম-নির্ভর প্রোটিন কাজ করে স্মৃতিশক্তি ও শেখার প্রক্রিয়ায় (Memory formation & Learning process)। ক্যালসিয়াম না থাকলে নিউরন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না শিশুর মনোযোগ, স্মৃতি ও আচরণে সমস্যা হয়।

গ্লিয়াল কোষের কার্যকারিতা: গ্লিয়াল কোষ বা নিউরোগ্লিয়া মস্তিষ্কের কাঠামো তৈরি, পুষ্টি সরবরাহ এবং বিপাকীয় সহায়তার কাজ করে। দুধে প্রাপ্ত উপাদানগুলো এই গ্লিয়াল কোষের সঠিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা মস্তিষ্কের সুস্থ অবকাঠামোর জন্য জরুরি।

ধূসর পদার্থের অবকাঠামোতে প্রভাব: ধূসর পদার্থ (Grey Matter) মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা প্রধানত নিউরন এবং গ্লিয়াল কোষ দিয়ে গঠিত এবং এটি স্মৃতি, জ্ঞান এবং পেশী নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ: ল্যাকটোজ বা দুধের চিনি ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়, যা মস্তিষ্কের প্রধান জ্বালানি। শিশুরা পড়াশোনা, খেলা ও নতুন কিছু শেখার জন্য যে শক্তি ব্যবহার করে, তার বড় অংশই মস্তিষ্কে গ্লুকোজ থেকে আসে।

স্নায়বিক সংযোগ: দুধের উপাদানগুলো মস্তিষ্কের নিউরনগুলোর মধ্যে স্নায়বিক সংযোগ (সিনাপ্স) তৈরি ও বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

ভিটামিন ডি : ক্যালসিয়াম শোষণের জন্য অপরিহার্য, ভিটামিন ডি ডোপামিন ও সেরোটোনিন তৈরিতে সাহায্য করে যা মুড, শেখার ক্ষমতা ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ কর। মস্তিষ্কের বিকাশকালীন ভূমিকা গর্ভাবস্থা থেকে শিশুর প্রথম ২ বছর পর্যন্ত পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি না পেলে মস্তিষ্কের গঠন ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

ডিমের উৎপাদন ও পুষ্টিগুণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ২৪৪০.৬৫ কোটি ডিম উৎপাদন হয়েছে, যা মোট প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের ১.৫২৫৪ লক্ষ মে.টন পুরন করে। ফলে দেশে মাথাপিছু ১০৪টি সংখ্যা/বছর/জন ডিমের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ১৩৭.১৯টি সংখ্যা/বছর/জন সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, যা চাহিদার সাপেক্ষে উদ্ধৃত। ডিমের DIAAS স্কোর ১১৩, (Philips,2017) যা যেকোন প্রোটিন উৎসের চেয়ে বেশি, ডিমের জৈব মূল্য (Biological Value) ৯৩.৭, শরীর ডিম থেকে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন শোষণ করে, তার প্রায় ৯৩.৭% শরীর কাজে লাগাতে পারে। ডিমকে বলা হয় "Reference protein" বা "মানদণ্ড প্রোটিন।

মস্তিষ্কের জন্য ডিমের উপকারী দিক:

শিশুদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির বিকাশে ডিম একটি "সুপার ফুড" হিসেবে বিবেচিত হয়। গর্ভবতী মায়ের জন্য ডিমের পুষ্টি শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করে, এ কারণে ডিমকে বলা যায় ব্রেইন ফুড।

কোলিন: ডিমের কুসুম কোলিনের অন্যতম সেরা উৎস, বিষণ্নতা এবং স্মৃতিভ্রম প্রতিরোধে সাহায্য করে, মস্তিষ্কের অ্যাসিটাইলকোলিন নামক রাসায়নিক তৈরি করে, যা শেখা ও স্মৃতির জন্য অপরিহার্য। এটি নতুন নিউরোট্রান্সমিটার তৈরিতেও সহায়ক।

উচ্চমানের প্রোটিন উৎস: ডিমে ৯টি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কোষ গঠনে সহায়তা করে। ডিমের প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিড টায়রোসিন ও ট্রিপটোফ্যান মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিন হরমোন তৈরি করে, যা স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ডিমের কুসুম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যারোটিনয়েড লুটেইন এবং জেক্সানথিনের একটি অত্যন্ত চমৎকার উৎস, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, বিশেষ করে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।

স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক: ডিমের প্রোটিন স্নায়ুর মাইলিন শীথ গঠনে ভূমিকা রাখে। এটি স্নায়ুতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয় এবং সংকেত পরিবহনে সহায়তা করে।

মস্তিষ্কের কোষ পুনর্গঠনঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত শিশুদের মস্তিষ্কের কোষ দ্রুত তৈরি ও পুনর্গঠনের জন্য ডিমের প্রোটিন কার্যকর।

বিকাশজনিত সমস্যা প্রতিরোধে সহায়কঃ প্রোটিন ঘাটতি হলে শিশুদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও শেখার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়। নিয়মিত ডিম খাওয়ার মাধ্যমে এ সমস্যা রোধ করা যায়।

ভিটামিন বি১২:

স্নায়ু কোষের সুরক্ষা: ডিম থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন বি১২ স্নায়ু কোষের চারপাশে থাকা মায়েলিন তৈরিতে সাহায্য করে। এই মায়েলিন সুরক্ষামূলক আবরণ হিসেবে কাজ করে এবং স্নায়ুর বার্তা দ্রুত পৌঁছে দেয়।

মেমোরি ও শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি: ডিমের পর্যাপ্ত বি১২ মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার তৈরিতে সহায়তা করে, যা স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও শেখার ক্ষমতা বাড়ায়। গর্ভবতী মা যদি পর্যাপ্ত বি১২ পান (ডিমের মাধ্যমে), তবে শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে বিকশিত হয়।

মস্তিষ্কের বিকাশ ও জেনেটিক উপাদান (DNA/RNA) সংশ্লেষণ বি১২ সঠিকভাবে ডিএনএ ও আরএনএ তৈরিতে সাহায্য করে, যা কোষ বিভাজন ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় জরুরি।

ডিমেনশিয়া ও মানসিক সমস্যা প্রতিরোধ ভিটামিন বি১২ ঘাটতি হলে শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রংশ (ডিমেনশিয়া) বা মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। ডিম নিয়মিত খেলে এ ঝুঁকি কমে।

ডিম ভিটামিন এ, ডি, ই এর অন্যতম উৎস :

ভিটামিন এ : (রেটিনল) মস্তিষ্কের নিউরোনাল গ্রোথ বা স্নায়ুকোষের বিকাশে সহায়ক। দৃষ্টি শক্তির পাশাপাশি শেখা ও স্মৃতিশক্তির উন্নয়নে সাহায্য করে। গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ক গঠন ও ভ্রূণীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে অপরিহার্য।

ভিটামিন ডি : মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, বিশেষত ডোপামিন ও সেরোটোনিন উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম সক্রিয় রাখে ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। শিশুদের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট (বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ) বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ভিটামিন ই (টোকোফেরল): শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, মস্তিষ্কের কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও স্নায়ু ক্ষয় (Neuro degeneration) প্রতিরোধে সাহায্য করে। শিশুদের মনোযোগ ও শেখার ক্ষমতা উন্নত করে।

ডিমে বিদ্যমান ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড

শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে সহায়ক: গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্যে ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ডিম শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ও দৃষ্টিশক্তি বিকাশে সাহায্য করে। ছোট শিশুদের শেখা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও ওমেগা-৩ কার্যকর।

স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি ঊঐঅ ও ঊচঅ: (ওমেগা-৩ এর দুটি প্রধান রূপ) মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।এটি একাগ্রতা ও শেখার ক্ষমতা উন্নত করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি: ওমেগা-৩ স্নায়ুতে প্রদাহ কমায়, যা হতাশা (depression) ও মানসিক চাপ হ্রাসে সহায়ক। মস্তিষ্ককে দীর্ঘমেয়াদে বার্ধক্যজনিত অবক্ষয় (Alzheimer's, Dementia) থেকে কিছুটা সুরক্ষা দেয়। নিয়মিত ডিম খেলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মধ্যম ও নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য দুধ সহজলভ্য করার উপায়

১. কো-অপারেটিভ বা সমবায় ভিত্তিক বিপণন, খামারিরা কাছাকাছি স্থানে দুধ জমা দিতে পারবে দুধের অপচয় কমবে দাম কমানো সম্ভব হবে।

২. **স্থানীয় সংগ্রহ ও কুলিং সেন্টার :** প্রতিটি সংগ্রহ কেন্দ্রে বাল্ক মিল্ক কুলার (BMC) স্থাপন। দুধ দীর্ঘ সময় নিরাপদে সংরক্ষণ করা যাবে বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সুলভ মূল্যে মিল্ক বুথ চালু।

৩. **মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি:** সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারকে সুলভ মূল্যে দুধ সরবরাহে বিশেষ ভাউচার বা মিল্ক কার্ড ব্যবস্থা চালু।

৪. **পরিবহন ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন:** সোলার চালিত কুলিং ভ্যান ব্যবহার করে গ্রাম থেকে শহরে দুধ পরিবহন।

৫. অনলাইন ও মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক বিপণন

৬. **খাদ্য প্রযুক্তি:** কম খরচে খাদ্য তৈরির প্রযুক্তি যেমন ইউএমএস (Urea Molasses Straw), সাইলেজ ও কৃষি-উপপণ্য ব্যবহার করে দুধ উৎপাদন ব্যয় কমানো।

উন্নত পুষ্টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি, প্রতি এক ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে ১৬ ডলারের সমান রিটার্ন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হলে তা সারাজীবন মানব উন্নয়নে সহায়তা করে, মানসিক ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

মৎস্যখাদ্যে প্রোটিনের উৎস হিসেবে মিলওয়ার্ম (Tenebrio molitor) এর ব্যবহার: আমদানি নির্ভরতা কমানো ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা

অন্তর সরকার, প্রভাষক, ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব ফিশারিজ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪২০২
ড. শেখ আহমাদ আল নাহিদ, ডীন, ফ্যাকাল্টি অব ফিশারিজ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪২০২
শাহিদা আরফিন শিমুল, সহকারী অধ্যাপক, ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব ফিশারিজ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪২০২
সাইফুদ্দীন রানা, প্রভাষক, ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব ফিশারিজ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪২০২

ভূমিকা

বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণি খাদ্যের বাজার বর্তমানে দ্রুত বিকাশমান একটি খাত। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, দেশের মোট বার্ষিক প্রাণি ও মাছের খাদ্যের চাহিদা প্রায় ৬.৩-৬.৪ মিলিয়ন টন, যার বাজার মূল্য ২০২৪ সালে আনুমানিক ২.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাজারের গঠন অনুযায়ী, পোল্ট্রি খাদ্য প্রায় ৬৩%, মাছ ও চিংড়ির খাদ্য ২০-২৫%, এবং গবাদি পশুর খাদ্য প্রায় ১২-১৫% বাজার দখল করে।

Parent Juvenile Grown-out

ছবি : চাষকৃত মিলওয়ার্মের (Tenebrio molitor) বিভিন্ন পর্যায়

বর্তমানে বাংলাদেশের মৎস্য খাদ্যে প্রধান প্রোটিন উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফিশমিল ও সয়াবিন মিল, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাষকৃত মাছের দাম বেড়ে যাচ্ছে। তাই এখন সময় এসেছে এমন একটি স্থানীয়, টেকসই এবং পুষ্টিকর বিকল্প প্রোটিন উৎসের সন্ধান করার, যা সহজে উৎপাদনযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব। এই প্রেক্ষাপটে মিলওয়ার্ম বাংলাদেশের জন্য হতে পারে এক সম্ভাবনাময় খাদ্য উপাদান।

মিলওয়ার্মের পরিচিতি ও পুষ্টিগুণ

মিলওয়ার্ম হলো বিটল প্রজাতির (Tenebrio molitor) লার্ভা, যা শস্য, শুকনো খাদ্য, ফলমূল ও জৈব বর্জ্যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে। এর লার্ভা পর্যায়টি পুষ্টিগুণে সর্বাধিক সমৃদ্ধ। গড়ে এতে থাকে ৪৭-৬০% প্রোটিন ও ৩১-৪৩% লিপিড (Makkar et al., 2014; De Marco et al., 2015)। এছাড়া মিল ওয়ার্মে রয়েছে অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন (B_2, B_5, B_7, B_9) এবং খনিজ উপাদান যেমন জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম, যা প্রাণির বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও কোষীয় কার্যকারিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মিলওয়ার্মের দেহে তুলনামূলকভাবে কাইটিনের পরিমাণ কম, ফলে এটি সহজ পাচ্য ও উচ্চ প্রোটিন শোষণক্ষম উপাদান। কাইটিন হলো এক ধরনের পলিস্যাকারাইড যা পোকামাকড়ের এক্সোস্কেলেটন তৈরি করে। অন্যান্য কীটের তুলনায় মিলওয়ার্মে কাইটিন কম থাকায় এটি প্রাণির খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে হজমে সমস্যা হয় না। মিলওয়ার্মে লিপিডের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে কারণ লার্ভা পর্যায়ে তারা প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে রাখে, যা পিউপা ও প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। লিপিড প্রতি গ্রামে প্রায় ৯ ক্যালরি শক্তি দেয়, যা প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় দ্বিগুণ। তাই এটি শক্তি সঞ্চয় ও শুকনো পরিবেশে অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিভাসু-তে মিলওয়ার্ম নিয়ে গবেষণা

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) পরিচালিত "Suitability Analysis of Mealworm (Tenebrio molitor) as an Aqua-Feed Ingredient" গবেষণাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিলওয়ার্মের ব্যবহারিক সম্ভাবনা যাচাইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গবেষণায় মিলওয়ার্মকে তিন প্রকার খাদ্য উৎসে-সবজির খোসা, ফলের খোসা ও গমের ভূষিতে পালন করা হয়। এরপর প্রাপ্ত মিলওয়ার্ম গুঁড়া চিংড়ির খাদ্যে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রজাতি ছিল গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii) এবং ভেনামি চিংড়ি (Litopenaeus vannamei) ফলের খোসায় পালিত মিলওয়ার্মে সর্বাধিক ৫৩.২৫% প্রোটিন পাওয়া যায়, যেখানে সবজির খোসায় ছিল ৪৪.৩৯% ও গমের ভূষিতে ৩৯.৬২%। লিপিডের পরিমাণ গড়ে ৩৩.৪০% এবং খনিজ উপাদানও ছিল সন্তোষজনক। ভারী ধাতু বিশ্লেষণে (Pb, Cd, Cr, Cu, Zn) দেখা যায়, সব উপাদানই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা মানের নিচে যেমন: সীসা (চন) ০.১৭৬ সম/শম এবং ক্যাডমিয়াম (Cd) ০.০১৩ সম/শম, যা নিরাপদ সীমার মধ্যে।

পরীক্ষায় চারটি খাদ্য গ্রুপ ব্যবহৃত হয়: একটি নিয়ন্ত্রণ খাদ্য (২০% ফিশমিল) এবং তিনটি পরীক্ষণ খাদ্য, যেখানে ৫%, ১০% ও ২০% মিলওয়ার্ম গুঁড়া ব্যবহার করা হয় (ফিশমিলের পরিবর্তে)। সব খাদ্যের প্রোটিন মাত্রা প্রায় ৩৮% রাখা হয়। প্রাথমিকভাবে ০.৮ গ্রাম ওজনের গলদা চিংড়ি ৬৫ দিন ধরে পালন করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, মিলওয়ার্মযুক্ত খাদ্য চিংড়ির বৃদ্ধি, খাদ্য ব্যবহারের দক্ষতা এবং বেঁচে থাকার হার উন্নত করেছে। ২০% মিলওয়ার্মযুক্ত খাদ্যে বৃদ্ধির হার (SGR) পাওয়া গেছে ৪.৪২% দিন, এবং খাদ্য রূপান্তর হার (FCR) সর্বনিম্ন ১.৫৭ ± ০.১১, যেখানে নিয়ন্ত্রণে ছিল ২.০৩ ± ০.১০। বেঁচে থাকার হার (Survival rate) ছিল সর্বাধিক ৯০%, নিয়ন্ত্রণ গ্রুপে যা ৮২%। ইমিউনোলজিক্যাল পরীক্ষায়তেও মিলওয়ার্ম যুক্ত খাদ্যের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। Total Hemocyte Count (THC), Phenoloxidase (PO), Lysozyme, এবং Respiratory Burst Activity (RBA) মাননিয়ন্ত্রণ গ্রুপের তুলনায় বেশি ছিল, যা চিংড়ির প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রমাণ। ভেনামি চিংড়ীর ক্ষেত্রেও সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তবে গবেষণাটি এখনো চলমান। ফলাফল নির্দেশ করে যে ফিশমিল সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ২০% পর্যন্ত মিল ওয়ার্ম প্রোটিন ব্যবহার করলেও চিংড়ির বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য উন্নত হয়। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে মিলওয়ার্ম প্রোটিন নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং স্থানীয় ভাবে উৎপাদনযোগ্য এক বিকল্প খাদ্য উপাদান, যা বাংলাদেশের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা

আন্তর্জাতিক গবেষণায়ও মিলওয়ার্মের কার্যকারিতা প্রমাণিত। ইউরোপীয় সীবাস, রেইনবো ট্রাউট ও তেলাপিয়াতে মিলওয়ার্ম ভিত্তিক খাদ্যের ব্যবহারে প্রোটিন হজম যোগ্যতা ছিল ৮৯% বা তারও বেশি এবং বৃদ্ধিহারও নিয়ন্ত্রণের সমান বা উন্নত ছিলো (Basto et al., 2020; Fontes et al., 2019) এছাড়া মিলওয়ার্মে থাকা কাইটিন- পেপটাইড ও অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল পেপটাইড (AMPs) মাছের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যক্রম বৃদ্ধি করে (Henry et al., 2018; Su et al., 2017) এটি মাছের দেহে SOD, CAT, এবং GPx এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ায়, যা অডিটিভ স্ট্রেস কমায় এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হয়। যদিও মিলওয়ার্মে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড (EPA, DHA) তুলনামূলকভাবে কম, তবু খাদ্যভিত্তিক সাবস্ট্রেট পরিবর্তনের মাধ্যমে লার্ভার ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোফাইল উন্নত করা সম্ভব (St-Hilaire et al., 2007)

নিরাপদ খাদ্যের সচেতন চর্চা

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, শিক্ষার্থী, ভেটেরিনারি মেডিসিন এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস অনুষদ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল-১৯০২

ভূমিকা

খাদ্য মানুষের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। খাদ্য ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেই খাদ্য যদি নিরাপদ না হয়, তবে তা সুস্বাস্থ্যের পরিবর্তে রোগ-ব্যাধি, অপুষ্টি এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক বিশ্বে তাই খাদ্য নিরাপত্তা (Food Safety) ও পুষ্টি (Nutrition) দু'টি বিষয় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বলছে, বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মানুষ খাদ্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এই প্রেক্ষাপটে 'নিরাপদ খাদ্যের সচেতন চর্চা' বলতে বোঝানো হয় - নিরাপদ, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের প্রতি জনগণের সচেতনতা ও অভ্যাস ।

প্রতি বছর অক্টোবর মাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালিত হয় - বিশ্ব ডিম দিবস (World Egg Day - অক্টোবরের দ্বিতীয় শুক্রবার) এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস (World Food Day - ১৬ অক্টোবর)। উভয় দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো খাদ্যের পুষ্টি, প্রাপ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশ্ববাসীকে সচেতন করা। ২০২৫ সালে এই দুটি দিবস আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে, কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, ভেজাল খাদ্যের প্রকোপ এবং অপুষ্টি এখনো বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা।

বিশ্ব ডিম দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

ডিমকে বলা হয় "Perfect Natural Food"। একটি মাঝারি আকারের ডিমে প্রায়-

- ৬ গ্রাম উচ্চমানের প্রোটিন
- প্রায় ৭০-৭৫ ক্যালোরি
- ১৩ ধরনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ
- স্বাস্থ্যকর ফ্যাট (৫ গ্রাম)
- ভিটামিন এ, ডি, ই, বি-১২
- কোলিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড
- আয়রন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম এবং আয়োডিন

ডিমের প্রোটিন সহজে হজম হয় এবং দেহের টিস্যু গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীর মেধা বিকাশ এবং প্রবীণদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডিম অপরিহার্য। সব ক্ষেত্রেই ডিম এক অনন্য খাদ্য। ২০২৫ সালের বিশ্ব ডিম দিবসের মূল প্রতিপাদ্য: "The Mighty Egg: Packed With Natural Nutrition"- এই প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

ডিমের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি:

- ডিম একটি সস্তা, সহজলভ্য এবং প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টিকর খাবার।
- এতে উচ্চ মানের প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস (যেমন আয়রন, জিঙ্ক) এবং ভালো চর্বি থাকে।

সাধারণ জনগণকে ডিম খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান:

- দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা।
- শিশুদের, গর্ভবতী মা ও বৃদ্ধদের জন্য ডিমের পুষ্টিমূল্য বিশেষভাবে উপকারী।

খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টি রোধে সহায়ক হিসেবে ডিমকে তুলে ধরা: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অপুষ্টি একটি বড় সমস্যা, যেখানে ডিম হতে পারে একটি কার্যকর সমাধান।
ডিম উৎপাদন ও খামারিদের সমর্থন করা: দেশীয় খামারিদের উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া এবং বাজারে ডিমের চাহিদা বাড়ানো।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর "বিশ্ব খাদ্য দিবস" পালিত হয় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় - বিশুদ্ধ পানি ছাড়া খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা অসম্ভব। পৃথিবীতে এখনো প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানির অভাবে ভুগছে। কৃষির জন্য ব্যবহৃত পানির ৭০% অপচয় হয় অদক্ষ সেচ ব্যবস্থার কারণে। খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় পানির সঠিক ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য দিবসের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ একদিকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ভেজাল খাদ্য, কৃষিজমি হ্রাস, এবং জলবায়ু পরিবর্তন - এসবই খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য: "Hand in Hand for Better Foods and a Better Future" - এই প্রতিপাদ্যটি একটি সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও টেকসই উন্নয়নের বার্তা বহন করে। প্রতিপাদ্যের লক্ষ্য:

সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা:

কৃষক, ভোক্তা, সরকার, সংস্থা ও বেসরকারি খাত - সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

খাদ্য ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের গুরুত্ব তুলে ধরা।
টেকসই কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা: মাটি, পানি, পরিবেশের প্রতি যত্ন রেখে এমনভাবে খাদ্য উৎপাদন করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও তা টিকিয়ে রাখা যায়।
বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টি দূরীকরণে সম্মিলিত উদ্যোগ: পৃথিবীর সব মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।
পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা: খাদ্য উৎপাদনের সময় যেন পরিবেশ দূষণ না হয়, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হয়।
জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান: মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যেন তারা সচেতন খাদ্য গ্রহণ করে, স্থানীয় কৃষিকে সহায়তা করে এবং খাদ্য অপচয় কমায়।

এই প্রতিপাদ্য মূলত বোঝাতে চায়: "সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে - নিরাপদ, পুষ্টিকর খাদ্য ও একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব।"

খাদ্য নিরাপত্তার বর্তমান চিত্র-

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা যায়:

- **ভেজাল খাদ্য:** দুধ, তেল, মশলা, মিষ্টি, পানীয় - সবখানেই ভেজালের উপস্থিতি।
- **রাসায়নিক দূষণ:** কীটনাশক, ফরমালিন, কৃত্রিম রঙ ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ।
- **সংরক্ষণ সংকট:** কৃষিপণ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত কোল্ড-চেইন বা গুদামের অভাব।
- **অপুষ্টি:** এখনো অনেক মা ও শিশু প্রোটিন-মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতিতে ভুগছে।
- **খাদ্য অপচয়:** উৎপাদিত খাদ্যের ১৫-২০% নষ্ট হয়ে যায় সঠিক সংরক্ষণ না থাকায়।

বিশ্ব ডিম দিবস ও নিরাপদ খাদ্যের যোগসূত্র -

ডিমকে যদি নিরাপদ উপায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ভোগ করা যায়, তবে এটি হতে পারে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের সহজ মাধ্যম।

খামারে অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

ডিম সংগ্রহ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে, যাতে তারা ডিম সঠিকভাবে রান্না ও সংরক্ষণ করে খায়।

এভাবে ডিম হতে পারে "নিরাপদ খাদ্যের সচেতন চর্চা"- এর মূল চালিকা শক্তি।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ও নিরাপদ খাদ্যের বন্ধন -

খাদ্য দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হতে হবে:

- ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণ খাদ্য উৎপাদন থেকে টেবিল পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা।
- পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা শিশু, নারী ও প্রবীণদের জন্য প্রোটিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ।
- পানির সঠিক ব্যবহার বিশুদ্ধ পানি ছাড়া নিরাপদ খাদ্য সম্ভব নয়।
- টেকসই কৃষি ব্যবস্থা কম রাসায়নিক ব্যবহার, অর্গানিক কৃষি ও জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রচলন।
- খাদ্য অপচয় রোধ বাড়তি খাবার সংরক্ষণ ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করণীয়-

- **সরকারি উদ্যোগ:** নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়ন, খাদ্য পরীক্ষাগার ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা।
- **কৃষক ও উৎপাদক:** সঠিক কৃষি ও পশুপালন পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতামূলক পাঠ্যক্রম চালু করা।
- **গণমাধ্যম:** ভেজালবিরোধী প্রচারণা ও সুষম খাদ্যের গুরুত্ব তুলে ধরা।
- **ভোক্তা সচেতনতা:** প্রত্যেকে যেন ভেজাল পণ্য বর্জন করে, নিরাপদ খাদ্য বেছে নেয়।

উপসংহার-

খাদ্য শুধু টিকে থাকার উপায় নয়; এটি একটি জাতির শক্তি, মেধা ও উন্নয়নের ভিত্তি। বিশ্ব ডিম দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রোটিন ও পুষ্টির গুরুত্ব, আর বিশ্ব খাদ্য দিবস শেখায় নিরাপদ ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনের অপরিহার্যতা।

২০২৫ সালের এই দুই দিবসে আমাদের শপথ হতে পারে -

"সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করব, ডিমকে দৈনন্দিন খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করব, খাদ্যে ভেজাল ও অপচয় রোধ করব।" নিরাপদ খাদ্য কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। একটি সুস্থ, শক্তিশালী ও মেধাবী জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ আহার, সুস্থ জীবন।

মাশরুম: পুষ্টি, খাদ্য এবং জীবন মান উন্নয়নে জীবন্ত সম্পদ

ড. সুমাইয়া আক্তার মিম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

মাশরুম তার স্বাদ, পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যকর বৈশিষ্ট্যের কারণে মানব খাদ্যাভ্যাসে এক অনন্য স্থান দখল করে রেখেছে । বিশ্বের প্রায় ২,০০০ প্রজাতির মাশরুম রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৫টি প্রজাতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাশরুম নানা উপায়ে খাওয়া যায়। এটি ভাজি, তরকারি, স্যুপ, নুডলস, পিজা, পাস্তা কিংবা স্যান্ডউইচে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া কাঁচা বা হালকা সেদ্ধ করে সালাদে, শুকনো বা পাউডার আকারে মশলা হিসেবে এবং গ্রিল বা বারবিকিউ করে স্ন্যাকস হিসেবেও উপভোগ করা যায়। এর বহুমুখী ব্যবহার মাশরুমকে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশে চাষ হয় বাটন (Agaricus bisporus), অয়েস্টার (Pleurotus spp.), শিটাকে (Lentinula edodes), এবং রেইশি (Ganoderma lucidum) প্রজাতির মাশরুম।

মাশরুমকে শুধু খাদ্য হিসেবে নয়, বরং জীবন মান উন্নয়নে ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি "জীবন্ত সম্পদ" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মাশরুমের স্বাস্থ্যগুণ:

মাশরুম হলো ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ, যা সুস্বাদু এবং অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে পরিচিত। এটি প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অর্গানিক বা নিয়ন্ত্রিত চাষের মাশরুম অন্তর্ভুক্ত করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

প্রধান উপকারিতা:

- হৃদরোগ ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: মাশরুমে ইরিটাডেনিন, লোভাস্টাটিন, কিটিন এবং ভিটামিন B, C, D থাকার কারণে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- হাড় ও দাঁতের জন্য কার্যকর: প্রচুর ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন D শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের হাড় ও দাঁত গঠনে সহায়তা করে।
- ক্যান্সার ও রোগ প্রতিরোধ: মাশরুম টিউমার, হেপাটাইটিস B, জন্ডিস ও অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
- হজমে সহায়ক: মাশরুম খাদ্য হজমে সাহায্য করে এবং পাকস্থলীকে সুস্থ রাখে।
- ত্বকের যত্ন: মাশরুমে বিদ্যমান নিয়াসিন ও রিবোফ্লাভিন ত্বককে নরম ও কোমল রাখে।
- কিডনি সুরক্ষা ও এলার্জি প্রতিরোধ: নিউক্লিক অ্যাসিড, অ্যান্টি-এলার্জেন ও কম সোডিয়াম কিডনির কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে এবং এলার্জি প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- স্নায়ু ও মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য: স্ফিংগোলিপিড ও ভিটামিন B12 স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং হাইপারটেনশন কমায়।
- অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সুবিধা: পলিফেনল, সেলেনিয়াম ও সালফার শরীরকে স্ট্রোক, স্নায়ু রোগ ও ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে।
- দৃষ্টিশক্তি ও ওজন নিয়ন্ত্রণ: মাশরুমের খনিজ লবণ চোখের দৃষ্টি উন্নত করে। আঁশ (ফাইবার) পেটে দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখে এবং রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লাল মাংসের পরিবর্তে মাশরুম ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যও উপকৃত হয়।

মাশরুমের পুষ্টিমান ও উপকারিতা

মাশরুম একটি পুষ্টিকর এবং কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার। এটি প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সার্বিক স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

১. শক্তি ও ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট

প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা মাশরুমে থাকে:

উপাদান	পরিমাণ
শক্তি (Energy)	২৭ Kcal
শর্করা (Carbohydrate)	৪.১ g
স্নেহ পদার্থ (Fat)	০.১ g
প্রোটিন (Protein)	২.৫ g
ফাইবার (Fiber)	প্রায় ১ g

মাশরুমে চর্বি ও ক্যালোরি খুবই কম, কিন্তু প্রোটিনের পরিমাণ ভালো। ফলে এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ, ডায়েটারি পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের জন্য উপযুক্ত।

২. ভিটামিন

মাশরুমে রয়েছে বিভিন্ন বি-ভিটামিন, যা শরীরের বিপাক্রিয়া ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

ভিটামিন	পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রাম)	দৈনিক. প্রয়োজনীয়তার শতাংশ (%DV)	উপকারিতা
থায়ামিন (B1)	০.১ mg	৯%	স্নায়ু ও হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যক্রম সচল রাখে
রিবোফ্লাভিন (B2)	০.৫ mg	৪২%	শক্তি উৎপাদন ও ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করে
নিয়াসিন (B3)	৩.৮ mg	২৫%	রক্ত সঞ্চালন ও কোষের বিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে
প্যানাটোথেনিক অ্যাসিড (B5)	১.৫ mg	৩০%	হরমোন উৎপাদন ও ফ্যাট বিপাকে সহায়ক

৩. খনিজ পদার্থ (Minerals)

মাশরুমে বিভিন্ন অপরিহার্য খনিজ উপাদান রয়েছে যা শরীরের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খনিজ পদার্থ	পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রাম	দৈনিক প্রয়োজনীয়তার শতাংশ (%DV)	উপকারিতা
ক্যালসিয়াম (Calcium)	১৮ mg	২%	হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে
তামা (Copper)	০.৫ mg	২৫%	লোহিত রক্তকণিকা গঠনে সহায়তা করে
ফসফরাস (Phosphorus)	১২০ mg	১৭%	হাড় ও দাঁতের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ
পটাশিয়াম (Potassium)	৪৪৮ mg	১০%	রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে
সেডিয়াম (Sodium)	৬ mg	০%	-
জিঙ্ক (Zinc)	১.১ mg	১২%	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ক্ষত নিরাময়ে সহায়ক
লৌহ (Iron)	স্বল্প পরিমাণে	-	রক্তে অক্সিজেন পরিবহনে সাহায্য করে
সেলেনিয়াম (Selenium)	স্বল্প পরিমাণে	-	অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে

৪. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যাল

মাশরুমে পলিফেনল, গ্লুকান ও ক্যারোটিনয়েড জাতীয় যৌগ থাকে, যা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এগুলো কোষকে মুক্ত মৌল (free radicals)-এর ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, প্রদাহ কমায়, বার্ধক্য বিলম্বিত করে এবং ক্যান্সারসহ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

খাদ্য সংরক্ষণে মাশরুমের ভূমিকা

১. প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উৎস

মাশরুমে এমন কিছু বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ রয়েছে, যা ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এবং অন্যান্য ক্ষতিকর মাইক্রোবের বৃদ্ধি দমন করতে সক্ষম। ফ্লাভোনয়েড, ফেনলিক যৌগ এবং লেকটিনের মতো উপাদান প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। ফলে খাদ্যে ক্ষয়কারী ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ কমে যায় এবং সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়। এই প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রভাবের কারণে মাশরুম আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যক্রম

মাশরুমে ভিটামিন C, সেলেনিয়াম, এবং পলিফেনল জাতীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান বিদ্যমান, যা খাদ্যের তেল ও চর্বির অক্সিডেশন প্রতিরোধ করে। এর ফলে খাবারের রঙ, স্বাদ ও গন্ধ দীর্ঘ সময় ধরে অক্ষুণ্ন থাকে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যক্রম খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও মান বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রাকৃতিক সংরক্ষণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার

মাশরুম থেকে প্রাপ্ত নির্যাস (extract) বা পাউডার খাদ্য সংরক্ষণে প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মাশরুম নির্যাস ব্যবহার করে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট, স্যুপ, সস, বেকারি আইটেম কিংবা রেডি-টু-ইট খাবারে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটি রাসায়নিক সংরক্ষণকারীর বিকল্প হিসেবে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব।

৪. খাদ্য সংরক্ষণে অন্যান্য সুবিধা

মাশরুমভিত্তিক সংরক্ষণ পদ্ধতির একাধিক সুবিধা রয়েছে। এটি খাদ্যকে রাসায়নিক সংরক্ষণকারী ছাড়া নিরাপদভাবে সংরক্ষণে সাহায্য করে। এছাড়া খাবারের প্রাকৃতিক পুষ্টি, স্বাদ এবং গন্ধ দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকে। ফলে খাদ্যের মান উন্নত হয় এবং ভোক্তারা স্বাস্থ্যসম্মত ও সুস্বাদু খাবার উপভোগ করতে পারেন।

বিষাক্ত মাশরুম থেকে সতর্কতা

মাশরুম পুষ্টিকর হলেও সব প্রজাতি নিরাপদ নয়, কারণ কিছু মাশরুম মারাত্মক বিষাক্ত হতে পারে। যেমন Amanita phalloides (Death Cap) ও Amanita muscaria (Fly Agaric) খেলে বমি, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, মাথা ঘোরা, এমনকি লিভার ও কিডনি বিকল হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই বনে বা অজানা উৎস থেকে সংগ্রহ করা মাশরুম কখনোই খাওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র চাষকৃত ও নির্ভরযোগ্য উৎসের মাশরুমই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা নিরাপদ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ডিমের ভূমিকা

মো. ফাহাদ হোসেন ফাহিম, সিএনএন একাডেমি ফেলো ২০২৫, ভয়েসেস ফ্রম দ্য সাউথ স্নাতক, ফ্যাকাল্টি অব এনিমেল হাসবেন্ড্রি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের Key Performance Indicator (KPI) এর উৎপাদন শুধু সংখ্যার কলেবরই বাড়েনি, গুণে মানে-নিরাপদেও হয়ে উঠেছে টইটম্বুর। আর টইটম্বুর এই আয়োজনে জিয়নকাঠি হয়ে যার ভূমিকা অপ্রতিম, সে হচ্ছে বৈশ্বিক খাবার ডিম। বাংলাদেশের করোনা যুদ্ধের মুখপাত্র আইডিসিআর,বি বলছিল, করোনা মোকাবিলায় মাছ মাংস না পেলে বেশি করে ডিম খেতে। ইউনিসেফ ডিমকে বলছে সুপার ফুড যা নিশ্চিত করে সুপার হেলথ। পুষ্টিবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক Dr Lora Iannotti ডিমকে উল্লেখ্য করেছেন Nature's own Multivitamin হিসেবে।

অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মতে, তৈরি পোশাক শিল্পের পর বাংলাদেশের উন্নয়ন, উৎকর্ষতা ও বিপ্লবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পোল্ট্রি শিল্পের অবদান। বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের বিচিত্রমুখী উদ্যোগের একমাত্র সবর্ত্রগামী আয়োজন হচ্ছে পোল্ট্রি শিল্প যার আবেদন জুড়ে আছে গ্রামের প্রান্তিক খামার থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিনিয়োগেও। বিদ্যায়তনিক পোল্ট্রি বিজ্ঞানে ১১ টি বা ১২ টি প্রজাতির পাখি নিয়ে কাজ হয়ে থাকলেও বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পে ডিম উৎপাদনের Actor হিসেবে মুরগী, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, টার্কি, রাজহাঁস ইত্যাদির মধ্যে মুরগির ভূমিকাই অগ্রগণ্য। মোট ডিমের প্রায় ৮৪ শতাংশ আসে মুরগি এবং ১৫.৫ শতাংশ হাঁস থেকে। পোল্ট্রি বিজ্ঞানে ডিমকে সংজ্ঞায়িত করা হয়: Egg may be defined as a female reproductive unit covered by a hard shell and when fertilized has the capability to produce viable offspring and can also be used as an excellent source of nutrients for human consumption. বাণিজ্যিকভাবে সাধারণত দুই ধরণের ডিম উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এক ধরনের ডিম শুধুমাত্র আমাদের খাবারের জন্য ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় Table Egg এবং আরেক ধরনের ডিম হ্যাচারিতে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, একে বলা হয় Hatching Egg. চাইলে এ ডিম খাওয়াও যায়। খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই লক্ষ্যমাত্রা ও পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ডিমের রয়েছে বহুমাত্রিক ভূমিকা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উৎকর্ষতায় ডিমের Snowball Effect তত্ত্ব

একটি ছোট বরফের টুকরা যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়তে থাকে, তখন সেই ছোট্ট বরফের টুকরাটি বিশাল আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ডিমের প্রভাব সেই Snowball এর মতোই। কেননা:

ক. বিগত এক দশকে বাংলাদেশে ডিমের উৎপাদন বেড়েছে ২.৩৭৪ গুণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিমের বার্ষিক গড় উৎপাদন যেখানে ছিল ১০০০ কোটি, বর্তমানে সেই উৎপাদন পৌঁছেছে ২৩৭৩.৯৭ কোটিতে।

খ. ডিমের বাজারের বার্ষিক অর্থমূল্যমান গড়ে ৫০,০০০ থেকে ৯০,০০০ কোটি টাকা এবং উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি ৮-১১ শতাংশ। ফলে এই বাজার মূল্য আরও দশগুণ Expansion এর সুযোগ রয়েছে। (তথ্যনির্দেশ: Statista Market Forecast)

গ. বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ৬.৫ কোটি ডিম, বছরে প্রায় ২৫,০০০ কোটি ডিম উৎপাদিত হয় এবং বাণিজ্যিক খামারে ডিম উৎপাদনের খরচ গড়ে ১০.৫ টাকা। আর ডিম বিক্রি করা হয় ১৩-১৩.৫ টাকাতে। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে ৬৩-৬৫ কোটি টাকার দৈনিক রেভিনিউ এর সাথে ডিম জড়িত।

ঘ. মোট উৎপাদিত ডিমের ৫০ শতাংশ আসে বাণিজ্যিক খামার থেকে। বাকি ডিমের চাহিদা পূরণ হয় Rural অথবা Backward Poultry থেকে। আবার আমাদের বাজারে দেশী মুরগীর ডিমের আলাদা চাহিদা থাকায়, ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ যেমন রয়েছে, সাথে আছে Backward Poultri মতো গ্রামীণ শিল্পেরও রয়েছে উৎকর্ষতার সুযোগ। দেশি মুরগীর ডিমে Lutein বেশি থাকে, আবার হাঁসের ডিমের Dry matter content মুরগীর ডিমের চেয়ে ০.৫ শতাংশ বেশি থাকে, ফলে পুষ্টিমানও বেশি। লেয়ার ফার্মে বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ মোট বিনিয়োগকৃত মূলধনের ১০৭ শতাংশের বেশি। এছাড়া গ্রামীণ পোল্ট্রির মাধ্যমে পরিবারপ্রতি ২৫০ টি লেয়ারের মাধ্যমে বছরে ন্যূনতম ১ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। (তথ্যনির্দেশ: বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যা ও সম্ভবনা, ড. কৃষ্ণা গায়েন ও উম্মে রেহানা)

ঙ.হ্যাচারি শিল্পে Day Old Chick উৎপাদনের জন্য সপ্তাহে দুই কোটি বা আরও বেশি ডিমের সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে। একটি DOC এর দাম গড়ে ২৫ টাকা হলে, এই শিল্পের দৈনিক বাজার মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। তাছাড়াও বাচ্চা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে ১৮ থেকে ২২ শতাংশ হারে ডিম ও মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ. ফুড ভেল্যু চেইনের প্রতিটি স্তরেই খাবারে ভেল্যু এড হয়। ডিমের বহুমাত্রিক গুণাগুণের কারণে বাংলাদেশে বর্তমানে Designer Egg / Nutrient Enriched Egg/ Nutritional Fortified Egg/ Nutraceutical Value Added Egg ইন্ডাস্ট্রির সম্ভাবনাময় আত্মপ্রকাশ ঘটছে এবং ভবিষ্যতে এর বাজার মূল্য হবে ঈর্ষণীয়। হালফিল বাংলাদেশে রেনেটা কোম্পানি ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ ডিম বাজারজাত করছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত পাউডার ডিমের প্রচলন তেমন একটা হয় নি, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাঁচটি এগ পাউডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট রয়েছে, যেগুলোর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০০ টন এবং এই এগ পাউডার গুলো বিশ্বের ৩০ টি দেশে রপ্তানি করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডিমকে বিভিন্ন রুপে পাওয়া যায় যেমনঃ সম্পূর্ন ডিমের পাউডার, কুসুমের পাউডার, সাদা অংশের পাউডার, তরল ডিম ও ফ্রোজেন ডিম ইত্যাদি। ডিমের পাউডার পরিবহন করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং পরিবহনের সময় ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ডিমের পাউডার পোল্ট্রি শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূন্য পণ্য।

পাউডার ডিম সম্পূর্ণরূপে পানিশূন্য থাকে। পাউডার মিল্ক যেভাবে তৈরি করা হয় সেভাবেই একটি স্প্রে ড্রায়ারের মাধ্যমে এগ পাউডার তৈরি করা হয়। কাটিং এজ টেকনলজির (Cutting edge technology) মাধ্যমে ডিমটাকে ভেঙ্গে নেওয়া হয় তারপর ডিমের কুসুম থেকে ডিমের সাদা অংশ আলাদা করে নেওয়া হয়। ডিম ভাংগার কাজটি খুবই দ্রুত করা হয় অন্যথায় ডিমের সাদা অংশ ডিমের খোসার সাথে লেগে যেতে পারে। (তথ্যনির্দেশ: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিম সংরক্ষণ ও ব্যবহারে ডিমের পাউডার এর গুরুত্ব/ ড. ফারহানা শারমিন ও ড. মোঃ সাজেদুল করিম/ অক্টোবর, ২০২২) এগ পাউডার প্রস্তুত প্রণালীর একটি প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেখানো হল:

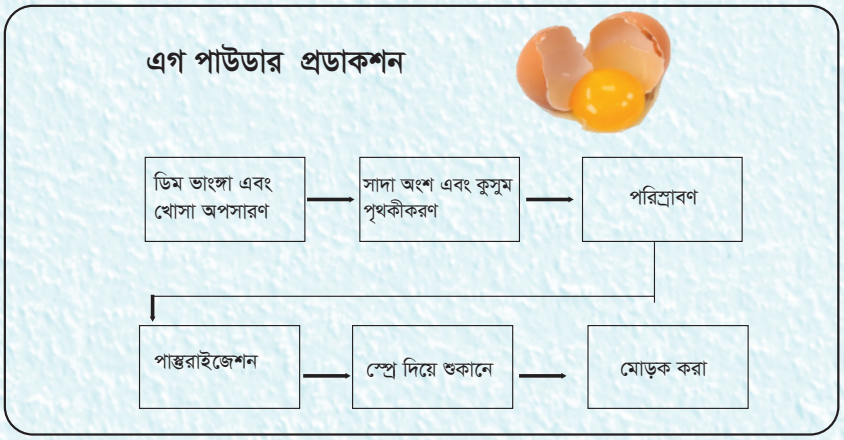

ছ. বিগত এক দশকে বাংলাদেশে মুরগী উৎপাদন বেড়েছে ১.২৮ গুণ এবং হাঁসের উৎপাদন বেড়েছে ১.৩৯ গুণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মুরগী ও হাঁসের উৎপাদন যেখান ছিল যথাক্রমে ২৫৫৩.১১ লাখ ও ৪৮৮.৬১ লাখ। বর্তমানে তার উৎপাদন যথাক্রমে ৩২৭৭.৭৭ লাখ ও ৬৮২.৬১ লাখ। পোল্ট্রির সংখ্যা বাড়াতে যেমন ডিমের প্রয়োজন, তেমনিভাবে ডিম উৎপাদনের জন্যও পোল্ট্রির বাজারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

জ. খামারে হাঁস মুরগী ছাড়াও বাজারে, হাঁটে, মেলায় কিংবা পেটশপে কবুতর, কোয়েল, টার্কি, রাজহাঁস ইত্যাদির সরবরাহে আমাদের লেয়ার ইন্ডাস্ট্রির সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১/২ টা কোম্পানি লেয়ারের Grand Parent নিয়ে বহুমাত্রিক কাজ করছে।

ঝ. আমাদের লাইভস্টক ফিড মিলিং ইন্ডাস্ট্রির Dominant Actor হচ্ছে Poultry Feed. ৭০ শতাংশ ফিড মিলই পোল্ট্রির খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। ১ কেজি ভালো মানের পোল্ট্রি ফিড তৈরিতে প্রায় ৬৫ টাকা খরচ হয় এবং লেয়ার মুরগী দৈনিক ১২০ গ্রাম খাবার খায়। ফলে একটি ডিম উৎপাদনের জন্য দৈনিক খাবার খরচ প্রায় ৮ টাকা। সাধারণত ব্রয়লার ও লেয়ার এবং তাদের Starter, Grower, Finisher এর জন্য Mash, Crumble, Pellet ইত্যাদি খাবার Formulate ও Manufacture করা হয় The Alltech Global Feed Survey ২০১৮ এর মতে, বৈশ্বিক ফিড মিলিং ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশের অবদান ০.৫০ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে এর বাজার মূল্য ছিল ১৮,৬৫০ কোটি টাকা, যা আমাদের জিডিপির ১ শতাংশের মতো। বর্তমানে ৩০০ টি নিবন্ধিত ফিড মিলের মধ্যে বেশিরভাগই হাঁস-মুরগির খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত।

ঞ. ডিম উৎপাদনকারী শীর্ষ দশটি দেশ (চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকো, রাশিয়া, জাপান, পাকিস্তান) বিশ্বের মোট ডিমের ৭০ শতাংশ উৎপাদন করে। এশিয়া মহাদেশের ডিমের ৭০ শতাংশ আসে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান থেকে। চীন থেকে একাই আসে সারা পৃথিবীর ৩০ শতাংশ ডিমের জোগান। আমাদের দেশের আবহাওয়া পোল্ট্রি পালন ও ডিম উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী হওয়ায় বৈশ্বিক বাজারে আমাদের Bargaining Capacity বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং আমাদের Diamond Egg Limited কোম্পানি ডিম রপ্তানিতে বিশ্বের সেরা বিশটি কোম্পানির একটি। এভাবে ডিমের বাজার ধরতে পারলে অর্জিত হতে পারে বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে ১ কোটি বাংলাদেশী রয়েছে যাদের কাছে দেশীয় ডিম খুবই প্রিয়।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ডিম এবং Phil Harding এর সমীকরণ

সুবিখ্যাত এনিমেল সাইন্টিস্ট এবং University of Florida'র অধ্যাপক Richard David Miles বলেছেন, "Over the past 20 years, there has been considerable interest in chicken eggs as carriers of critical nutrients."

বিগত দুই দশকে ডিমের অভাবনীয় উৎপাদন এবং ভবিষ্যত সম্ভবনা যে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে কতটা প্রায়োগিক তা বুঝা যাবে Phil Harding এর বিখ্যাত সমীকরণের মাধ্যমে। কারণ:

ক. ২০১৫-১৫ অর্থবছরে যেখানে আমাদের বাৎসরিক ডিম গ্রহণের সংখ্যা ছিল ৭৫টি, বর্তমানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১৩৭-১৩৮টি। FAO এর রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী পূর্বে বছরে ১০৪টি ডিমই আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ২০২৬ সালের মধ্যেই least developed countries থেকে একদিকে আমাদের যেমন উত্তরণ ঘটবে, তেমনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানবসম্পদের যথাযথ বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সুষম বণ্টন বজায় রাখতে আমাদের বছরে ন্যূনতম ২৪০ টি ডিম খাওয়া প্রয়োজন পড়বে। (Dept. of Poultry Science, BAU). WHO, FAO এর ২০১৬ সালের তথ্যমতে দৈনিক একটি এবং সর্বোচ্চ দুটি ডিম সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।

খ. ডিমের বায়োলজিকাল ভেল্যু ৯৪। একই সাথে Long Chain fatty acids এর পরিমাণ বেশি হওয়ায় সহজলভ্য পুষ্টির উৎস হিসেবে ডিমের তুলনা কেবল ডিমই হতে পারে। গার্মেন্টসের শ্রমিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলরদের জীবনে সহজে রান্নার সহজ মেন্যু হিসেবে ডিম তো প্রায় জাতীয় খাদ্যই বটে! ডিমের ভিটামিন ও মিনারেল হাড় ও দাঁত মজবুত করতে সহায়তা করে। ডিমের *Lutein I Zeaxanthin* দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি Age related muscular disease, heart disease ও প্রতিরোধ করে। ডিমের কোলিন মস্তিষ্কের নিউরন ডেভলপমেন্টের কাজ করে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আদর্শ মাত্রায় থাকায় তা বাড়তি খাবার খাওয়ার চাহিদা কমিয়ে দেয়। এতে ক্ষুধা কমে যায় এবং দেহের ওজনও কমে যায়। আর সবচেয়ে বড়কথা, FAO (২০১৩), Nutricion Hospitalaria (২০১৩), Upsala Journal of Medical Science (২০১৩) র একাধিক গবেষণায় বলা হয়েছে: Eating eggs is neither associated with the serum cholesterol nor worse to cardiovascular disease. বরং সেই গবেষণায় বলা হয়েছে: Avoiding the nature's perfect products egg means missing out on a world of good nutrition. চীনে প্রায় ৫ লাখ লোকের ওপর এক গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিদিন একটা করে ডিম খেলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিম থেকে শারীরিক উপকার পেতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে হবে। একসময় যে বলা হতো বেশি ডিম খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর, বিজ্ঞানীরা এখন সে মতবাদ পাল্টে ফেলেছেন। ইংল্যাণ্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিটা ফরুহি বলছেন, পুষ্টি সংক্রান্ত নানা গবেষণায় একটা বিষয় পরিস্কার যে প্রতিদিন একটা ডিম খেলে হৃদযন্ত্র বা শরীরের রক্ত সঞ্চালনে কোন ঝুঁকি তৈরি হয়না, বরং প্রতিদিন একটা ডিম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে।

ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তা ও পরিবেশকর্মী Phil Harding MBE তাঁর সমীকরণে better future এর যে স্বপ্ন দেখেছেন, ডিম সেই সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান হবার যোগ্যতা রাখে। তিনি লিখেছেন: Sustainable Energy + Food Security + Healthy Environment = Full Employment + Better Future. ডিম একইসাথে যেমন পুষ্টির উৎস, তেমনিভাবে এই শিল্পের বর্জ্য থেকে তৈরি হয় বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে জ্বালানী খাতে বিপ্লব সম্ভব। ফলে টেকসই পরিবেশে টেকসই জ্বালানি, নিরাপদ খাদ্য ডিমের মাধ্যমে better future অর্জিত হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ডিমের সম্ভবনা

ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে ২০ তম। (FAOSTAT, Helgi Library). USAID কর্তৃক প্রকাশিত Issue and Interventions in Poultry: Final Report on Bangladesh শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের যেসকল সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছিল তার বেশিরভাগই আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আর সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে; সরকারি, বেসরকারি কতৃপক্ষ, কৃষিবিদ, কৃষক, গবেষক, পশুচিকিৎসক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালস, এক্সপার্ট সবাইকে এক হতে হবে। যেসকল খামারিদের যত্নে অনুদিন ডিম পৌঁছে যায় আমাদের খাবার টেবিলে, যেসকল কৃষিবিদ, ভেটেরিনারি ডাক্তার ও এনিমেল হাসবেন্ড্রিয়ানদের সেবা ও গবেষণায় ডিমে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, যেই পোল্ট্রি, ফিডমিল এবং লেয়ার ইন্ডাস্ট্রি কোটি কোটি মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে, তার জন্য আমাদের একসাথে কাজ করা ছাড়া বিকল্প নেই। মুরগীর স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই, আমরা পাব তার সোনার ডিম। আর আমরা একসাথে কাজ করলেই অর্জিত হবে সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। এইতো সম্প্রতি দুবাইয়ে সংঘঠিত হওয়া UN Climate Conference COP28 G FAO Gi Director General W. Kz Ws BD বিশ্বনেতাদের সামনে গর্ব করে বলেছেন: "We have agrifood systems at the top of COP. It is a turning point. Use this COP 28 to work together in relevant partnerships and make it a gamechanger." এগ্রিফুড সিস্টেমের সবচেয়ে টেকসই ও সম্ভবনাময় উপাদান যে ডিম, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে ডিম শুধু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নয়, বৈশ্বিক উন্নয়নের ও Game-changer হবে একদিন।

Professional AGRO

CIBENZA® EP150
Feed additive preparation of *Bacillus licheniformis*

Fungiplex®
The Broad sprectrum and Long Acting Mold Inhibitor for Poultry Feeds

Avimatrix®
Feed Solution supports gut health through a unique blend of organic acids that works to stabilize microflora in the lower gut.

Emalon® C
The Comprehensive Antioxidant System for All Animal Feeds

Rovimix® PREMIX
Cattle Vitamin & Mineral Premix

Intest-Plus®
Encapsulated Na-Butyrate & Ca-Butyrate

GLOBAL PARTNERS

NOVUS DSM Bentoli Palital FEED ADDITIVES

Professional AGRO

91/2, Tejturi Bazar Chawk, Indira Road
Tejgaon, Dhaka-1215
Mobile: 01755-568393, 01827-394522
E-mail: fayzur.ah@gmail.com

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ও গ্রহণে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ও অ্যান্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ডা: মো: তাবীর হোসেন অন্তর, এম এস ফেলো (মাইক্রোবায়োলজি) ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সায়েন্স
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (Antimicrobial Resistance AMR) আজ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ও অযাচিত ব্যবহার মানুষের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ ও পরিবেশকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যশৃঙ্খলে বিস্তার ঘটছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুর এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO, ২০২৩) এই ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছে যে, প্রতি বছর সারাবিশ্বে প্রায় ৭ লাখ মানুষ অগজ সম্পর্কিত সংক্রমণে মারা যায় এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে, যদি না এখনই যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা না হয়[১]। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এটি একটি ভয়াবহ বার্তা। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক সংকট থেকে মুক্ত নয় - বরং আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল প্রাণিসম্পদ খাতের কারণে অগজ ঝুঁকি আরও প্রকট।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স কী ও কেন এটি বিপজ্জনক?

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে বিভিন্ন অনুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা পরজীবী) অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং প্রতিকূল পরিবেশেও মানবশরীর ও প্রাণিদেহে টিকে থাকে। ফলস্বরূপ, চিকিৎসায় ব্যবহৃত সাধারণ ওষুধগুলো আর কাজ করে না, এবং রোগের সংক্রমণ ও প্রতিকার কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অনুজীবের এই রেজিস্ট্যান্স ক্ষমতা সাধারণত তৈরি হয় অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত, বা যত্রতত্রভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে। অনেক সময় পশুখাদ্য, মাছের খাবার, এমনকি শাকসবজি চাষেও বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ ব্যবহার করা হয় - যা খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে।

- প্রাণিসম্পদ খাতে প্রায়ই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়[২]।
- পোলট্রি খামারে টেট্রাসাইক্লিন, কোলিস্টিন, এনরোফ্লক্সিন এর মতো ওষুধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ২০২২ সালে Livestock Research Institute (LRI) এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭৫% খামারি অ্যান্টিবায়োটিককে গ্রোথ প্রমোটার হিসেবে ব্যবহার করেন, যা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

  এছাড়াও, বাজারে বিক্রি হওয়া অনেক পশুখাদ্যে নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া গেছে[৩], যা খাদ্যচক্রে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ হিসেবে থেকে যায় এবং প্রাণিদেহ থেকে খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও AMR: এক অদৃশ্য সংযোগ

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জীবাণুসমূহ খাদ্যের মাধ্যমে সহজেই মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে, যদি না সেটা নিরাপদ খাদ্য হয়। মাছ, মাংস, দুধ, বা ডিমে থাকা বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া ভোক্তার শরীরে প্রবেশ করে ভোক্তাকে অসুস্থ ও সংক্রমিত করতে পারে। কারণ, খাবার তৈরি করার সময় যদি তা যথাযথভাবে রান্না করা না হয়, তাহলে খাবারের মধ্যে থাকা রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয় না।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের - এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৭০% পোলট্রি মাংস ও ৫০% কাঁচা দুধে মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট E. coli উপস্থিত থাকে[৪].
- বর্তমানে দেশের চিংড়ি খামারেও AMR এর উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে, যা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের রপ্তানি শিল্পের জন্য বড় হুমকি[৫].

  এইভাবে, AMR শুধু মানুষ বা প্রাণি স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তা নয়, বরং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

পরিবেশে AMR এর উপস্থিতি: এক অবহেলিত হুমকি

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াগুলো সহজেই হাস-মুরগি, গরু-ছাগলের খামারের বর্জ্য, হাসপাতালের ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বিভিন্ন ওষুধ কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও কৃষিজ বর্জ্যের মাধ্যমে সহজেই আশেপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব বর্জ্য প্রায়ই কোন রকমের পরিশোধন ছাড়াই নদী-নালা, খাল-বিল বা আশেপাশের চাষের জমিতে ফেলা হয়, যা ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পরে। এই দূষিত পানির মাধ্যমে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া মাটি, জলজ প্রাণি এমনকি শাকসবজিতেও পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে এইসব শাকসবজি চলে আসে আমাদের ডাইনিং টেবিলে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের নদীগুলোর পানিতে ESBL উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া ও কোলিস্টিন-রেজিস্ট্যান্ট জিন (mcr-1) পাওয়া গেছে[৬]। ফলে, পরিবেশ এখন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার এক বিশাল "রিজার্ভয়ার" বা ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

AMR ও জনস্বাস্থ্য: এক নীরব সংকট

বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে AMR এর প্রভাব ভয়াবহ। প্রচুর পরিমণে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও যথাযথভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স শেষ না করার জন্য দিন দিন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে।

- ৭০% সংক্রমণজনিত রোগে মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া জড়িত[৭]।
- সাধারণ ইনফেকশনজনিত রোগ, যেমনঃ নিউমোনিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ও টাইফয়েডের চিকিৎসা ক্রমেই জটিল হচ্ছে।
- "সুপারবাগ" যেমন Klebsiella pneumoniae বা Acinetobacter baumannii অনেক ক্ষেত্রেই সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিও রেজিস্ট্যান্ট হয়ে উঠছে। এতে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি, মৃত্যুহার বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর অপ্রতিরোধ্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে AMR এর প্রভাব

১. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি: অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জীবাণুর উপস্থিতির কারণে রোগ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয় উঠেছে, ফলে খামারিকে অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায়।

২. পণ্যের গুণমান হ্রাস: খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ থাকলে তার গুণগত মান কমে যায় এবং বাজারে গ্রহণযোগ্য থাকে না।

৩. রপ্তানিতে বাধা: আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য রপ্তানির জন্য "অ্যান্টিবায়োটিক-ফ্রি" সার্টিফিকেট না থাকলে সেই খাদ্যপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা যায় না। যার ফলে আমাদের পোলট্রি, মাছ, চিংড়ি, শাকসবজির রপ্তানি বন্ধ হতে পারে।

ফলে, AMR এখন শুধু জনস্বাস্থ্য নয়, বরং খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকি।

বাংলাদেশে AMR মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- অ্যান্টিবায়োটিকের সহজলভ্যতা এবং বিক্রিতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকা।
- রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত খামারে অযাচিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও অ্যান্টিবায়োটিকের উইথড্রল পিরিয়ড মেনে না চলা।
- খামারে ওষুধ ব্যবহারের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ব্যবস্থা দুর্বল।
- AMR সারভ্যাইলেন্স বা নজরদারির সীমাবদ্ধতা।
- গবেষণাগারের অবকাঠামোগত স্বল্পতা।
- কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে সচেতনতার অভাব।

যদিও বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে National Action Plan on AMR (২০১৭-২০২২) প্রণয়ন করেছে, কিন্তু এরবাস্তবায়ন এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়নি।

উত্তরণের উপায়: আমাদের করণীয়

১. **One Health পদ্ধতির বাস্তবায়ন**

মানুষ, প্রাণি ও পরিবেশ - এই তিনটি খাতকে সমন্বিত করে একক চিন্তা করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জরুরি। পরিবেশ, প্রাণি সুস্থ থাকলেই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

২. **অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ**

- পশুখাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।
- রেজিস্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বিক্রি বন্ধ করা ও নিয়মিত তদারকি করা।
- ফিড মিল ও ওষুধ কোম্পানির ওপর নিয়মিত মনিটরিং চালু করা।

৩. বিকল্প ব্যবস্থার প্রচলন অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান, প্রি-বায়োটিক, প্রোবায়োটিকের ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত খামারব্যবস্থাপনা, খামারে কঠোর বায়োসিকিউরিটি মেনে চলা ও রোগপ্রতিরোধে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানের ব্যবহার জোরদার করা।

৪. **জনসচেতনতা বৃদ্ধি**

কৃষক, খামারি, ভোক্তা ও সাধারণ মানুষকে মাত্রারিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে শিক্ষিত করা। গণমাধ্যমে নিয়মিত ও সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক প্রচারণা বাড়ানো দরকার।

৫. **গবেষণা ও নজরদারি জোরদার করা**

দেশব্যাপী ল্যাবভিত্তিক AMR সারভ্যাইলেন্স নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে, যাতে সময়মতো তথ্য বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

উপসংহার

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এখন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্যের জন্য এক অশনিসংকেত। অ্যান্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার শুধু বর্তমান প্রজন্মকেই নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ঝুঁকির মুখে ফেলছে। বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহন নিশ্চিত করতে হলে এখনই দরকার - অ্যান্টিবায়োটিকের দায়িত্বশীল ব্যবহার, খামার ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা, এবং মানুষ-প্রাণি-পরিবেশের সমন্বিত One Health নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা। আমাদের আজকের সচেতন এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তই পারে আগামী প্রজন্মকে এক সুস্থ, নিরাপদ ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা উপহার দিতে।

তথ্যসূত্র:

1. World Health Organization (WHO). (2023). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance.
2. Rahman, M. A. et al. (2021). “Antibiotic Use and Resistance in Bangladesh: A One Health Perspective.” Frontiers in Public Health.
3. Kabir, S. M. L. et al. (2020). Antibiotic residues in poultry feed and their impacts in Bangladesh. Bangladesh Journal of Microbiology.
4. Sultana, R. et al. (2022). “Occurrence of MDR E. coli in poultry meat and raw milk in Bangladesh.” Food Control.
5. Hossain, M. S. et al. (2021). Antibiotic resistance in shrimp aquaculture systems of Bangladesh. Aquaculture Reports.
6. Islam, M. A. et al. (2023). Environmental Pollution and AMR Gene Dissemination in Bangladesh Rivers. Environmental Pollution Journal.
7. Directorate General of Health Services (DGHS). (2023). AMR Surveillance Bangladesh Annual Report.

বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ

আতিকা মারজিয়া খান শৈলী, এনিমাল সাইন্স এ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২২৫

ভূমিকা

খাদ্য মানুষের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। খাদ্যই বেঁচে থাকার প্রধান চালিকা, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষি সংকট আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। একদিকে কৃষিজমি সংকুচিত হচ্ছে, অন্যদিকে খাদ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বাস্তবতায় টেকসই খাদ্য উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। এই টেকসই উৎপাদনের চাবিকাঠি হল প্রযুক্তি। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের জন্য অনেক সুযোগ খুলে দিয়েছে যা তারা আগে কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি।

আধুনিক কৃষিতে প্রযুক্তির নবযাত্রা

বাংলাদেশের কৃষি খাত একসময় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বৃষ্টিপাত, মৌসুমি বায়ু এবং ঐতিহ্যগত কৃষি জ্ঞান সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদন কম ছিল। যাইহোক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য আজ কৃষি একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে।

স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি, যেমন:

- ড্রিপ এবং স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা,
- ড্রোন কীটনাশক স্প্রে করা,
- মাটি এবং আবহাওয়া বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ফসল পরিকল্পনা,
- হাইব্রিড এবং জেনেটিক্যালি উন্নত জাতের উদ্ভাবন,

বাংলাদেশের কৃষিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে, কৃষকরা এখন জানেন বেশি ফলনের জন্য কখন বীজ বপন করতে হবে, কোন ফসল কোন জমির জন্য বেশি উপযোগী এবং কম খরচে কীভাবে পানি ও সার ব্যবহার করতে হবে। ফলে উৎপাদন বেড়েছে, খরচ কমেছে, মুনাফা বেড়েছে।

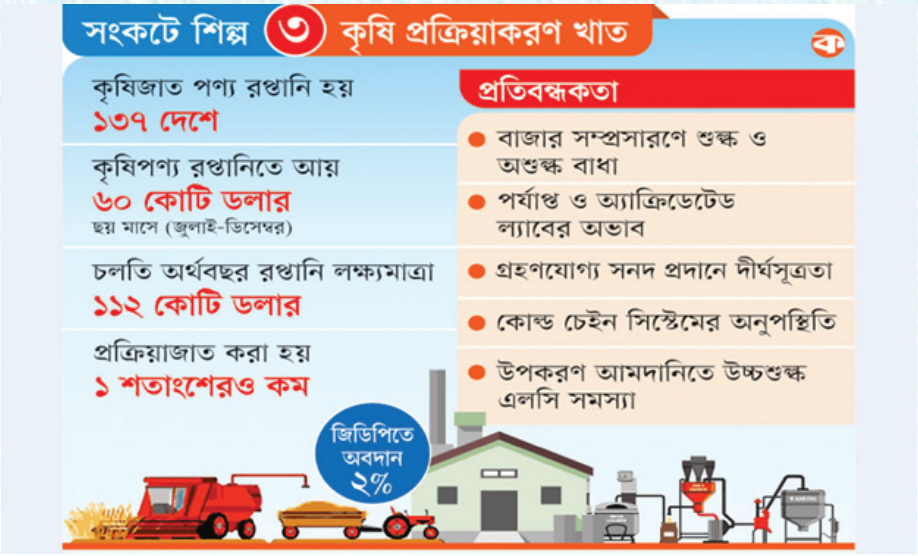

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রযুক্তির বিপ্লব

খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ এখন বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশেও এই খাত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং, কোল্ড চেইন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য খাদ্যের আপসহীন গুণমান নিশ্চিত করেছে এবং এর শেলফ লাইফ বাড়িয়েছে। ফল, সবজি, মাছ এবং মাংস এখন প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়, যা দেশের অর্থনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে।

উপরন্তু, ডিজিটাল ফুড ট্রেসিং সিস্টেম (DFT) বা ছজ কোড লেবেলগুলির জন্য ধন্যবাদ, ভোক্তারা এখন জানেন যে তারা যে খাবারটি কিনেছিলেন তা কোথায় উৎপাদিত হয়েছিল, কখন এটি প্রক্রিয়া করা হয়েছিল এবং কতক্ষণ এটি নিরাপদ থাকে। এটি শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তা নয়, ভোক্তাদের আস্থার দিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

টেকসই প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব কৃষি

অতীতে, কৃষি প্রায়শই পরিবেশের ক্ষতি করত–সার ও কীটনাশকের অত্যধিক ব্যবহার, অতিরিক্ত সেচ ইত্যাদি, মাটির উর্বরতা এবং জীববৈচিত্র্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কিন্তু সময় বদলেছে। টেকসই কৃষি প্রযুক্তি আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে পরিবেশের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন বাড়াতে হয়।

যেমন-

- জৈব সার এবং জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়।
- ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট (IPM) কীটনাশকের ব্যবহার কমায়।
- হাইড্রোপনিক্স এবং উল্লম্ব কৃষি প্রযুক্তি শহুরে ছাদে বা ছোট জায়গায় খাদ্য উৎপাদন সক্ষম করে।
- সৌর-চালিত সেচ পাম্প কৃষকদের বিদ্যুতের খরচ কমায় এবং একই সাথে কার্বন নিঃসরণ কমায়।

এই প্রযুক্তিগুলিকে একত্রিত করা হল "টেকসই কৃষি" এর একটি সত্যিকারের রূপ, যা উৎপাদন বাড়ায় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্পদ রক্ষা করে।

প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যখাতে প্রযুক্তির অবদান

বাংলাদেশের খাদ্যব্যবস্থায় প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যখাতের অবদান অপরিসীম। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এখন মাছ ও মাংস উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে।

- বায়োফ্লক প্রযুক্তি এখন মাছ চাষে এক নতুন দিগন্ত। এতে অল্প জায়গায় বেশি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, পানির অপচয় কমছে, এবং পরিবেশও রক্ষা পাচ্ছে।
- কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি (Artificial Breeding) প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছে।
- ডিজিটাল হেলথ মনিটরিং সিস্টেম এখন খামারের প্রাণীর স্বাস্থ্য নিরীক্ষণেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

এসব প্রযুক্তির ফলে শুধু উৎপাদনই বাড়ছে না, খাদ্যের গুণগত মানও রক্ষা পাচ্ছে– যা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

খাদ্য সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশ্বে উৎপাদিত মোট খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয় সংরক্ষণের অভাবে। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের মুখে।

কিন্তু বর্তমানে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ প্রযুক্তি, ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং, স্মার্ট লজিস্টিক ট্র্যাকিং সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে এই অপচয় অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে।

খাদ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি "খাদ্য পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি" (Food Recycling Technology) আজ বৈশ্বিকভাবে আলোচিত। অব্যবহৃত খাদ্যকে পশুখাদ্য, সার বা বায়োফুয়েলে রূপান্তর করে টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষকের হাতে স্মার্ট প্রযুক্তি

এক সময় কৃষক ছিলেন তথ্যবঞ্চিত। এখন তিনি হাতে পাচ্ছেন স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও কৃষি-অ্যাপস। কৃষি কল সেন্টার, এগ্রিবট, ডিজিটাল কৃষকের জানালা– এসব উদ্যোগ কৃষকের প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দিচ্ছে। ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস কৃষককে সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যুক্ত করছে, ফলে মধ্যস্বত্বভোগী কমছে এবং কৃষক পাচ্ছেন ন্যায্য দাম। এই ডিজিটাল রূপান্তর শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার নয়– এটি কৃষির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকেও বদলে দিচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

তবে টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগের পথে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে– যেমন পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, প্রযুক্তির উচ্চমূল্য, অবকাঠামোগত ঘাটতি ও তথ্যপ্রবাহের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে!এগুলো অতিক্রম করা সম্ভব।বাংলাদেশ এখন স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী খাদ্য শিল্পের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন পূরণে এই খাত হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি।

উপসংহার

খাদ্য শুধু ক্ষুধা মেটানোর উপায় নয়-এটি একটি দেশের অস্তিত্ব, উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন। আজ, যখন বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপের সাথে লড়াই করছে, টেকসই প্রযুক্তি আশার একটি নতুন আলো দেয়।যদি বাংলাদেশের কৃষক, বিজ্ঞানী এবং উদ্যোক্তারা–সবাই মিলে-কার্যকরভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, তাহলে আমরা শীঘ্রই একটি নিরাপদ, টেকসই, এবং প্রযুক্তি-চালিত খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।

BACTOSAC (PROBIOTICS + POSTBIOTICS)

Good gut, Great performance, Goal Salmonella free

Benefits :

- Dramatically reduction of Salmonella (all serovar)
- Reduce enteropathogen ex. E. coli, Clostridium perfringens
- Improve gut's health
- Improve hatch ability and chick quality

BACTOSAC

Special selection for tolerance to

- pH: 2- 11
- Chlorine up to 9 ppm
- Bile salt up to 10% w/v
- Wide range of antimicrobials resistance without the ability of R-factor transfers

MICRO-GUARD P/L

Reduce manure odor, reduce flies population, Rapid biodegradation

Direction for use :

Broiler and Breeder farm: 500 g or ml of MICRO-GUARD PER 500-750 m^2

Swine house: 0.5 ml of MICRO-GUARD-L per pig put into wasting area or mixed with water and spray over pen floor and drainage area

Farm waste digester: 4 kg or liter of MICRO-GUARD per metric ton of carcass capacity

Fertilizer: 2 liters of MICRO-GUARD-L spray over manure 1 ton

Waste water: 1-2 kg or liter of MICRO-GUARD per 1,000 m^3 of waste water

Lagoon/biogas:

Initial treatment : use 4 kg or liter of MICRO-GUARD for each 1,000 m^3, Add directly to the basin inlet

Maintainance: use 2 kg or liter of MICRO-GUARD OF each 1,000 m^3, Repeat once a week

ISO 17025

AC 07-29-9999-0055-000 Registered by ACFS

GMP

K.M.P. BIOTECH CO., LTD.
89/578 Green lake village, Bangna-Trad Rd. Km. 13, Bangplee, Samutprakam 10540, Thailand
Tel. +66-2316-0965-9, Fax. +66-2316-0971
www.kmpbiotech.com

Marketed by :

PVF AGRO LIMITED
H.M. Plaza, 11th Floor, Room # 02, Plot # 34
Road # 02, Sector # 03, Uttara, Dhaka-1230
Phone : 88 02 8933152, Fax : 88 02 8933152
E-mail : pvfagro@yahoo.com, web : www.pvfagro.com

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা: ফার্ম থেকে প্লেট পর্যন্ত খাদ্য সুরক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার (ব্লকচেইন, স্মার্ট সেন্সর)

আব্দুল আউয়াল চৌধুরী মাসুদ, পিএইচডি গবেষক, মিলান বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি এবং সহকারী অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৭

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য হল অন্যতম মৌলিক চাহিদা। তবে শুধু খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলেই তা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। খাদ্যের যথেষ্ঠ যোগানের সাথে সাথে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমানভাবে জরুরি। নিরাপদ খাদ্য বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি, খাদ্য যেন ভেজালমুক্ত, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মানুষ খাদ্যে উপস্থিত জীবাণু বা রাসায়নিকের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে। দূষিত খাদ্য থেকে প্রায় ২০০ প্রকার রোগ ছড়াতে পারে। বিশেষত শিশু, গর্ভবতী নারী ও প্রবীণরা এসব রোগে মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মুখে থাকে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সরাসরি জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত অধিকাংশ খাদ্যপণ্যই বিভিন্ন মাত্রায় ভেজালযুক্ত বা মানহীন অবস্থায় বাজারজাত হয়। প্রস্তুত প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ভোগ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রায় প্রতিটি ধাপে এই সমস্যা বিদ্যমান। খাদ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুড কেন্দ্র–সব জায়গাতেই কোনো না কোনোভাবে ভেজালের অনৈতিক চর্চা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় অথবা পচা-নষ্ট খাদ্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ ও বিক্রির মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছে যায়। এসব কর্মকাণ্ড জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যার ফলে ডায়রিয়া, ক্যান্সার, কিডনি ও লিভারের সমস্যা, এমনকি স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতাসহ দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি অসংখ্য রোগের প্রকোপ বাড়ছে। অন্যদিকে, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কেবল স্বাস্থ্য নয়, অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। অসুস্থতার কারণে কর্মক্ষমতা কমে যায়, কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা অনেকাংশেই এখনও সনাতন ও প্রচলিত পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। এসব পদ্ধতির প্রধান দুর্বলতাগুলোর মধ্যে রয়েছে–সময়সাপেক্ষ পরিদর্শন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যের অভাব, এবং কার্যকর মনিটরিং ও ট্রেসেবিলিটি (traceability) ঘাটতি। ফলে খাদ্য ভেজাল বা দূষণের উৎস দ্রুত শনাক্ত করা যায় না, প্রমাণ সংগ্রহ ও দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে দেরি হয়। এছাড়া সীমিত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে (supply chain) স্বচ্ছতা থাকে না, যা নীতিনির্ধারক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধাগ্রস্ত করে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রক্রিয়া ধীরগতির ও সীমিত, সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত, নির্ভুল ও স্বচ্ছ সমাধান প্রদান করে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে খাদ্যের উৎপাদন থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ সহজে ট্র্যাক করা সম্ভব, যা ভেজাল শনাক্তকরণ ও উৎস নির্ধারণকে সহজ করে তোলে। সেন্সরভিত্তিক মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও আইওটি (IoT) প্রযুক্তি খাদ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে বিগ ডাটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) ব্যবহার করে ঝুঁকি পূর্বাভাস, দূষণ শনাক্তকরণ এবং নীতি প্রণয়নে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু খাদ্যের গুণগত মান ও ভোক্তার আস্থা বৃদ্ধি করে না, বরং একটি টেকসই ও কার্যকর খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে 'ফার্ম থেকে প্লেট' পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম বজায় রাখা অপরিহার্য। খাদ্য উৎপাদনের প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ কৃষি খামার থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং চূড়ান্তভাবে ভোক্তার খাবার প্লেটে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গুণমান এবং সুরক্ষা মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। এই সমন্বিত ও নিশ্ছিদ্র নজরদারিই পারে খাদ্য শৃঙ্খলের সব ধরনের ঝুঁকি যেমন–রাসায়নিক দূষণ বা জীবাণু সংক্রমণ–এড়িয়ে একটি সুস্থ ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। এই সার্বিক প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহারকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল-এ (Food Supply Chain) প্রযুক্তির ব্যবহার

ব্লকচেইন (Blockchain)

খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্লকচেইন প্রযুক্তি এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। এটি একটি সুরক্ষিত ডিজিটাল লেজার হিসেবে কাজ করে, যা খামার থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন এবং স্টোরেজ পর্যন্ত খাদ্যের পুরো যাত্রাপথের তথ্যকে অপরিবর্তনীয়ভাবে সংরক্ষণ করে। ব্লকচেইনের মূল কার্যকারিতা হলো এটি খাদ্যের উৎস সম্পর্কিত প্রতিটি ডেটাকে টেম্পার-প্রুফ (Tamper-proof) বা পরিবর্তন-অসাধ্য উপায়ে রেকর্ড করে।

এর প্রধান সুবিধা হলো এটি খাদ্যের উৎস সন্ধান (Food Traceability) প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত দ্রুত ও নির্ভুল করে তোলে। সনাতন পদ্ধতিতে কোনো খাদ্যে ভেজাল বা দূষণের ঘটনা ঘটলে তা অনুসন্ধান করতে যেখানে সপ্তাহ বা মাস লেগে যেতে পারে, সেখানে ব্লকচেইন ব্যবহার করে সেকেন্ডের মধ্যে দূষণের আসল উৎস চিহ্নিত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সুপারমার্কেট থেকে কেনা ডিমে স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া যায়, ব্লকচেইন সেই নির্দিষ্ট ডিমের ব্যাচটি কোন খামার থেকে এসেছে, কখন পরিবহন হয়েছে এবং কোন তাপমাত্রায় সংরক্ষিত ছিল–তার সমস্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করতে পারে। এর ফলে দ্রুত খারাপ পণ্য বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া যায় এবং বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়ানো যায়। সংক্ষেপে, ব্লকচেইন খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও আস্থা তৈরি করে।

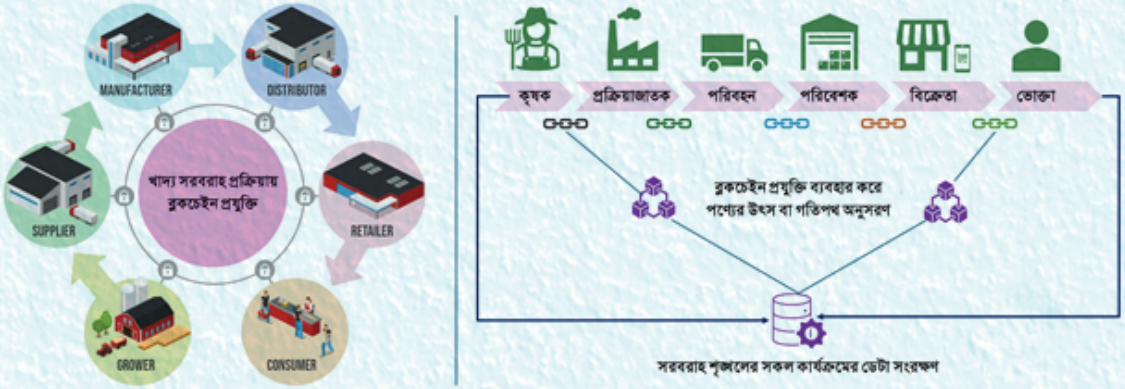

ছবিঃ খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার

আইওটি ও স্মার্ট সেন্সর (IoT and Smart Sensors)

খাদ্য সুরক্ষায় ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) এবং স্মার্ট সেন্সর অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার। এদের মূল কার্যকারিতা হলো খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং গ্যাসের মাত্রা রিয়েল-টাইমে (Real-Time) পর্যবেক্ষণ করা। খাদ্য নষ্ট হওয়া বা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো তাপমাত্রার ওঠানামা। স্মার্ট সেন্সরগুলো খাদ্য পরিবহনের কন্টেইনার, কোল্ড স্টোরেজ এবং গুদামে অবিরাম এই পরিবেশগত প্যারামিটারগুলো পরিমাপ করে। এর প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য নষ্ট হওয়া কার্যকরভাবে রোধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুধ বা মাছ বহনকারী কোনো ট্রাকে সংরক্ষিত তাপমাত্রা হঠাৎ অনিরাপদ মাত্রায় বেড়ে যায়, তবে স্মার্ট সেন্সরগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্কতা (Alert) পাঠায়। এই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা যায়, খাদ্যের গুণমান অক্ষুণ্ন থাকে এবং ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত পণ্যটি নিরাপদ থাকে। এভাবে আইওটি সেন্সরগুলি পুরো সাপ্লাই চেইন জুড়ে একটি নিশ্ছিদ্র নজরদারি নিশ্চিত করে।

ছবিঃ আইওটি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি

২. ফার্মিং এবং উৎপাদন-এ (Farming and Production) প্রযুক্তির ব্যবহার

এআই (Artificial Intelligence) ও মেশিন লার্নিং (Machine Learning)

খাদ্য নিরাপত্তার যাত্রা শুরু হয় খামার বা ফার্ম থেকেই, এবং এই পর্যায়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও মেশিন লার্নিং (Machine Learning) নিরাপদ ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সনাতন পদ্ধতির বিপরীতে, এই প্রযুক্তিগুলো এখন কৃষকদের তথ্য-চালিত (data-driven) সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে, যার মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদনের গুণমান বৃদ্ধি করা এবং খাদ্য দূষণের ঝুঁকি হ্রাস করা। এই প্রযুক্তির প্রধান প্রয়োগগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ। মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলো মাটির গঠন, পুষ্টির মাত্রা এবং আর্দ্রতার ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে কৃষকদের জানায় কোন ধরনের ফসল কোথায় সবচেয়ে ভালো ফলন দেবে এবং ঠিক কী পরিমাণ সারের প্রয়োজন। একইভাবে, কীটপতঙ্গ ও রোগ সনাক্তকরণে এআই ক্যামেরা ও সেন্সর ব্যবহার করা হয়। এটি ফসলকে আক্রমণকারী রোগ বা কীটপতঙ্গকে প্রাথমিক পর্যায়েই চিহ্নিত করে, যাতে স্থানীয়ভাবে দ্রুত প্রতিকার করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই প্রযুক্তি কীটনাশকের সঠিক ডোজ নির্ধারণে সহায়তা করে। জিপিএস-নির্ভর সরঞ্জামগুলোর মাধ্যমে এআই বলে দেয় ঠিক কতটুকু রাসায়নিক, কখন এবং ফসলের ঠিক কোন অংশে প্রয়োগ করতে হবে। এর সরাসরি সুবিধা হলো অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার হ্রাস। যখন কৃষক নির্ভুলভাবে জানতে পারেন যে একটি নির্দিষ্ট এলাকার ফসলের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন, তখন পুরো জমিতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাসায়নিক স্প্রে করা এড়ানো যায়। এর ফলে পরিবেশের উপর কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব কমে আসে, ফসলে রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ কম থাকে, এবং সর্বোপরি নিরাপদ শস্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়। এভাবে, এআই ও মেশিন লার্নিং স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও সুস্থ পরিবেশের মধ্যে একটি কার্যকর ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ড্রোন ও রিমোট সেন্সিং (Drone and Remote sensing)

খাদ্য উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ড্রোন (Drone) ও রিমোট সেন্সিং (Remote Sensing) প্রযুক্তি এখন একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই প্রযুক্তির প্রধান প্রয়োগ হলো বৃহৎ

খামারে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা। সনাতন পদ্ধতিতে যেখানে বিশাল কৃষি এলাকা হেঁটে বা যানবাহন ব্যবহার করে পরিদর্শন করতে প্রচুর সময় ও জনবল লাগত এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দেরিতে ধরা পড়ত, সেখানে ড্রোনগুলো বর্তমানে মিনিটেই আকাশ থেকে কাজ করে। এরা অত্যাধুনিক মাল্টিস্পেকট্রাল বা ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করে ফসলের বিস্তারিত চিত্র ধারণ করে। এই উচ্চ-রেজোলিউশন চিত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত রিমোট সেন্সিং ডেটা বিশ্লেষণ করে কৃষি বিজ্ঞানীরা নির্ভুলভাবে বলতে পারেন ফসলের ঠিক কোথায় পানির অভাব রয়েছে, কোন অংশে রোগ বা কীটপতঙ্গের আক্রমণ ঘটেছে অথবা পুষ্টির ঘাটতি আছে–যা খালি চোখে ধরা কঠিন। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি কেবল পরিদর্শনের সময় ও খরচ কমিয়ে আনে না, বরং কৃষকদের একটি সঠিক অবস্থান-ভিত্তিক ডেটা সরবরাহ করে। এই ডেটার ওপর ভিত্তি করে কৃষকরা তাৎক্ষণিকভাবে কেবল সেইসব সমস্যাযুক্ত এলাকাগুলোতে ব্যবস্থা নিতে সহায়তা পান। অর্থাৎ, ড্রোনগুলো পুরো ক্ষেতের বদলে শুধু দরকারি স্থানেই সার বা কীটনাশক প্রয়োগের নির্দেশনা দেয় (Precision Application)। এর ফলে রাসায়নিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ব্যাপকভাবে কমে আসে, যা একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব কৃষি নিশ্চিত করে, তেমনি ফসলে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই নির্ভুল পর্যবেক্ষণ এবং হস্তক্ষেপের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রথম ধাপেই গুণমানের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩. প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং (Processing and Packaging)

রোবোটিক্স ও অটোমেশন (Robotics and Automation)

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিংয়ে রোবোটিক্স এবং অটোমেশন প্রযুক্তির ব্যবহার খাদ্য নিরাপত্তার মানকে সম্পূর্ণ নতুন স্তরে নিয়ে গেছে। এই প্রযুক্তির মূল প্রয়োগ হলো প্রক্রিয়াকরণের সময় মানব স্পর্শ কমিয়ে আনা। মানুষের হাত বা পরিবেশ থেকে আসা জীবাণু বা দূষণের ঝুঁকি খাদ্য সুরক্ষার জন্য একটি বড় হুমকি। স্বয়ংক্রিয় বা রোবট-চালিত সিস্টেমগুলো দ্রুত, নির্ভুল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বাছাই, কাটা, মেশানো এবং প্যাকেজিংয়ের কাজগুলো সম্পন্ন করে। রোবটগুলো জীবাণুমুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করতে পারে, যা খাদ্য সামগ্রীর দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে শুধু গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, বরং প্রতিটি ধাপে একটি সুসংগত ও উচ্চ মানের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা নিশ্চিত করা হয়। এইভাবে, রোবোটিক্স ও অটোমেশন প্রযুক্তি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলোতে খাদ্যের গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভোক্তার কাছে নিরাপদ পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করে।

স্মার্ট প্যাকেজিং (Smart Packaging)

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ধাপগুলোর একটি হলো স্মার্ট প্যাকেজিং (Smart Packaging)। এটি কেবল খাদ্যকে ঢেকে রাখাই নয়, বরং প্যাকেজের অভ্যন্তরে খাদ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এর মূল কার্যকারিতা হলো প্যাকেজের ভেতরে থাকা খাদ্যের সতেজতা ও গুণমান রিয়েল-টাইমে পরিমাপ করা। এই প্যাকেজিংয়ে ব্যবহৃত সেন্সর বা সূচকগুলো খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তন (যেমন: গ্যাস নিঃসরণ বা অম্লতা বৃদ্ধি) শনাক্ত করে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথাগত প্যাকেজের গায়ে মুদ্রিত মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখের চেয়েও নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। কারণ, অনেক সময় সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে ঘোষিত তারিখের আগেই খাদ্য খারাপ হতে শুরু করে। স্মার্ট প্যাকেজিং তখন নিজেই এই পরিবর্তনগুলো শনাক্ত করে প্যাকেজের গায়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন (যেমন: রঙের পরিবর্তন বা কিউআর কোডের আপডেট) ঘটায়, যা গ্রাহককে মেয়াদোত্তীর্ণের সঠিক সময় সম্পর্কে অবহিত করে। ফলে ভোক্তা কেবল একটি মুদ্রিত তারিখের উপর নির্ভর না করে খাদ্যের প্রকৃত অবস্থা জেনে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে, যা খাদ্য বর্জ্য কমাতে এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

খাদ্য সুরক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার: চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ব্লকচেইন, আইওটি ও স্মার্ট সেন্সরের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশাল হলেও এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, যা বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আরও প্রকট। প্রথম এবং সবচেয়ে বড় বাধাটি হলো প্রাথমিক খরচ (Initial Cost)। স্মার্ট সেন্সর ক্রয় ও স্থাপন, ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মের ডেভেলপমেন্ট এবং এআই সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশনের জন্য উচ্চ ব্যয় প্রয়োজন। ছোট ও মাঝারি আকারের কৃষি উদ্যোগ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও দীর্ঘমেয়াদে এই প্রযুক্তিগুলো খাদ্য অপচয় হ্রাস এবং দক্ষতার মাধ্যমে বিনিয়োগ ফিরিয়ে আনে, কিন্তু প্রাথমিক অর্থায়নের অভাব একটি বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হলো দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ (Skill and Training)। নতুন প্রযুক্তি সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। কৃষকদের, গুদাম পরিচালনাকারীদের এবং খাদ্য পরিদর্শকদের ব্লকচেইন ডেটা বিশ্লেষণ, আইওটি ডিভাইস রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্মার্ট সিস্টেমগুলো ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব থাকলে এই ব্যয়বহুল প্রযুক্তিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে বা ভুল ডেটা প্রদান করে, যা উল্টো খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো ডেটা ইন্টিগ্রেশন (Data Integration)। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে কৃষক, প্রক্রিয়াকরণকারী, পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা–একাধিক অংশীদার জড়িত থাকে। এদের সবার মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি সাধারণ মান (Standard) ও প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। বিভিন্ন সংস্থার প্রযুক্তিগত পার্থক্য এবং ডেটা ফরম্যাটের ভিন্নতার কারণে ব্লকচেইনে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়, ফলে পুরো শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা ও ট্র্যাসিবিলিটি ব্যাহত হয়। সর্বশেষ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে প্রযুক্তির সহজলভ্যতা। দেশের খাদ্য উৎপাদনের একটি বড় অংশ আসে ক্ষুদ্রায়তন খামার থেকে, যাদের প্রযুক্তি ক্রয়ের সক্ষমতা সীমিত। উচ্চমূল্যের প্রযুক্তির পরিবর্তে তাদের জন্য সাশ্রয়ী, ব্যবহার-বান্ধব এবং স্থানীয় আবহাওয়া উপযোগী সমাধান প্রদান করা এবং সরকারি ভর্তুকি বা সহজ ঋণের মাধ্যমে এই প্রযুক্তিগুলোকে তাদের নাগালের মধ্যে আনা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য। এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করতে না পারলে, প্রযুক্তির সুফল কেবল বড় কর্পোরেশনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যা সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করবে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য 'ফার্ম থেকে প্লেট' পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার এখন আর শুধু আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং সময়ের দাবি। আমরা দেখেছি কীভাবে ব্লকচেইন (Blockchain) প্রযুক্তি খাদ্যের উৎস সন্ধান ক্ষমতা (Traceability) এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে দূষণের উৎস দ্রুত চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, স্মার্ট সেন্সর ও আইওটি (IoT) পরিবহন ও সংরক্ষণে রিয়েল-টাইমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্যের সতেজতা বজায় রাখে। পাশাপাশি, এআই (AI) এবং মেশিন লার্নিং খামারে কীটনাশকের নির্ভুল প্রয়োগ নিশ্চিত করে নিরাপদ শস্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। এই প্রযুক্তিগুলো সম্মিলিতভাবে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও দক্ষ, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলছে। তবে, এই পরিবর্তনের গতি বজায় রাখতে হলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্সের আরও ব্যাপক প্রয়োগ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে মানুষের হস্তক্ষেপ কমিয়ে নিরাপত্তা বাড়াবে এবং স্মার্ট প্যাকেজিং খাদ্য অপচয় কমাতে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। এই লক্ষ্য অর্জনে কিছু জরুরি সুপারিশ রয়েছে। নীতি নির্ধারকদের উচিত প্রযুক্তি স্থাপনে সরকারি ভর্তুকি ও সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য। পাশাপাশি, কৃষি ও খাদ্য শিল্পের কর্মীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ভোক্তাদেরও এই প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা স্মার্ট প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে খাদ্যের গুণমান যাচাই করে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পরিশেষে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখন প্রযুক্তি গ্রহণের বিকল্প নেই। সকলের সচেতনতা, সহযোগিতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন খাতের ভূমিকা

ডাঃ কাজী আব্দুস সবুর, ভ্যালু চেইন ফাসিলিটেটর (লাইভস্টক সার্ভিস মার্কেট), আরএমটিপি, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তা এখন আর কেবল উৎপাদন বাড়ানো তে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সম্পূর্ণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিক্রয়ের প্রতিটি ধাপকে জীবাণুমুক্ত, ট্রেসেবল ও মানসম্মত করা অন্তর্ভুক্ত। অথচ বর্তমান বাস্তবতা বলছে, খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও অপচয়, মানহানি ও রেগুলেটরির দুর্বলতার কারণে ভোক্তার টেবিলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখনো সম্ভব হয়নি। বছরে প্রায় দুই কোটি টন খাবার নষ্ট হয়। উৎপাদিত খাদ্যের বড় অংশই সাপ্লাই চেইনের কোথাও না কোথাও মানহীন হচ্ছে, জীবাণুর সংস্পর্শে আসছে। এই ক্ষতি শুধু ব্যক্তিগত পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নয় বরং ভোক্তা-স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তারও প্রশ্ন। বাজারে বিক্রি হওয়া খাবারের বড় অংশেই কখনো অতিরিক্ত রাসায়নিক, কখনো ভুল সংরক্ষণ, কখনো অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন -সব মিলে "নিরাপদ খাদ্য" কেবল রিপোর্টের শব্দে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

মাটি থেকেই শুরু হতে হবে নিরাপত্তা

খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে উৎপাদন পর্যায় থেকেই। এখানেই প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রিসিশন কৃষি - যেখানে মাটির আর্দ্রতা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ সব নির্ধারিত হয় সেন্সরের ডেটায়। বাংলাদেশেও ছোট পরিসরে এর প্রয়োগ শুরু হয়েছে। দেশে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান মাঠের তথ্য নিয়ে, আইওটি সেন্সরের মাধ্যমে সঠিক সার ও সেচের পরিমাণ নির্ধারণ করে কৃষককে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে। এতে শুধু ফলন বাড়ে না, অতিরিক্ত কীটনাশক ও সার কমে-ফলে খাদ্যে রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ কমে আসে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে রাসায়নিক মুক্ত জৈব সার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভার্মি-কম্পোস্ট মাটি ও ফসলের পুষ্টির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কার্যকর। কেঁচো সার ব্যবহারে মাটির পিএইচ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের পরিমাপ বাড়াতে সহায়তা করে। দীর্ঘ মেয়াদে মাটির উর্বরতা ধরে রাখে। ভার্মি-কম্পোস্ট কেবল পরিবেশগত বর্জ্য হ্রাসই করে না, নির্ভরযোগ্য সারও উৎপাদন করে। গবেষণা দেখায় ভার্মি-কম্পোস্ট প্রয়োগ ফসলের ফলন, মাটির সাবস্ট্রাকচার ও মাইক্রোবায়াল ডাইভার্সিটি বাড়ায়; ফলে রাসায়নিক সার-নির্ভরতা কমে, খাদ্যে কেমিক্যাল রেসিডিউ ঝুঁকি কমে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনে শুধু জৈব সারই যথেষ্ট নয়–ফসলে সার, পানি ও কীটনাশকের পরিমাণ নির্ধারণে প্রযুক্তি অপরিহার্য। সোলার-চালিত মাটি-আর্দ্রতা সেন্সর, ড্রিপ-ইরিগেশন অটোমেশন, ড্রোন-ভিত্তিক মনিটরিং ও স্যাটেলাইট-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্স মিলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ ইনপুট প্রয়োগ করা সম্ভব।

দুধ ও প্রাণিজ খাদ্যে প্রযুক্তির প্রয়োজন

বিশাল জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের চাহিদার বিপরীতে নিরাপদ খ্যাদের যোগান নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির বিকল্প নেই। দুগ্ধখাতে প্রযুক্তির ঘাটতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সঠিক প্রসেসিং-এর অভাবে খামারি যেমন ভাল দাম থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদার অনুপাতে জোগানের ঘাটতি দাম বাড়ার কারণ। অটোমেটেড মিল্কিং সিস্টেম বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়–গরু নিজের ইচ্ছায় দুধ দেয়, মেশিন তা সংগ্রহ করে এবং রিয়েল-টাইমে দুধের মান মাপা যায়। এতে শ্রমিক নির্ভরতা কমে, উৎপাদন বাড়ে, আর মান নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। বাংলাদেশে পূর্ণ রোবটিক মিল্কিং এখনো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়; তবে ক্লাস্টারভিত্তিক চিলিং সেন্টার, পাস্তুরাইজেশন এবং মান নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা দ্রুত চালু করা গেলে দুধ নষ্ট হওয়া ও ভেজালের ঝুঁকি অনেকটা কমানো সম্ভব। মিল্ক ভিটার মতো কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই এর কিছু দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, তবে দেশের সর্বত্র গ্রামীণ পর্যায়ে কভারেজ বাড়ানো জরুরি। এন্টিবায়োটিক মুক্ত নিরাপদ মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন থেকে ভোক্তার প্লেট পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি ছাড়া নিরাপদ খাদ্য অসম্পূর্ণ থাকবে। এখানে আইওটি ও ক্লাউড-ভিত্তিক ডেটাবেস গুরুত্বপূর্ণ।

মাঠ থেকে বাজারে আনা সবজির দ্রুত স্ক্রীনিং করার জন্য পোর্টেবল টেস্টার, দুধ ও মাছের জন্য তাপমাত্রা-লগিং সেন্সর, এবং জিপিএস -ট্র্যাকিং মিলিয়ে দিলে কোন ব্যাচে সমস্যা হয়েছে উৎস-নির্ধারণ সহজ হয়। উন্নত দেশে ব্লকচেইন-ভিত্তিক ট্রেসেবিলিটি সিস্টেমের পাইলট দেখা গেছে; যেখানে পণ্যের উৎস, পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও কন্ডিশন এক জায়গায় লিপিবদ্ধ থাকে; বাংলাদেশে এই ধারণা পণ্যে (উদাহরণ: মাছ, দুধ, মাংস) প্রয়োগ করলে ভোক্তা আস্থা বাড়বে। তবে বাস্তবতায় প্রধান বাধা হচ্ছে কোল্ড-চেইন অবকাঠামো ও লজিস্টিকস।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য এখন আর কেবল একটি মন্ত্রণালয়ের বিষয় নয়। এটি এক পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন ও শাসন কাঠামোর প্রশ্ন। উৎপাদন থেকে ভোক্তার থালা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তথ্য, প্রযুক্তি ও দায়িত্বের শৃঙ্খল যুক্ত না হলে "নিরাপদ খাদ্য" কেবল বক্তৃতাতেই থেকে যাবে। এ কারণেই প্রাইভেট সেক্টর, দাতা সংস্থা, এনজিও ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ভূমিকা এখন কেন্দ্রীয় হয়ে উঠেছে। কারণ তারা মাঠে পৌঁছতে পারে, ছোট উৎপাদকদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, আর সেই সঙ্গে তথ্য-চালিত নীতিনির্ধারণের ভিত্তি গড়ে দেয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) এই বাস্তবতাকে নতুনভাবে দেখিয়েছে।

খাদ্য বিতরণে নিরাপত্তা:

উৎপাদন ও সংরক্ষণ যতই উন্নত হোক, সঠিক বিতরণ ছাড়া খাদ্যের মান অক্ষুণ্ন থাকে না।

- পরিবহনযান জীবাণুমুক্ত ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।
- বাজারে কার্যকর ল্যাবরেটরি টেস্টিং নিশ্চিত করা জরুরি।
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- অনলাইন ফুড ডেলিভারিতেও নিয়মিত মান নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

এই প্রকল্প খাদ্য নিরাপত্তার চেইনে প্রযুক্তি, ডেটা ও মান নিয়ন্ত্রণের এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করতে প্রান্তিক খামারীদের প্রণোদনা প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ডাটা ম্যানেজমেন্ট, প্রশিক্ষণ, ও মাঠ-মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষক শিখেছে কীভাবে উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের প্রতিটি ধাপে মান বজায় রাখতে হয়। এই ধরণের প্রকল্প দেখাচ্ছে, এনজিও বা উন্নয়ন সংস্থা এখন প্রযুক্তি হস্তান্তর, ডেটা সংগ্রহ, মানপরীক্ষা ও বাজার সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইলে এখন সময় এসেছে সরকারি সংস্থা, এনজিও ও প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে এক ছাতার নিচে আনার। খাদ্যের মান আর কেবল কৃষি বা শিল্পের নয়, এটি জনস্বাস্থ্যের, অর্থনীতির ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশ্ন। নিরাপদ খাদ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন হতে হবে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ, "খাদ্য নিরাপত্তা" এখন শুধু খাবারের নয়, নাগরিক অধিকারের প্রতীক। বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তৈরি হলেও মাঠে কার্যকর বাস্তবায়ন ও পরীক্ষার কাঠামো এখনও সীমিত। খাদ্য নিরাপত্তার দায়িক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ভেঙে গিয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে ল্যাব ও মনিটরিং সক্ষমতা বাড়ানো, স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত রেসপন্স ইউনিট তৈরি করা ও প্রাইভেট-পাবলিক-অ্যাকশন-প্ল্যান দরকার। একই সঙ্গে ভোক্তা-সচেতনাও বাড়াতে হবে। স্থানীয় বাজারে পণ্যের উৎস ও মান সক্রিয়ভাবে চাওয়া গেলে উৎপাদকরাও মান মেনে চলবে।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকে কেবল একটি প্রযুক্তি খাতে সীমাবদ্ধ করে দেখা যাবে না; এটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক জাতীয় প্রকল্প হিসেবে নিতে হবে যেখানে কৃষক (বিশেষত নারী ও যুব), উদ্যোক্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান একসাথে কাজ করবে। তবে এর জন্য দরকার রাজনৈতিক নিয়মিত অঙ্গীকার, অর্থায়ন ও মাঠ পর্যায়ের দক্ষতার বিনিয়োগ–নাহলে প্রযুক্তি অবস্থায়ই থেকে যাবে, ফল ভোক্তার থালায় পৌঁছাবে না। প্রযুক্তি আছে, উদ্যমও আছে–এখন প্রয়োজন সমন্বয়ের। কারণ, নিরাপদ খাদ্যের ভবিষ্যৎ কেবল মাটিতে নয়, মানুষের হাত, ডেটা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণে টেকসই পদক্ষেপ

আহাম্মদ আলী সোহান, ভেটেরিনারি মেডিসিন এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাস

ভূমিকা

মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক শর্ত হলো খাদ্য। কিন্তু কেবল খাদ্যের প্রাচুর্যই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন এর গুণগত মান,নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ। ভেজাল, অপর্যাপ্ত সংরক্ষণব্যবস্থা, পরিবহনে ত্রুটি ও বিতরণ প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা-এসব কারণেই খাদ্যের মান নষ্ট হয়। এর ফলশ্রুতিতে একদিকে জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা।

সুতরাং, নিরাপদ খাদ্য এখন আর কেবল স্বাস্থ্যগত চাহিদা নয়; বরং এটি জাতীয় ও বৈশ্বিক অগ্রাধিকার। -

"খাদ্যই জীবন, খাদ্যই সভ্যতা;

নিরাপদ খাদ্যই মানবতার ভিত্তি।"

নিরাপদ খাদ্যের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

নিরাপদ খাদ্য হলো এমন খাদ্য যা ব্যাকটেরিয়া,ভাইরাস, বিষাক্ত রাসায়নিক বা ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত। এর প্রয়োজনীয়তা চারটি মূল কারণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

- স্বাস্থ্য সুরক্ষা: খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ।
- অর্থনৈতিক সুবিধা: কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সৃষ্টি ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস।
- টেকসই উন্নয়ন: সুস্থ, উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলা।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখা।

খাদ্য উৎপাদনে নিরাপত্তা

উৎপাদনপর্যায়েই খাদ্যের মান ও নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

- কৃষিজ ফসল: অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহারে ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই জৈব সার ও সমন্বিত কীটপতঙ্গ দমন পদ্ধতি (IPM) অপরিহার্য।
- সবজি ও ফলমূল: প্রাকৃতিক বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার ও দ্রুত সংগ্রহ-পরবর্তী সংরক্ষণ জরুরি।
- দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য: পশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা,টিকা ও স্বাস্থ্যসম্মত দুধ দোহন অপরিহার্য।
- মাছ ও মাংস: পরিষ্কার পানির ব্যবহার, অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কোল্ড স্টোরেজ নিশ্চিত করা দরকার।

খাদ্য সংরক্ষণে নিরাপত্তা

সঠিক সংরক্ষণ না হলে খাদ্য দ্রুত নষ্ট হয় এবং বিষক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। নিচে খাদ্যের ধরনভিত্তিক সংরক্ষণ পদ্ধতি দেখানো হলো–

খাদ্যের ধরন	সংরক্ষণ পদ্ধতি	নিরাপত্তা বিবেচনা
শস্য	সিলো বা বদ্ধ গুদাম	আর্দ্রতা ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ
দুধ ও মাংস	কোল্ড স্টোরেজ	ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিরোধ
ফলমূল	ইথাইলিন নিয়ন্ত্রিত কক্ষ	কৃত্রিম রাসায়নিক ব্যবহার রোধ
মাছ	বরফ/হিমায়িতকরণ	জীবাণু বৃদ্ধি রোধ

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ভূমিকা

আধুনিক প্রযুক্তি খাদ্য নিরাপত্তাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে।

- ফুড ট্র্যাকিং সিস্টেম: উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত খাদ্যের উৎস নিরীক্ষণ সম্ভব।
- বায়োটেকনোলজি: রোগ প্রতিরোধী ও উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন সহজ করছে।
- স্মার্ট কোল্ড স্টোরেজ: স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্যের গুণমান বজায় রাখে।
- ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস: কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ভোক্তার কাছে খাদ্য পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি করছে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই খাদ্য নিরাপত্তায় নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (BFSA): খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজালবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- বাজার তদারকি: নিয়মিত অভিযান ও জরিমানার মাধ্যমে শৃঙ্খলা আনার প্রচেষ্টা চলছে।
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ: কৃষক ও উদ্যোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের তথ্য সরবরাহে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রভাব ভয়াবহ -

- শিশুদের অপুষ্টি ও শারীরিক বিকাশে বাধা।
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ও কিডনি রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি।
- কর্মক্ষমতা হ্রাস ও জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব।

অন্যদিকে, নিরাপদ খাদ্য সুস্থ জনগোষ্ঠী, চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা এখন অগ্রাধিকারের বিষয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-২: ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব) সরাসরি খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। উন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যেই কঠোর মান নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে; বাংলাদেশকেও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। -

"যে জাতি খাদ্যে নিরাপত্তা আনে, সে জাতি ভবিষ্যৎ জয় করে নেয়।"

টেকসই প্রযুক্তি

- হাইড্রোপনিক্স (hydroponics) ও আকোয়াপনিক্স (aquaponics) পদ্ধতি শহরে তাজা সবজি উৎপাদনকে সহজ করেছে।
- কোল্ড স্টোরেজ ও ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং সংরক্ষণ সময় বৃদ্ধি করেছে।
- কৃষকের বাজার সরাসরি সংযোগ (E-Commerce) অপচয় কমায়।

প্রস্তাবনা

- কৃষি থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করা।
- কোল্ড চেইন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা।
- বাজারে নিয়মিত গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সক্রিয় করা।
- ভেজালবিরোধী অভিযানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।
- স্কুল-কলেজ পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।
- কৃষক ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা বৃদ্ধি।
- গবেষণা ও উদ্ভাবনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করা।

উপসংহার

খাদ্য নিরাপত্তা কোনো বিলাসিতা নয়; এটি একটি মৌলিক অধিকার ও জাতীয় টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হলে জন্ম নেবে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাই এখনই সময় - সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা।

"খাদ্য নিরাপদ, জীবন সমৃদ্ধ-এই হোক আগামী বাংলাদেশের অঙ্গীকার।"

রেফারেন্স

১। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA)। (২০২৪)। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন। ঢাকা: বিএফএসএ।
২। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)। (২০২৩)। বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির অবস্থা। রোম: FAO।
৩। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। (২০২২)। খাদ্য নিরাপত্তা: মূল তথ্য। জেনেভা: WHO।
৪। আহমেদ, তৌফিক; হোসেন, মাসুদ; হাসান, মাহমুদ। (২০২১)। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল এবং এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব। খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য জার্নাল, ১১(২), ৪৫৫৬।
৫। ইউনিসেফ বাংলাদেশ। (২০২৩)। বাংলাদেশে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা। ঢাকা: ইউনিসেফ।

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA

atomes

BIOXY ENVIRO®

UNIQUE - PATENTED

BACTERICIDAL, VIRUCIDAL, SPORICIDAL, FUNGICIDAL

BIOXY ENVIRO can be applied using a regular Spray Gun, a ULV Fogger or a Dry Fog Atomizer

HATCHERY
10 ml/1 Ltr.

EGGS
2 ml/1 Ltr.

HATCHED
2 ml/1 Ltr.

TRANSPORTATION
10 ml/1 Ltr.

FARM
10 ml/1 Ltr.

ON-BIRDS
5 ml/1 Ltr.

DRINKING WATER
(Water Sanitizer)
15-100 ml/1000 Ltr.
Becterial Challanges
Mild : 1 ml / 1 Ltr.
Heavy : 2 ml / 1 Ltr.

CARCASS
2.5 ml/1 Ltr.

- -- WITHDRAWAL PERIOD : ZERO DAYS (EGG, MEAT,WATER)
- -- FOOD GRADE ODORLESS DISINFECTANT AND COLD STERILANT, DECONTAMINANT
- -- FOOD CONTACT NO-RINSE
- -- CHLORINE-FREE
- -- HIGH EFFICIENCY AT LOW DOSAGE RATES, FAST ACTING, REDUCED KILL TIME
- -- BIODEGRADABLE SAFE
- -- NON-TOXIC AND NON-HARSH
- -- NONCORROSIVE
- -- NON-CARCINOGENIC
- -- SHELF LIFE 4 YEARS

For Further Information Please Contact:
Mob: +880 1990-400810
Mob: +880 1990-400837

INTELLECTUAL PROPERTY
PATENTED
ATOMES F.D. INC.

APPROVED ECO-Seal Organic & Biological
Approved by ECOCERT INPUTS
OCQV
defra Approved
EQSP
ORGANIC BY CANADA ECO-SEAL

Manufactured by:
atomes
ATOMES F.D. INC
3485 Ashby, Ville Saint Laurent
Quebec, HSW 2ND, Canada
www.atomes-animalhealthcare.com

Sole Distributor:
Bio Care Agro Limited
Mysha Chowdhury Tower
Plot: GA-30/B, Level-8, Suite-8C
Progoti Sharani, Shahjadpur,
Gulshan, Dhaka-1212, Bangladesh
www.biocareagro.com

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত: নিরাপদ ও টেকসই খাদ্যব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

মোঃ ওয়ালিদ সাইফুদ্দিন, (শিক্ষার্থী), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৭

ভূমিকা

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG-2: Zero Hunger) অন্যতম লক্ষ্য হলো ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করা এবং সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যেখানে প্রায় ৪৫% জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। কৃষি খাতের অবদান জাতীয় জিডিপির প্রায় ১৩% হলেও খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে ধান, গম, ডাল, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ - সবই মানুষের প্রধান খাদ্য উপাদান। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নানা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ভেজাল, মান নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি, অপুষ্টি, বাজারজাতকরণের অদক্ষতা, সংরক্ষণ সমস্যার কারণে বিপুল পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রযুক্তির অগ্রগতি ও টেকসই পদ্ধতির ব্যবহার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

এই প্রবন্ধে শস্য, সবজি, মাছ, মাংস, ডিম এবং দুধ পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, পুষ্টিগুণ, মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই প্রযুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

শস্য উৎপাদন

বাংলাদেশে ধান প্রধান খাদ্যশস্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৩.৬ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়। ধানের পাশাপাশি গম ও ভুট্টা উৎপাদনও বেড়েছে। ভুট্টা শুধু খাদ্য নয়, পশুখাদ্য ও শিল্প খাতেও ব্যবহৃত হয়। তবে উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা ও বন্যা বড় চ্যালেঞ্জ। শস্য উৎপাদনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তা হলো:

- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।
- সঠিক বীজ এবং সার ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা: অনেক কৃষক এখনও প্রথাগত বীজ ও জৈব সার ব্যবহার করেন।
- পোকামাকড় ও রোগের ঝুঁকি: বৈজ্ঞানিক উপায়ে Integrated Pest Management (IPM) প্রয়োগ কম।

টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োগ:

- হাইব্রিড বীজ ও এগ ফসল: বেশি ফলন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- **ড্রোন ও সেন্সর:** মাঠের শস্যের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ।
- **স্মার্ট ইরিগেশন:** জল সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদাহরণ: সিলেট অঞ্চলে বন্যার পর সেলফ-ড্রেনেজ এবং প্ল্যান্টিং প্যাটার্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে ধানের ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে।

সবজি ও ফল উৎপাদন

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ সবজি উৎপাদক দেশ। বর্তমানে বছরে প্রায় ২ কোটি মেট্রিক টনের বেশি সবজি উৎপাদন হয়। শাকসবজি ভিটামিন, খনিজ ও আঁশের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মৌসুমি সবজির পাশাপাশি গ্রিনহাউস প্রযুক্তি ও হাইড্রোপনিক্স ব্যবস্থায় শহরাঞ্চলেও সবজি উৎপাদন বাড়ছে। উচ্চফলনশীল, রোগ-প্রতিরোধক ও জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক। বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে ফসলের পুষ্টিমান বাড়ানো হচ্ছে (যেমন: ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস)। কৃষি জমিতে বহুমাত্রিক চাষাবাদ (Crop diversification) মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও পুষ্টির জোগান বাড়ায়।

- উৎপাদন পরিসংখ্যান: বছরে প্রায় ২ কোটি মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হয়।
- চ্যালেঞ্জ: সংরক্ষণ ও বিপণনে সীমাবদ্ধতা। উৎপাদনের ২৫৩০% বাজারে পৌঁছানোর আগে নষ্ট হয়।
- পুষ্টিগুণ:
- শাকসবজি: ভিটামিন A, C, আয়রন
- ফল: প্রাকৃতিক শর্করা, আঁশ, ভিটামিন

মাছ ও প্রোটিন উৎপাদন

বাংলাদেশকে "মাছের দেশ" বলা হয়। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এর মধ্যে ৫৬% আসে চাষকৃত মাছ থেকে। ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ, যার উৎপাদন প্রতিবছর বাড়ছে। তবে অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার ও পানিদূষণ মাছের মান কমিয়ে দিচ্ছে।

- **প্রধান মাছ:** ইলিশ, রুই, কাতলা, পাঙ্গাস।
- **চ্যালেঞ্জ:** পানিদূষণ, অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার, মাছের রোগ।
- **পুষ্টিগুণ:** প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন উ

টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োগ:

- **Aquaponics:** মাছ ও সবজি একসাথে উৎপাদন।
- **Biofloc Technology:** মাছের রোগ প্রতিরোধ ও পরিবেশ বান্ধব চাষ।
- **স্বয়ংক্রিয়করন খাবার বিতরণ ও পর্যবেক্ষণ:** উৎপাদন বৃদ্ধি।

মাংস, ডিম ও দুধ

পোল্ট্রি, গবাদিপশু ও দুগ্ধশিল্প দেশের পুষ্টির প্রধান উৎস। আমিষ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টির প্রধান উৎস হলো প্রাণিজ খাদ্য। মাছ চাষে অ্যাকুয়াকালচার প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন বাড়িয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত জাতের গবাদি পশু ও মুরগি পালন, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা এবং পশুখাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

- **ডিম উৎপাদন:** বছরে ২৩ বিলিয়ন ডিম উৎপাদিত হয়।
- **দুধ উৎপাদন:** চাহিদা ১.২০ কোটি মেট্রিক টন, উৎপাদন মাত্র ৯০ লাখ টন।
- **চ্যালেঞ্জ:** নিম্ন মানের খাদ্য, রোগ, ও উৎপাদনে অস্থিতিশীলতা।

টেকসই প্রযুক্তি:

- **পশুপালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন:** স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো, হালকা যন্ত্রপাতি।
- **পাস্তুরাইজেশন ও ফ্রিজিং:** সংরক্ষণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত।

৫. খাদ্যের বিপণন ও সরবরাহ

বিপণন: মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানো এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে উন্নত বাজারজাতকরণ কৌশল, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সরাসরি বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করা যেতে পারে।

প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা বাংলাদেশে খাদ্য বিপণনের প্রধান মাধ্যম হলো হাট-বাজার। কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বা মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে বাজারজাত করেন।

মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা

বিপণন ব্যবস্থায় একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর কারণে কৃষক ন্যায্যমূল্য পান না। উদাহরণস্বরূপ, কৃষক যে টাকায় টমেটো বিক্রি করেন, শহরের বাজারে সেই টমেটোর দাম দ্বিগুণ হয়।

আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা

- সুপারশপ ও ই-কমার্স: Agora, Shwapno, Daraz-এর মতো প্ল্যাটফর্ম খাদ্য বিপণনে আধুনিকতা এনেছে।
- ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস, কৃষক-বাজার সংযোগ (farmer-to-consumer linkage), কো-অপারেটিভ বিপণন ব্যবস্থা উন্নত করলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কমে।
- কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা: দুধ, মাছ, মাংস ও সবজি পরিবহনে কোল্ড স্টোরেজ ও রেফ্রিজারেটেড ট্রাক ব্যবহারের মাধ্যমেঢ নষ্ট হওয়ার হার কমানো সম্ভব।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ফুড প্রসেসিং প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঁচা খাদ্যকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা (যেমন: পাস্তুরাইজেশন, ক্যানিং)।
- চ্যালেঞ্জ: কৃষক প্রায়শই মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে বিক্রি করেন, যা মূল্যের বৈষম্য সৃষ্টি করে।

- **উন্নত পদ্ধতি:**
- সুপারশপ ও অনলাইন মার্কেটপ্লেস
- কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা
- সরাসরি গ্রাহক সংযোগ
- উল্লম্ব চাষাবাদ (Vertical Farming)

খাদ্যের পুষ্টিগুণ

- **শস্য:** কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস, শক্তি যোগায়।
- **সবজি ও ফল:** ভিটামিন A, C, K, খনিজ ও ফাইবার সরবরাহ করে।
- **মাছ:** উচ্চমানের প্রোটিন ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের উৎস।
- **মাংস:** প্রোটিন, আয়রন ও ভিটামিন ই১২ সমৃদ্ধ।
- **ডিম:** সাশ্রয়ী প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজের উৎস।
- **দুধ:** ক্যালসিয়াম, ভিটামিন D ও প্রোটিন সরবরাহ করে।

বাংলাদেশে অপুষ্টি এখনো বড় সমস্যা। UNICEF অনুযায়ী, ৫ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩১% খর্বকায়, যা খাদ্যের মান ও প্রাপ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

খাদ্যাভ্যাস

মানবস্বাস্থ্যের ওপর খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব গভীর।

- সুষম, স্বাস্থ্যকর, পরিমাণমতো ও স্থানীয় উপাদাননির্ভর খাদ্যাভ্যাস টেকসই।
- অতিরিক্ত তেল, চিনি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পরিহার করা উচিত।
- ঋতুভিত্তিক ফল ও সবজি গ্রহণ পুষ্টিকর ও পরিবেশবান্ধব।

খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য বড় সমস্যা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাজারে প্রায় ৪০% খাদ্যপণ্যে ভেজাল পাওয়া যায়।

- **প্রধান ভেজাল উপাদান:** ফরমালিন (মাছ-ফল সংরক্ষণে), ক্যালসিয়াম কার্বাইড (ফল পাকাতে), কৃত্রিম রঙ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক।
- **নিয়ন্ত্রক সংস্থা:** BSTI, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (BFSA), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
- প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ: নিয়মিত পরিদর্শন, ল্যাব টেস্টিং, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর শাস্তি।
- ISO, BSTI ও HACCP মান অনুসারে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জরুরি।
- Food safety laboratories-এ রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল দূষণ ও ভেজাল পরীক্ষা করা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণ

বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ২৫৩০% সংরক্ষণ সমস্যার কারণে নষ্ট হয়।

- শস্য: বায়ুরোধী সাইলো (Silo) ও এয়ারটাইট স্টোরেজ (Airtight storage) ব্যবহারে ক্ষতি কমানো যায়।
- ফল ও সবজি: আধুনিক কোল্ড স্টোরেজের অভাবে প্রায় ৩০% নষ্ট হয়।
- দুধ, মাছ, মাংস: ফ্রিজিং, ক্যানিং ও পাস্তুরাইজেশন প্রযুক্তি ব্যবহারে সংরক্ষণ সম্ভব।
- প্রক্রিয়াজাতকরণ: শুকানো, ক্যানিং, ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং খাদ্যের আয়ু বাড়ায়।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

- খাদ্য নিরাপত্তা শুধু পরিমাণ নয়, পুষ্টিগুণেও গুরুত্বপূর্ণ।
- খাদ্য নির্বাচনে সকল পুষ্টি উপাদানের (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও মিনারেল) ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন।
- বিশেষ করে, পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে খাদ্য ফর্টিফিকেশন (যেমন: আয়োডিনযুক্ত লবণ, ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল) একটি কার্যকর কৌশল।
- অপুষ্টির মাত্রা: ৫ বছরের নিচের শিশুদের ৩১% খর্বকায়।
- টেকসই খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করলে অপুষ্টি কমানো সম্ভব।

খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই প্রযুক্তি

খাদ্য নিরাপত্তা

- **আইন ও নীতি:** নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন।
- **প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ:** জনবল ও ল্যাবরেটরি সুবিধার অভাব।
- **ভোক্তা সচেতনতা:** স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বাছাইয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি জরুরি।

টেকসই প্রযুক্তি

- **জৈব কৃষি:** রাসায়নিক সার ও কীটনাশকমুক্ত চাষ।
- **হাইড্রোপনিক্স ও আকোয়াপনিক্স:** শহরে জমি ছাড়াই খাদ্য উৎপাদন।
- **ডিজিটাল এগ্রিকালচার:** স্যাটেলাইট ডেটা, ড্রোন ও সেন্সর ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল।
- Precision agriculture, drone mapping, IoT-based smart farming কৃষিতে দক্ষতা বাড়ায়।
- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ: পাস্তুরাইজেশন, ক্যানিং, হিমায়ন।
- অপচয় রোধ: FAO এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ১/৩ অংশ অপচয় হয়। বাংলাদেশেও অপচয় রোধে নীতি গ্রহণ প্রয়োজন।

৮. টেকসই প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

- জৈব কৃষি ও কমপোস্ট: জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, রাসায়নিক দূষণ কমায়।
- Renewable energy-based cold storage কার্বন নিঃসরণ কমায়।
- ডিজিটাল কৃষি: ড্রোন, সেন্সর, স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং উৎপাদন ও রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- Circular food economy ধারণায় খাদ্য অপচয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদে রূপ নেয়।
- **প্রক্রিয়াজাতকরণ:** শুকানো, প্যাকেজিং, ক্যানিং, পাস্তুরাইজেশন খাদ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।
- Bio-preservatives খাদ্য সংরক্ষণে প্রাকৃতিক বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের খাদ্য খাত

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০% কৃষি খাতে নিয়োজিত এবং খাদ্য উৎপাদনে তাদের অবদান অপরিসীম। বৈশ্বিক খাদ্য বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের কৃষি ও খাদ্যশিল্পকে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে। FAO-এর তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদনের ১২% নষ্ট হয় সংরক্ষণ ও পরিবহন সমস্যার কারণে। বাংলাদেশও এই সমস্যার বাইরে নয়। ফলে খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনের পাশাপাশি এর সঠিক সংরক্ষণ, বিপণন এবং মান নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শস্য উৎপাদন ও টেকসই চাষাবাদ

বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় এবং সবজি উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির উর্বরতা হ্রাস ও সেচনির্ভর চাষের কারণে উৎপাদন ঝুঁকির মুখে। টেকসই শস্য উৎপাদনের জন্য জৈব সার, কম খরচের ড্রিপ ইরিগেশন, উন্নত জাতের ধান ও গম চাষ এবং ফসল আবর্তন পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ফসল আবর্তনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ২৫% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। একই সঙ্গে কৃষকের উৎপাদন খরচও কমে আসে।

সবজি ও ফলমূল খাতের সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে প্রায় ২০০ প্রকারের সবজি ও ৭০ প্রকার ফলমূল উৎপাদিত হয়। তবে বাজারজাতকরণে সমস্যা, সংরক্ষণের অভাব এবং রাসয়নিকের অপব্যবহারের কারণে মান বজায় থাকে না। বর্তমানে কোল্ড চেইন প্রযুক্তি ও ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে, যা রপ্তানির জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলারের সবজি রপ্তানি হয়েছে। যদি কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব ও আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে এই রপ্তানি বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব।

মৎস্য খাত: নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের মৎস্য খাত এউচ-এর প্রায় ৩.৫% অবদান রাখে। এ খাত থেকে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১.৮ কোটি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে মাছ চাষে বায়োফ্লক, রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (RAS) এবং জেনেটিকালি ইমপ্রুভড মাছের জাত ব্যবহার হচ্ছে। তবে বাজারজাতকরণে বরফের মান, সংরক্ষণের অভাব, এবং রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে অনেক সময় রপ্তানিযোগ্য মাছ বাতিল হয়। আন্তর্জাতিক মান পূরণে HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) পদ্ধতির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

মাংস উৎপাদন ও নিরাপত্তা

বাংলাদেশে গরু, ছাগল, মুরগি ও হাঁসের মাংস প্রধানত ব্যবহৃত হয়। দেশে প্রতি বছর প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন টন মাংস উৎপাদিত হয়, যা আত্মনির্ভরতার কাছাকাছি। তবে মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজালের সমস্যা বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় পশু জবাই হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, যেখানে পশুচিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ থাকে না। এজন্য হালাল সনদ, মাংস প্রক্রিয়াজাত শিল্প, স্লটার হাউস উন্নয়ন এবং ভেটেরিনারি ডাক্তারদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন।

ডিম ও দুধ উৎপাদনে অগ্রগতি

বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে। দুধ উৎপাদনের পরিমাণও প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টন। কিন্তু জাতীয় চাহিদার তুলনায় ঘাটতি এখনও রয়েছে। দুধে ভেজাল ও অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তৈরি করছে। এজন্য ফার্ম পর্যায়ে সঠিক পশু-পরিচর্যা, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব স্থাপন এবং পাস্তুরাইজেশন প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। পাশাপাশি ডিম ও দুধ প্রক্রিয়াজাত শিল্প (চিজ, দই, মিল্ক পাউডার) রপ্তানি সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে।

খাদ্য বিপণন ও বাজার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের একটি বড় অংশ মধ্যস্বত্বভোগীর কারণে ন্যায্য দামে বিক্রি হয় না। কৃষক থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছাতে গড়ে ৩-৫ স্তর অতিক্রম করতে হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও কৃষক-ভোক্তা সরাসরি সংযোগ বাড়ালে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্তমানে কিছু সফল উদ্যোগ যেমন- 'কৃষক বাজার', 'অর্গানিক মার্কেটপ্লেস' বা মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক কৃষিপণ্য বিক্রি কৃষকদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করছে।

খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল সমস্যা

ইঝঞও-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বাজারে ৫০% এর বেশি খাদ্যপণ্য কোনো না কোনোভাবে ভেজালযুক্ত। এতে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তাই খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন, উন্নত ল্যাবরেটরি এবং ভোক্তা সচেতনতা বাড়াতে হবে। HACCP, ISO ২২০০০, GMP (Good Manufacturing Practice) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবয়ন অপরিহার্য। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন ও মানদণ্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করা, নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ কঠোর হাতে দমন করা আবশ্যক।

খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি

বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত শস্যের প্রায় ২০% এবং সবজির প্রায় ৩০% সংরক্ষণে ব্যর্থতার কারণে নষ্ট হয়। এজন্য কোল্ড স্টোরেজ, সিলো, ক্যানিং, ফ্রিজ-ড্রাইং, ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা জরুরি। উন্নত দেশে 'স্মার্ট প্যাকেজিং' প্রযুক্তি চালু হয়েছে, যেখানে প্যাকেট পরিবর্তনের মাধ্যমে বোঝা যায় খাবারটি নষ্ট হয়েছে কি না। বাংলাদেশে ধীরে ধীরে এই প্রযুক্তি চালু করা সম্ভব হলে খাদ্য অপচয় অনেক কমে আসবে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য

খাদ্য নিরাপত্তা বলতে শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া নয়, বরং পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাকে বোঝায়। ভেজাল, রাসায়নিক, অ্যান্টিবায়োটিক অবশিষ্টাংশ, ভারী ধাতুর উপস্থিতি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করছে। দেশে প্রতিদিন প্রায় ৬ লাখ মানুষ ভেজাল খাবারের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় বলে গবেষণায় দেখা গেছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেবল কৃষির উন্নয়ন নয়, বরং জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার

১. জৈব সার ও কম্পোস্ট ব্যবহার।

২. সৌরশক্তি চালিত কোল্ড স্টোরেজ ।

৩. বায়োফ্লক ও জঅঝ প্রযুক্তি।

৪. ড্রোন ও আইওটি (IoT) ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা।

৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা অ্যানালিটিক্স দ্বারা উৎপাদন ও বাজার পূর্বাভাস।

এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়বে, অপচয় কমবে এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

- কৃষকের ন্যায্য দাম নিশ্চিত না হওয়া ।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- ভেজাল ও মান নিয়ন্ত্রণ সমস্যা ।
- গবেষণা ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার ।
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা ।
- এগুলো মোকাবেলায় সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগ জরুরি।
- জৈব কৃষি, হাইড্রোপনিক্স, আকোয়াপনিক্স প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে।
- ভোক্তাদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে শিক্ষা ও প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। শস্য, সবজি, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে অগ্রগতি হলেও বিপণন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণে ঘাটতি রয়েছে। টেকসই প্রযুক্তি, সঠিক নীতি, গবেষণা ও সচেতনতার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ভোগ - এই সম্পূর্ণ চক্রটিকে টেকসই করতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, নীতিগত সমর্থন এবং জনগণের সচেতনতার সমন্বয় প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে, প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করাই হলো টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

খাদ্য শুধু আজকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়ার শর্ত। তাই খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে থাকে গুণগত মান, নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধবতা। তাহলেই সম্ভব হবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুস্থ বাংলাদেশ গড়া।

References

1. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2023). The State of Food and Agriculture 2023: Sustainable Food Szstems for a Healthy Planet. Rome, Italy. https://www.fao.org
2. WHO (World Health Organization). (2022). Healthy Diet: Key Facts. Geneva, Switzerland. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
3. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2022). Yearbook of Agricultural Statistics 2022. Dhaka: Ministry of Planning, Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh. http://www.bbs.gov.bd
4. Department of Agricultural Extension (DAE), Bangladesh. (2023). National Agricultural Extension Strategy (Revised). Ministry of Agriculture, Dhaka.
5. Department of Livestock Services (DLS), Bangladesh. (2023). Annual Livestock Economy Report 2023. Ministry of Fisheries and Livestock, Dhaka.
6. Fisheries Research Institute (FRI), Bangladesh. (2022). Advances in Aquaculture Technologies in Bangladesh. Ministry of Fisheries and Livestock, Mymensingh.
7. Institute of Nutrition and Food Science (INFS), University of Dhaka. (2021). Bangladesh Food Composition Table (BFCT 2021).
8. World Bank. (2021). Transforming BangladeshÕs Food Szstem for Sustainable Growth. Washington, D.C. https://www.worldbank.org
9. Islam, M. S., & Rahman, M. M. (2020). Food Security and Sustainable Agricultural Development in Bangladesh. Journal of Bangladesh Agricultural University, 18(3), 456–468. https://www.banglajol.info
10. Rahman, M. H., & Karim, M. R. (2021). Food Safety, Quality Control, and Sustainable Technologies in Bangladesh: Challenges and Opportunities. Bangladesh Journal of Food Science and Technology, 23(2), 35–49.

নিরাপদ দুধের অভিযাত্রা ও টেকসই প্রযুক্তি: উৎপাদন থেকে ভোক্তার টেবিল

ডাঃ রায়হান আহম্মেদ প্রান্ত, ডিভিএম, এম.এস ইন ডেইরি সায়েন্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ডেইরি এন্ড পোল্ট্রি সায়েন্স, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬

দুধ মানুষের প্রাচীনতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর খাবারের অন্যতম উৎস। শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত প্রতিটি বয়সের জন্য দুধ একটি সম্পূর্ণ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে রয়েছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস এবং নানা জৈব সক্রিয় উপাদান, যা মানবদেহের বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও দীর্ঘমেয়াদি সুস্বাস্থ্যে অবদান রাখে। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ, এবং জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে এবং তারা প্রধানত কৃষি ও গবাদি-পশুপালনে নিয়োজিত। এই প্রেক্ষাপটে দুধ উৎপাদন ও ভোক্তার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুধ শুধুমাত্র খাদ্য হিসেবেই নয়, বরং এটি দেশের অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ কৃষক ও খামারি দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাই দুধের নিরাপদ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি ভোক্তা, খামারি ও ব্যবসায়ীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। দুধের পুষ্টিগুণ বজায় রেখে, নিরাপদ খাদ্য পরিবেশন এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের এক অন্যতম দুধ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে।

ছবি-০১: দুধ উৎপাদন থেকে ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত

দুধের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা

দুধকে বলা হয় "সম্পূর্ণ খাদ্য", কারণ এতে প্রায় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। উচ্চমানের কেসিন ও হোয়ে প্রোটিন থাকে, যা শরীরের কোষ গঠন ও মেরামতে সহায়তা করে। চর্বি যা শক্তির অন্যতম উৎস, পাশাপাশি ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন (এ, ডি, ই, কে) সরবরাহ করে। কার্বোহাইড্রেট, প্রধানত ল্যাকটোজ আকারে থাকে, যা শক্তি প্রদান করে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস যা হাড় ও দাঁত মজবুত করে। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স যেটি স্নায়ুতন্ত্র ও বিপাকক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। বিশেষত শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা এবং বয়স্কদের জন্য দুধ অপরিহার্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ড অনুযায়ী, একজন মানুষের দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধ পান করা দরকার।

ছবি-০২: দুধের উপকারিতা

দুধ উৎপাদন ও বিপণনের বাস্তবতা

বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। গরুর দুধ সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়। দেশি গরুর পাশাপাশি ক্রসব্রিড জাত দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে, কারণ এরা অধিক দুধ দেয়। মহিষের দুধ বেশি ঘন, চর্বি ও শক্তিতে সমৃদ্ধ তাই এটি ঘি ও পনির তৈরিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ছাগলের দুধ সহজপাচ্য এবং শিশু বা দুর্বল পাচনতন্ত্রের জন্য উপকারী। উৎপাদনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো উন্নত জাতের সংকট, পর্যাপ্ত প্রাণী খাদ্যের অভাব, রোগব্যাধি ও খামার ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা। তবে সরকার ও বেসরকারি খাত মিলিতভাবে হাইব্রিড গরু, উন্নত খাদ্য সরবরাহ ও প্রাণী চিকিৎসা সেবার প্রসারে কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে দুধ উৎপাদন হতো প্রায় ৫০ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন। পরের তিন অর্থবছরে তা বেড়ে ৭২ লাখ মেট্রিক টনের বেশি হয়। তবে ২০১৬১৭ অর্থবছরে উৎপাদন এক লাফে ২০ লাখ মেট্রিক টন বেড়ে হয় ৯২ লাখ মেট্রিক টন। সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৪ হাজার মেট্রিক টন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবে, দেশে দিনে মাথাপিছু দুধ উৎপাদিত হয় ২০৮ মিলিলিটার। আইএফসিএন অনুসারে, বাংলাদেশ দুধ উৎপাদন ও দুগ্ধ শিল্পে ৯১ শতাংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। গত ১০ বছরে দুধ উৎপাদন ১৮ শতাংশ বেড়েছে ও দুধের ব্যবহার ১৩ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৩ সালের হিসাবে বাংলাদেশ শীর্ষ ২০টি দুধ উৎপাদক দেশের একটি। বাংলাদেশের বাজারে দুধ বিক্রির দুইটি প্রধান ধারা রয়েছে- অসংগঠিত খাত, যেখানে গ্রামীণ খামারিরা সরাসরি ভোক্তার কাছে বা স্থানীয় বাজারে কাঁচা দুধ বিক্রি করেন। এখানে মান নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি থাকে এবং ভেজাল মেশানোর ঝুঁকি থাকে। অপরটি হলো সংগঠিত খাত, যেখানে দুগ্ধ সমবায়, দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী কোম্পানি ও ব্র্যান্ড (যেমন- মিল্কভিটা, প্রাণ, আরং) দুধ সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করে নিরাপদ দুধ ও দুধজাত পণ্য বাজারজাত করে। ভবিষ্যতে কোল্ড চেইন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল সংগ্রহ কেন্দ্র ও মোবাইল অ্যাপভিত্তিক বিপণন পদ্ধতি দুধ বাজারজাতকরণকে আরও উন্নত করবে।

ছবি-০৩: বাংলাদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের বাস্তব চিত্র

দুধের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

দুধের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের শ্রেণিভিত্তিক মান নির্ধারণ, মান যাচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিতে পারবে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড। কাঁচা দুধে ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিবায়োটিক অবশিষ্টাংশ, ভারী ধাতু বা ভেজাল থাকার ঝুঁকি বেশি। তাই মান নিয়ন্ত্রণে কিছু ধাপ গুরুত্বপূর্ণ: সংগ্রহের সময় পরিষ্কার পাত্র ও স্বাস্থ্যসম্মত দোহন পদ্ধতি; শারীরিক পরীক্ষা (রঙ, গন্ধ, ঘনত্ব, অম্লতা); রাসায়নিক পরীক্ষা (চর্বি, প্রোটিন, ল্যাকটোজ, সলিডস-নট-ফ্যাট); মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা (টোটাল প্লেট কাউন্ট, কোলিফর্ম, ই-কোলাই, সালমোনেলা ইত্যাদি শনাক্তকরণ); পাস্তুরাইজেশন ও ইউএইচটি প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। ভবিষ্যতে কুইক টেস্ট কিট, স্মার্ট সেন্সর প্রযুক্তি ও ব্লকচেইন-ভিত্তিক ট্রেসেবিলিটি মান নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর করবে।

ছবি-০৪: সংগ্রহের সময় পরিষ্কার পাত্র ও স্বাস্থ্যসম্মত দোহন পদ্ধতি

ছবি-০৫: মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা

ছবি-০৬: পাস্তুরাইজেশন ও ইউএইচটি প্রক্রিয়া

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা

দুধ একটি অত্যন্ত নাশযোগ্য পণ্য। তাই সঠিক সংরক্ষণ ছাড়া এর গুণগত মান দ্রুত নষ্ট হয়। কাঁচা দুধ দোহনের পর ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা জরুরি; পাস্তুরাইজড দুধ সাধারণত ৭১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণযোগ্য; ইউএইচটি দুধ প্যাকেট খোলা না হলে ৪৬ মাস পর্যন্ত রুম টেম্পারেচারে ভালো থাকে; দুধজাত পণ্য দই, ঘি, পনির ইত্যাদির সংরক্ষণ পদ্ধতি পণ্যের ধরণ অনুসারে ভিন্ন। কোল্ড চেইন ও রেফ্রিজারেটেড ভ্যান, মোবাইল কুলিং ইউনিট এবং ন্যানোটেকনোলজিভিত্তিক প্যাকেজিং দুধ সংরক্ষণের টেকসই সমাধান হতে পারে।

খাদ্যাভ্যাসে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য

বাংলাদেশে দুধের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম, তবে এর বহুমুখী প্রয়োগ রয়েছে। সকালের নাশতায় সরাসরি দুধ পান; চা, কফি ও নানা ধরনের মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহার; শিশুদের জন্য ফর্মুলা মিল্ক বা প্রক্রিয়াজাত দুধ; ক্রীড়াবিদ ও স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের জন্য লো-ফ্যাট বা স্কিমড মিল্ক; গ্রামীণ খাদ্যসংস্কৃতিতে দই, ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। দুধ নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, স্থূলতা প্রতিরোধ এবং শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করে।

ছবি-০৭: খাদ্যাভ্যাসে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য

দুধ ও টেকসই প্রযুক্তি

দুধ উৎপাদন খাতটি অর্থনৈতিকভাবে অনেক মানুষের জীবিকা নির্বাহের উৎস, বিশেষ করে কৃষক ও খামারিদের জন্য। তবে এই খাতটি টেকসই করার জন্য আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। টেকসই প্রযুক্তি এমন একটি পদ্ধতি, যা দুধ উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, এবং পরিবহণের প্রতিটি ধাপে প্রয়োগ করে পরিবেশগত ক্ষতি কমিয়ে আনে এবং সম্পদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার নিশ্চিত করে। ভবিষ্যতে দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য যেমন গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে খামার চালানো; সোলার কোল্ড স্টোরেজের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দুধ সংরক্ষণ; প্রোবায়োটিক দুধজাত পণ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত দই, ফারমেন্টেড মিল্ক; ল্যাকটোজ-ফ্রি দুধ শুধু ল্যাকটোজ অসহিষ্ণু ভোক্তাদের জন্য; ন্যানোফিল্টারেশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া অপসারণ ও পুষ্টি ধরে রাখা; স্মার্ট প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে তাপমাত্রা ও গুণগত মান নির্দেশক সেন্সর-লেবেলযুক্ত প্যাক এবং ফিড ইনোভেশনের মাধ্যমে গবাদিপশুর জন্য স্থানীয় খাদ্য উপকরণ থেকে সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ফিড তৈরি, যা দুধের গুণমান ও উৎপাদন বাড়ায়। পাশাপাশি, স্মার্ট খামার প্রযুক্তি ও আইওটি সেন্সরের মাধ্যমে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়, যা উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এই সব প্রযুক্তির মাধ্যমে দুধ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করে তোলা সম্ভব, যা শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে। সুতরাং, দুধ ও টেকসই প্রযুক্তি নিয়ে একসাথে কাজ করলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

দুধ শিল্পের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

দুধ শিল্পের সামনে বর্তমানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো উৎপাদন খরচের উচ্চতা এবং বাজার মূল্যের অস্থিতিশীলতা, যা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করে। এছাড়া, দুধ ও দুধজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি থাকা এবং ভেজালের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে উদ্বেগ তৈরি করে। আরও একটি বড় সমস্যা হলো খাদ্যশস্যের ঘাটতির কারণে গবাদিপশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, যা দুধ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়া প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও আধুনিকীকরণে সীমাবদ্ধতা থাকায় দুধ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে এই চ্যালেঞ্জের মধ্যেও দুধ শিল্পে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে ও বিদেশে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে, যার ফলে দুধের বিক্রিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রকল্প নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করছে, যা দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে গুণগত মান উন্নত করবে। পাশাপাশি, দুধ শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে এবং নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুধ কেবল একটি খাদ্য নয়, বরং অর্থনীতি, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। সঠিক উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ সংরক্ষণ ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে দুধ হতে পারে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নিরাপদ খাদ্য সম্পদ। তাই নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে ভোক্তাদের খাদ্যাভ্যাসেও দুধের নিয়মিত অন্তর্ভুক্তি জরুরি। একই সঙ্গে, সরকার ও নীতি নির্ধারকদের সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দরকার, যাতে দুধ উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগে দুধ শিল্প শুধু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সুতরাং, দুধকে শুধুমাত্র খাদ্য হিসেবেই নয়, বরং জাতির স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের এক মূল স্তম্ভ হিসেবে দেখতে হবে এবং তার প্রতি যত্নশীল মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। ভোক্তাদের খাদ্যাভ্যাসে দুধের নিয়মিত অন্তর্ভুক্তি এবং নীতি নির্ধারকদের সঠিক পরিকল্পনা একত্রে কাজ করলে "নিরাপদ খাদ্য, সুস্থ জাতি" স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য ডিমের গুরুত্ব

ডা. মো: আরাফাত জামান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর-৫২০০

ভূমিকা

মানুষের জীবনে প্রজনন একটি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রক্রিয়া। সুস্থ প্রজনন ক্ষমতা শুধু ব্যক্তিগত সুখ ও পারিবারিক স্থিতির জন্য নয়, একটি জাতির টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রজনন স্বাস্থ্যের অর্থ কেবল সন্তান ধারণ নয়; বরং এটি এমন এক অবস্থা, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই তাদের প্রজনন অঙ্গ, হরমোন ও সামগ্রিক শারীরিক সক্ষমতার মাধ্যমে সুস্থ ও কার্যকর জীবনযাপন করতে পারেন।

এই সুস্থ প্রজনন ক্ষমতা বজায় রাখতে খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা অপরিসীম। সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে শরীর প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন উৎপাদন, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণমান রক্ষা এবং গর্ভধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রেক্ষিতে ডিম একটি অসাধারণ খাদ্য উপাদান হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিমকে "প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ খাদ্য" বলা হয়, কারণ এতে প্রায় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান উপস্থিত থাকে যা মানব শরীরের সুস্থ বিকাশ ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ডিমের পুষ্টিগুণ

ডিম একটি সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। একটি মাঝারি আকারের ডিমে গড়ে ৬৭ গ্রাম প্রোটিন, ৫ গ্রাম স্বাস্থ্যকর চর্বি, এবং বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদানসমূহ হলো –

- প্রোটিন: শরীরের টিস্যু ও কোষ গঠনের মূল উপাদান।
- ভিটামিন A, D, E, I K: প্রজনন হরমোন ও ইমিউন সিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখে।
- ভিটামিন ই১২ ও ফোলেট (Folate): উঘঅ গঠনে সহায়তা করে এবং নতুন কোষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
- কোলিন (Choline): মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে অপরিহার্য।
- জিঙ্ক (Zinc) ও সেলেনিয়াম (Selenium): শুক্রাণুর গুণমান বৃদ্ধি করে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়।
- ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড: প্রজনন হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করে ও কোষ ঝিল্লির স্থিতি বজায় রাখে।

এই সব উপাদান একত্রে প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি, গর্ভধারণে সহায়তা ও সন্তান জন্মের পর শিশুর সুস্থ বিকাশে ভূমিকা রাখে।

নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যে ডিমের ভূমিকা

নারীর শরীরে প্রজনন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম। মাসিক চক্র, ডিম্বস্ফোটন, গর্ভধারণ ও ভ্রূণের বিকাশ–সবকিছুই হরমোন ও পুষ্টির ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। ডিমে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলো এই প্রক্রিয়াগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

১. হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা:

ডিমে থাকা ভিটামিন D ও কোলিন নারীর হরমোন নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন D-এর অভাবে প্রায়ই পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (PCOS) দেখা দেয়, যা অনিয়মিত মাসিক ও বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ। নিয়মিত ডিম খাওয়ার মাধ্যমে এই ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

২. ডিম্বাণুর গুণমান বৃদ্ধি:

ডিমে থাকা প্রোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান (যেমন লুটেইন ও জিয়াজ্যান্থিন) ডিম্বাণুর গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এতে ডিম্বাণু সহজে নিষিক্ত হতে পারে, ফলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা বাড়ে।

৩. গর্ভধারণ ও ভ্রূণের বিকাশ:

গর্ভধারণের সময় ফোলেট ও কোলিনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি থাকে। এই দুটি উপাদান ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করে। ডিমে প্রাকৃতিকভাবে এই উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকায় গর্ভবতী নারীদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী খাদ্য।

৪. রক্তাল্পতা প্রতিরোধ:

ডিমে থাকা আয়রন (iron) ও ভিটামিন ই১২ রক্তে হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করে, যা গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্যে ডিমের ভূমিকা

পুরুষদের প্রজনন স্বাস্থ্য প্রধানত শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও গুণগত মানের ওপর নির্ভর করে। ডিম এই তিনটি দিকেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১. শুক্রাণুর গুণগত মান বৃদ্ধি:

ডিমে থাকা জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম শুক্রাণুর উৎপাদন বাড়ায় এবং তাদের গতিশীলতা উন্নত করে। জিঙ্ক টেস্টোস্টেরন হরমোনের উৎপাদনেও ভূমিকা রাখে, যা পুরুষের যৌন ক্ষমতার জন্য অপরিহার্য।

২. অক্সিডেটিভ ক্ষতি প্রতিরোধ:

ডিমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান শুক্রাণুকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। ফলে শুক্রাণুর DNA ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

৩. শরীরের শক্তি ও সহনশক্তি বৃদ্ধি:

প্রোটিনসমৃদ্ধ ডিম পুরুষদের শারীরিক সক্ষমতা ও যৌন শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটি ক্লান্তি দূর করে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে।

গর্ভাবস্থায় ডিমের গুরুত্ব

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের শরীরে প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ডিম এই চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

- এতে থাকা কোলিন ভ্রূণের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র গঠনে সাহায্য করে।
- ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড শিশুর চোখ ও মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রোটিন গর্ভের শিশুর কোষ ও টিস্যু তৈরি করতে সহায়তা করে।
- ডিমে থাকা ভিটামিন উ ও ক্যালসিয়াম মায়ের হাড়কে মজবুত রাখে এবং শিশুর হাড়ের বিকাশে সহায়তা করে।

তবে কাঁচা বা আধসেদ্ধ ডিম খাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে সালমোনেলা জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। সর্বদা সেদ্ধ বা ভালোভাবে রান্না করা ডিম খাওয়াই নিরাপদ।

ডিম খাওয়ার সঠিক পরিমাণ ও সতর্কতা

প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন ১২টি ডিম খাওয়া যথেষ্ট। যাদের উচ্চ কোলেস্টেরল বা হৃদরোগের ঝুঁকি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডিমের পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত। এছাড়া ডিমের কুসুমে কিছুটা চর্বি থাকলেও তা অধিকাংশই "গুড ফ্যাট" বা স্বাস্থ্যকর চর্বি, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়।

অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে ডিমের সমন্বয়

ডিমের পাশাপাশি ফল, শাকসবজি, দুধ, মাছ, বাদাম ও শস্যজাত খাবার খেলে প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান পূর্ণতা পায়।

বিশেষ করে –

- সবুজ শাকসবজি ফোলেটের ভালো উৎস,
- বাদাম ও মাছ ওমেগা-৩ সরবরাহ করে,
- দুধ ও দই ক্যালসিয়াম দেয়।

এই সব খাদ্যের সঙ্গে ডিম অন্তর্ভুক্ত করলে প্রজনন স্বাস্থ্য আরও উন্নত হয়।

উপসংহার

প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা মানে শুধু সন্তান ধারণ নয়; বরং এটি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার সামগ্রিক প্রতিফলন। ডিম একটি পূর্ণাঙ্গ, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী খাদ্য হিসেবে প্রজনন স্বাস্থ্যে বহুমাত্রিক অবদান রাখে। এতে থাকা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট নারী-পুরুষ উভয়ের হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা, প্রজনন কোষের গুণমান বৃদ্ধি এবং গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করে। সুতরাং বলা যায়–

"প্রতিদিন একটি ডিম, প্রজনন স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।"

ডিম শুধু খাদ্য নয়, এটি এক প্রাকৃতিক পুষ্টি-অস্ত্র, যা সুস্থ প্রজন্ম গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

জৈব চাষে নিরাপদ খাদ্য: সুস্থ ভবিষ্যতের অঙ্গীকার

আফসানা জামান, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, আইইউবিএটি- ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা-১২৩০

ভূমিকা

আমাদের প্রাচীন প্রবাদে আছে: 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। কিন্তু সেই অমূল্য সম্পদ রক্ষার প্রধান ভিত্তি যে খাদ্য, তা আজ নিজেই এক গভীর সংকটের মুখে। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের বেপরোয়া ব্যবহারের ফলে খাদ্য আজ আর কেবল পুষ্টির উৎস নয়, বরং নীরব স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ টন কীটনাশক এবং বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়, যার সরাসরি বিষক্রিয়া খাদ্য শৃঙ্খল হয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করছে। এই পরিস্থিতিতে, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং মাটি ও পরিবেশ সুরক্ষার একমাত্র টেকসই পথ হলো জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা। বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রেক্ষাপটে, রাসায়নিকের প্রধান অন্তরায় রূপে জৈব পদ্ধতির উত্থান এক নীরব খাদ্য বিপ্লবের সূচনা করছে।

রাসায়নিকের অভিশাপ ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা

গত শতাব্দীর তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব' অল্প সময়ে ফলন বহুগুণ বাড়ালেও এর দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম-নির্ভর রাসায়নিক সার মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ও গঠন নষ্ট করে দিয়েছে। অন্যদিকে, কৃত্রিম কীটনাশকগুলি কেবল ক্ষতিকারক কীট নয়, উপকারী অণুজীব, বন্ধু পোকা এবং পরাগবাহক মৌমাছিদেরও ধ্বংস করে প্রকৃতির খাদ্য শৃঙ্খলে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। এই বিষাক্ত উপাদানগুলি বৃষ্টির জলের জলের সাথে মিশে নদী-নালা ও ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করছে, যা কেবল পরিবেশকেই নয়, মানবজাতিকেও দুরারোগ্য ব্যাধির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ক্যান্সার, কিডনি রোগ এবং হজমের সমস্যা বৃদ্ধির পেছনে খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা এই রাসায়নিকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জৈব সার: মাটির প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনা

জৈব সার হলো প্রকৃতির এক অমূল্য উপহার। গোবর সার, কম্পোস্ট, সবুজ সার বা কেঁচো সারের মতো এই উপাদানগুলি মাটিকে কেবল পুষ্টিই দেয় না, বরং মাটির পুরো বাস্তুতন্ত্রকেই পুনরুজ্জীবিত করে এবং রাসায়নিক সারের এক শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

জৈব সারের প্রধান উপকারিতাগুলি নিম্নরূপ:

১। **মাটির গঠন ও জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** জৈব পদার্থ মাটির কণাগুলিকে একত্রে যুক্ত করে এটিকে ঝুরঝুরে করে তোলে, যাকে 'মাটির গঠন উন্নত করা' বলে। এর ফলে মাটির ভেতরে বায়ু চলাচল সহজ হয় এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যা উদ্ভিদের শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

২। **উপকারী জীবাণুর সক্রিয়তা ও বাস্তুতন্ত্র:** জৈব সার হলো ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস ও অ্যাকটিনোমাইসিটিস জাতীয় উপকারী জীবাণু এবং কেঁচোর প্রধান খাদ্য। এই জীবাণুগুলি জৈব পদার্থকে পচিয়ে মাটির ভেতরের আবদ্ধ পুষ্টি উপাদানগুলিকে গাছ-গ্রহণযোগ্য রূপে পরিবর্তন করে মাটিকে আরও সক্রিয় ও জীবন্ত করে তোলে।

৩। **দীর্ঘস্থায়ী ও সুষম পুষ্টি সরবরাহ:** রাসায়নিক সারের দ্রুত ও ক্ষণস্থায়ী ফলনের বিপরীতে জৈব সার ধীরে ধীরে পুষ্টি উপাদান ছাড়ে, যা উদ্ভিদকে প্রাকৃতিকভাবে ও সুষমভাবে বড় হতে সাহায্য করে। এটি মাটির উর্বরতা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করে।

৪। **পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু মোকাবিলা:** জৈব সার উদ্ভিদ, প্রাণী ও প্রকৃতির উচ্ছিষ্ট থেকে তৈরি হওয়ায় এতে কোনো বিষাক্ত পদার্থ নেই। এটি কেবল পানি, মাটি ও বায়ু দূষণ থেকেই পরিবেশকে রক্ষা করে না, বরং মাটিতে কার্বন ধরে রেখে (Carbon Sequestration) কার্বন নিঃসরণ কমায়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫। **টেকসই কৃষি ও জৈব পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধি:** জৈব সার মাটির জৈব পদার্থের মাত্রা বহুগুণ বাড়ায়, যা মাটিকে সময়ের সাথে সাথে আরও উর্বর করে তোলে এবং বারবার রাসায়নিক সারের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমায়। এই পদ্ধতিই টেকসই কৃষি সম্ভব করে তোলে।

৬। **নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা:** জৈব সারে উৎপাদিত ফসল রাসায়নিক অবশিষ্টাংশবিহীন এবং বিষমুক্ত হয়। ফলে এই খাদ্য গ্রহণে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং বিষক্রিয়ার ঝুঁকি কমে। এই ফসল পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও মানুষের দেহের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৭। **কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সুযোগ:** জৈব চাষে উৎপাদিত খাদ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সাধারণত বেশি দামে বিক্রি হয়। ফলে কৃষকরা তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পায়, যা জৈব কৃষিকে অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক করে তোলে।

জৈব বনাম রাসায়নিক সার: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নিচে জৈব ও রাসায়নিক সারের মাধ্যমে উৎপন্ন খাদ্য ও কৃষি পদ্ধতির একটি মৌলিক তুলনা তুলে ধরা হলো:

বিষয়	জৈব সার	রাসায়নিক সার
ফসলের মান	পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও নিরাপদ	দেখতে ভালো কিন্তু পুষ্টিহীন
মাটির স্বাস্থ্য	উন্নত ও স্থিতিশীল	ক্ষতিগ্রস্ত ও দূষিত
পরিবেশ প্রভাব	দূষণমুক্ত ও টেকসই পরিবেশ	দূষণ বৃদ্ধি করে
উৎপাদন খরচ	শুরুতে বেশি, পরে লাভজনক	শুরুতে কম, পরে ক্ষতিকর প্রভাব
ফলনের স্থায়িত্ব	দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী উৎপাদন	অস্থায়ী ও কমে যায়
স্বাস্থ্যগত প্রভাব	নিরাপদ ও বিষমুক্ত	দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী

চিত্রের মাধ্যমে জৈব বনাম রাসায়নিক পদ্ধতির প্রভাব বিশ্লেষণ

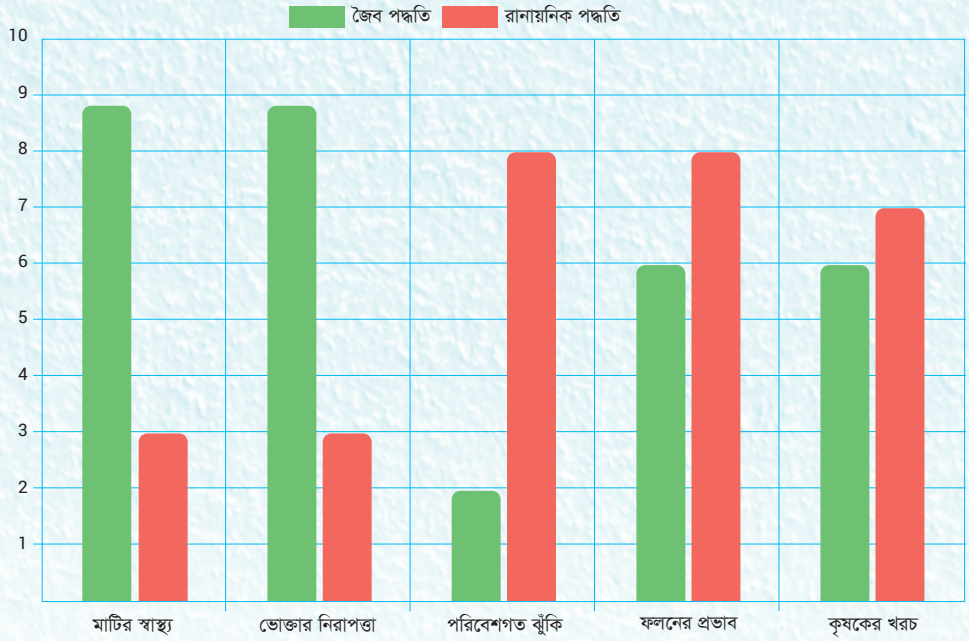

একটি প্রতীকী তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে জৈব ও রাসায়নিক কৃষির প্রভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় (০-১০ স্কেলে):

- **মাটির স্বাস্থ্য (Soil Health):** এই ক্ষেত্রে জৈব পদ্ধতির স্কোর (প্রায় ৮.৮) রাসায়নিক পদ্ধতির (প্রায় ৩) তুলনায় অনেক বেশি উন্নত, যা মাটির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
- **ভোক্তার নিরাপত্তা (Consumer Safety):** ভোক্তার সুরক্ষার দিক থেকে জৈব খাদ্য (স্কোর প্রায় ৮.৮) রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত খাদ্যের (স্কোর প্রায় ৩) চেয়ে অত্যন্ত নিরাপদ বলে বিবেচিত।
- **পরিবেশগত ঝুঁকি (Environmental Risk):** রাসায়নিক পদ্ধতির পরিবেশগত ঝুঁকি (স্কোর প্রায় ৮) জৈব পদ্ধতির (স্কোর প্রায় ২) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা প্রমাণ করে জৈব পদ্ধতি পরিবেশ-বান্ধব।
- **ফলনের প্রভাব (Yield Impact):** ফলনের পরিমাণে রাসায়নিক পদ্ধতির প্রভাব (স্কোর প্রায় ৮) জৈব পদ্ধতির (স্কোর প্রায় ৬) চেয়ে সামান্য বেশি হলেও, অন্যান্য ঝুঁকি বিবেচনায় জৈব পদ্ধতির গুরুত্ব বেশি।
- **কৃষকের খরচ (Cost to Farmer):** বিশ্লেষণ অনুযায়ী, রাসায়নিক পদ্ধতি (স্কোর প্রায় ৭) জৈব পদ্ধতির (স্কোর প্রায় ৬) চেয়ে অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

এই বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, যদিও তাৎক্ষণিক ফলনে রাসায়নিক সামান্য এগিয়ে থাকতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং মাটির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে জৈব পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই।

জৈব ও রাসায়নিক সারের তুলনামূলক প্রভাব বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ বনাম উন্নত বিশ্ব

বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র	বাংলাদেশ	উন্নত বিশ্ব
রাসায়নিক সারের ব্যবহার	মাত্রাতিরিক্ত ও ভারসাম্যহীন ড় প্রতি হেক্টরে গড়ে ৩১৮ কেজি সার ব্যবহৃত হয়; মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে।	নিয়ন্ত্রিত ও সুষম সার প্রয়োগ অনুসরণ করা হয়; মাটির উর্বরতা দীর্ঘস্থায়ী রাখা হয়।
মাটির জৈব পদার্থের অবস্থা	নিবিড় চাষে মাটির জৈব পদার্থ <১%; উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।	জৈব সার ব্যবহারে মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল থাকে (৩৫%)।
জৈব কৃষির প্রসার	খুবই সীমিত ড় মোট জমির <১% এ জৈব চাষ।	ব্যাপক – অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রে জৈব চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
কীটনাশকের ব্যবহার	অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত – গত ৫০ বছরে প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে; ৯৩% ক...ষক সুরক্ষা ছাড়া ব্যবহার করেন।	নিরাপদ বিকল্পে রূপান্তর – জৈব বালাইনাশক (Biopesticides) ও বায়োধাকন্ট্রোল ব্যবহৃত হয়।
খাদ্য নিরাপত্তা ও মান	অতিরিক্ত রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের কারণে রপ্তানিতে বাধা; অনেক পণ্য প্রত্যাখ্যান করেছে।	কঠোর খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ড – কীটনাশক অবশিষ্টাংশের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত ও পরীক্ষিত।
স্বাস্থ্য প্রভাব	কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারসহ রোগের হার বেশি (এক হিসাবে ৬৪% আক্রান্ত); বিষক্রিয়া ব্যাপক।	জৈব চাষে কৃষিশ্রমিক ও ভোক্তাদের বিষাক্ত সংস্পর্শ কম; স্বাস্থ্যঝুঁকি কম।
পরিবেশগত	প্রভাব অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক নদী-নালা, ভূগভস্থ জল ও মাটি দূষিত করছে।	জৈব পদ্ধতি কার্বন ধারণ বাড়ায় ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়ক।
অর্থনৈতিক দিক	কৃষক রাসায়নিক নির্ভর; দীর্ঘমেয়াদে খরচ বেড়ে যায়।	জৈব কৃষি লাভজনক; আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও দাম বেশি।

জৈব ও রাসায়নিক সারের তুলনামূলক প্রভাব বিশ্লেষণ (স্বাস্থ্যে, কৃষি, খাদ্য নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা)।

১. স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

প্রভাবের ক্ষেত্র	জৈব পদ্ধতি	রাসায়নিক পদ্ধতি
খাদ্যের গুনগত মান	পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও নিরাপদ; বিষমুক্ত। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ বেশি।	দেখতে ভালো কিন্তু পুষ্টিহীন। খাদ্য শৃঙ্খল হয়ে দেহে বিষক্রিয়া প্রবেশ করে।
স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি	বিষক্রিয়া কমায়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।	দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে; ক্যান্সার, কিডনি রোগ ও হজম সমস্যা বৃদ্ধি করে
সংবেদনশীল গোষ্ঠী	শিশু, গর্ভবতী নারী ও বয়স্কদের সুরক্ষা দেয়।	বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি বেশি।

২. কৃষির ওপর প্রভাব

প্রভাবের ক্ষেত্র	জৈব পদ্ধতি (সার ও বালাইনাশক)	রাসায়নিক পদ্ধতি (সার ও কীটনাশক)
মাটির স্বাস্থ্য	উন্নত ও স্থিতিশীল; মাটির গঠন, জলধারণ ও জীবাণুর কার্যক্রম বৃদ্ধি করে।	ক্ষতিগ্রস্ত ও দূষিত; মাটির গঠন ও উর্বরতা নষ্ট করে।
ফলন ও স্থায়িত্ব	ধীরে ধীরে পুষ্টি সরবরাহ করে; দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ফলন দেয়।	দ্রুত কিন্তু অস্থায়ী ফলন; মাটির সক্ষমতা কমায়।
উৎপাদন খরচ	শুরুতে বেশি, পরে লাভজনক; বজ্য পুনর্ব্যবহার করে ক...ষক স্বনির্ভর হয়।	শুরুতে কম, পরে ক্ষতিকর প্রভাব; মোট খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি
বালাইনাশক	নিম তেল, ট্রাইকোডার্মা, বায়ো-পেস্টিসাইড ব্যবহার হয়; উপকারী পোকা বাঁচে।	কৃত্রিম কীটনাশক উপকারী অণুজীব ও পরাগবাহক ধ্বংস করে।

৩. খাদ্য নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা

প্রভাবের ক্ষেত্র	জৈব পদ্ধতি	রাসায়নিক পদ্ধতি
খাদ্য নিরাপত্তা	রাসায়নিক অবশিষ্টাংশবিহীন ও বিষমুক্ত; ভোক্তা নিরাপত্তা স্কোর ≈ ৮.৮	খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রবেশ করে; নিরাপত্তা স্কোর ≈ ৩
পরিবেশগত প্রভাব	দূষণমুক্ত, টেকসই; কার্বন ধারণে সহায়ক, ঝুঁকি স্কোর ≈ ২	দূষণ বৃদ্ধি করে; নদী-নালা ও ভূগর্ভস্থ জল দূষিত, ঝুঁকি স্কোর ≈ ৮
অর্থনৈতিক দিক	আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমূল্য; কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।	কৃষক বাজারনির্ভর হয়ে পড়ে।

জৈব বালাইনাশক: প্রকৃতির সাথে সমন্বয়

রাসায়নিক কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে জৈব বালাইনাশকগুলি এখন অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এই বিকল্পগুলি প্রকৃতির নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকাজকে পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে:

১। নিম তেল (Neem oil): এটি একটি শক্তিশালী উদ্ভিদজাত বালাইনাশক যা কার্যকরভাবে পোকামাকড় দমন করে কিন্তু উপকারী বন্ধু পোকা বা পরাগবাহক মৌমাছিদের নষ্ট করে না।

২। ট্রাইকোডার্মা (Trichoderma): এটি একটি উপকারী ছত্রাক, যা মাটির মাধ্যমে ছড়ানো ছত্রাকজনিত রোগ দমনে অত্যন্ত কার্যকর জৈব উপাদান।

৩। পিপার ও রসুন নির্যাস: এইগুলি প্রাকৃতিকভাবে কীট প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে, ফসলের ওপর কীটনাশকের বিষাক্ত প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।

৪। বায়ো-পেস্টিসাইড (Bacillus thuringiensis - Bt): এটি এক প্রকার জৈব কীটনাশক যা নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্ষতিকারক লার্ভার উপর কাজ করে কিন্তু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকর নয়।

জৈব বালাইনাশকের প্রয়োগ একটি টেকসই কৃষি মডেল তৈরি করে যা কৃষকের খরচ কমায় এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে।

জৈব কৃষির সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি, জৈব কৃষি গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে:

- **বর্জ্য পুনর্ব্যবহার:** গ্রামীণ পর্যায়ে গৃহস্থালি, খামার ও বাজারের বর্জ্য পদার্থ পুনর্ব্যবহার (Recycling) হয় কম্পোস্ট বা ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির মাধ্যমে, যা পরিবেশ পরিছন্ন রাখতে সাহায্য করে।
- স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি: কৃষকদের সার ও কীটনাশকের জন্য বাজারের ওপর বা বহুজাতিক কোম্পানির ওপর নির্ভরতা কমে যায়, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দেয়।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: জৈব সারের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং জৈব পণ্য বিপণনের ফলে গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- উচ্চ মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার: জৈব পণ্য তার গুণগত মানের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি মূল্য পায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সহায়ক।

নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের প্রতিশ্রুতি

জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করে যে আমাদের খাদ্য বিষমুক্ত এবং উচ্চমানের পুষ্টিতে ভরপুর। যখন একজন কৃষক রাসায়নিকের বদলে জৈব পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তখন তিনি কেবল তাঁর নিজের জমিকেই বাঁচান না, বরং পুরো সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করেন।

জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলগুলিতে সাধারণত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও অপরিহার্য খনিজ উপাদানের মাত্রা বেশি থাকে, যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সরাসরি বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের মতো অসংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

বিশেষত, শিশু, গর্ভবতী নারী এবং বয়স্কদের মতো সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শ থেকে সুরক্ষা অপরিহার্য। জৈব খাদ্য গ্রহণে কীটনাশকের অবশিষ্ট বিষক্রিয়ার ঝুঁকি কমে যায়, যা তাদের সুস্থ্য বৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথ সুগম করে।

দীর্ঘমেয়াদে, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন দেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির অংশ। রাসায়নিক-সম্পর্কিত রোগের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার পেছনে রাষ্ট্রের যে বিপুল ব্যয় হয়, জৈব কৃষির প্রসারের মাধ্যমে তা কমিয়ে আনা সম্ভব। জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যাপক ব্যবহার রাসায়নিকের উপর আমাদের নির্ভরতা কমিয়ে দেবে এবং ধীরে ধীরে খাদ্য উৎপাদনকে নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব করে তুলবে।

জৈব কৃষির চ্যালেঞ্জ

জৈব পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের পথ হলেও, এই পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়। এই পথে বেশ কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার মোকাবেলা করা অত্যন্ত জরুরি:

১। **প্রথমদিকে কম ফলন ও কৃষকের অনীহা:** রাসায়নিক থেকে জৈব পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময় প্রথম ২-৩ বছর ফসলের ফলন কিছুটা কমে যেতে পারে। এটি অনেক কৃষককে নিরুৎসাহিত করে।

২। **প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানের অভাব:** জৈব সার তৈরি এবং রোগ পোকা দমনে সঠিক দেশীয় জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক অভাব রয়েছে।

৩। **শ্রমনির্ভরতা ও খরচ:** রাসায়নিক স্প্রে করার চেয়ে জৈব উপায়ে পোকা দমন (যেমন হাত দিয়ে পোকা তোলা বা জৈব বালাইনাশক তৈরি) বেশি শ্রম ও সময়সাপেক্ষ, ফলে উৎপাদনের খরচ প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৪। **জৈব শংসাপত্র (Certification) প্রক্রিয়া:** জৈব পণ্যের উচ্চ মূল্য পেতে যে শংসাপত্রের প্রয়োজন হয়, তা অনেক কৃষকের কাছে জটিল ও ব্যয়বহুল।

উত্তরণের পথ:

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ:

- **সরকারি সমর্থন ও প্রণোদনা:** প্রথমদিকে ফলন কমার ক্ষতিপূরণ দিতে কৃষকদের আর্থিক ভর্তুকি ও প্রণোদনা দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি জৈব পণ্য বিপণনের জন্য নির্দিষ্ট বাজার তৈরি করে দেয়, তবে কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে।
- **প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ পরিষেবা:** উন্নত বীজ, জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক কৃষি অ্যাপসের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে জৈব প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে দিতে হবে।
- **বাজার সংযোগ স্থাপন:** জৈব খাদ্যকে সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন (Supply Chain) তৈরি করা জরুরি, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কমে এবং কৃষকের আয় বাড়ে।
- **সহজ শংসাপত্র ব্যবস্থা:** ছোট কৃষকদের জন্য সহজলভ্য এবং কম খরচের শংসাপত্র প্রক্রিয়া চালু করা উচিত, যা তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সহায়তা করবে।

উপসংহার

খাদ্য দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় খাদ্যের গুরুত্ব ও আমাদের দায়িত্বের কথা। জৈব সার মাটির গঠন উন্নত করে, উপকারী জীবাণুর জন্ম দেয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্বন ধারণ করে। অন্যদিকে, জৈব বালাইনাশকগুলি ফসলের সুরক্ষা নিশ্চিত করেও পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি করে না। এই কারণেই জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য এখন কেবল সময়ের দাবি নয়, বরং এটি মানবজাতিকে রাসায়নিকের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র প্রধান অন্তরায়। রাসায়নিক নির্ভরতা থেকে জৈব পদ্ধতির দিকে এই পরিবর্তন একটি একক পদক্ষেপ নয়, বরং এটি একটি সমন্বিত বিপ্লব। এই বিপ্লবকে সফল করতে হলে সরকারের নীতি, কৃষকের সচেতনতা এবং ভোক্তার চাহিদার মধ্যে একটি দৃঢ় বন্ধন তৈরি করতে হবে। নীতি নির্ধারকদের উচিত জৈব চাষকে উৎসাহিত করতে ভর্তুকি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কৃষকদের উচিত বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে জৈব উপাদান প্রস্তুত করা, এবং ভোক্তাদের উচিত জৈব পণ্য গ্রহণে আরও আগ্রহী হওয়া। জৈব কৃষি কেবল সুস্থ্য শরীরের প্রতিশ্রুতি দেয় না, এটি একটি টেকসই, স্বনির্ভর ও পরিবেশ-বান্ধব সমাজ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে। আসুন, আমরা সকলে মিলে এই সবুজ পথে পা রাখি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন এক খাদ্য ব্যবস্থা রেখে যাই, যেখানে প্রতিটি ফসল হবে বিষমুক্ত, প্রতিটি মাটি হবে প্রাণবন্ত এবং প্রতিটি জীবন হবে সুস্থ্য।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৫

নিরাপদ খাদ্য- টেকসই জীবনের পূর্বশর্ত

মোঃ রেদোয়ান হোসাইন, শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬২৫/১ পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

ভূমিকা

খাদ্য মানবজীবনের মৌলিক চাহিদা। সুস্থ দেহ, স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ ও মানসিক প্রশান্তির জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই। খাদ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতার প্রধান চালিকাশক্তি। নিরাপদ খাদ্যের অভাব সমাজে অপুষ্টি, রোগব্যাধি, কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়। বর্তমানে বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভেজাল খাদ্য এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা খাদ্য নিরাপত্তাকে কঠিন চ্যালেঞ্জে ফেলেছে। এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা টেকসই জীবনের অন্যতম শর্ত।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ও ডিম দিবসের তাৎপর্য

প্রতিবছর ১৬ অক্টোবর জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' পালিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংহতি জোরদার করা এবং খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন ও গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নিয়ে এই দিবস খাদ্য সংকট মোকাবেলায় নতুন দিশা দেখায়।

অন্যদিকে, অক্টোবরের দ্বিতীয় শুক্রবার 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালন করা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো ডিমের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। ডিমে উচ্চ মানের প্রোটিন, ভিটামিন (এ, ডি, ই, বি-১২), খনিজ (আয়রন, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম) ও মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়ক কোলিন রয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, শিশু ও নারীদের অপুষ্টি দূর করতে ডিম যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। এই দিবসগুলো শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার এক বিশ্বব্যাপী অঙ্গীকার।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা ও এর স্তম্ভ সমূহ

খাদ্য নিরাপত্তা একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা চারটি মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্তম্ভগুলো নিশ্চিত না হলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

১. **খাদ্যের প্রাপ্যতা (Availability):** এর অর্থ হলো দেশের অভ্যন্তরে জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি বা মজুত থাকা। এর সঙ্গে শস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সাইলো, গুদাম এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

২. **খাদ্যে প্রবেশাধিকার (Accessibility):** শুধু খাদ্য থাকলেই হবে না, সেই খাদ্য প্রত্যেক মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে এবং ভৌগোলিকভাবে সহজলভ্য হতে হবে। অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকার বলতে বোঝায় খাদ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকা, এবং শারীরিক প্রবেশাধিকার বলতে বোঝায় বাজার, দোকান ও বিতরণ কেন্দ্র পর্যন্ত সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা।

৩. **খাদ্যের ব্যবহার (Utilization):** এর অর্থ হলো গৃহীত খাদ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। অর্থাৎ, খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শরীর কতটা শোষণ করতে পারছে তা নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং খাদ্য প্রস্তুত করার সঠিক জ্ঞান। পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা না থাকলে পর্যাপ্ত খাবার খেয়েও মানুষ অপুষ্টির শিকার হতে পারে।

৪. **স্থিতিশীলতা (Stability):** এই স্তম্ভটি সময়ের সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার সক্ষমতাকে বোঝায়। বন্যা, খরা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির মতো কোনো অভিঘাত যেন খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যাহত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করাই হলো স্থিতিশীলতা। দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখা এর মূল লক্ষ্য।

এই চারটি স্তম্ভের সমন্বয়েই একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এর যেকোনো একটি দুর্বল হলে পুরো ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এর অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক জীবনযাত্রা কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে, বিশেষ করে ধান, মাছ, সবজি ও ডিম উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। একসময় খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে, আর তা হলো–খাদ্যে ভেজাল এবং রাসায়নিক দূষণ। মুনাফালোভী, অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা আজ এক মহা সংকটের মুখে। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, শহরাঞ্চলের বাজারে প্রাপ্ত প্রায় ৫০৬০% খাদ্যদ্রব্যেই কোনো না কোনো ধরনের ভেজাল বা ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি রয়েছে। এর কিছু ভয়ঙ্কর উদাহরণ হলো:

- ফল ও সবজি: ফল দ্রুত পাকানো এবং আকর্ষণীয় করার জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথেফন ও ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য: দুধে ফরমালিন, ডিটারজেন্ট, এবং জল মিশিয়ে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
- মাছ: মাছকে তাজা দেখাতে এবং পচন রোধ করতে ফরমালিন ও ম্যালাকাইট গ্রিন-এর মতো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে।
- মসলা: হলুদের গুঁড়োতে লেড ক্রোমেট (যা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে), মরিচের গুঁড়োতে ইটের গুঁড়ো এবং অন্যান্য মসলায় কাপড়ের রঙ মেশানো হচ্ছে।
- বেকারি পণ্য ও মিষ্টি: আকর্ষণীয় রঙ আনতে টেক্সটাইল ডাই ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। মুড়িকে সাদা ও ফোলা করতে ইউরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়া, বমি, পেটব্যথা ও খাদ্যে বিষক্রিয়া। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের কারণ হলো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, যা নীরবে আমাদের শরীরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর ফলে ক্যান্সার, কিডনি ফেইলিওর, লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মহার বাড়ছে।

নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব

টেকসই জীবন ও উন্নয়নের জন্য নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১. **সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি:** নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শরীর সুস্থ থাকে এবং কর্মস্পৃহা বাড়ে। একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

২. **পুষ্টি ঘাটতি পূরণ:** নিরাপদ খাদ্য শিশু ও নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে। এর ফলে খর্বাকৃতি (stunting), কৃশকায় (wasting) এবং রক্তস্বল্পতার মতো সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা সহজ হয়।

৩. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** খাদ্যজনিত অসুস্থতার কারণে প্রতি বছর দেশের স্বাস্থ্যখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং অসুস্থতার কারণে কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ায় জাতীয় উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হলে এই উভয় ক্ষতি থেকেই দেশ রক্ষা পায়। এছাড়াও, নিরাপদ খাদ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ তৈরি করে, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে।

৪. **সামাজিক স্থিতিশীলতা:** খাদ্য সংকট বা খাদ্যের উচ্চমূল্য সমাজে অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা এমনকি দাঙ্গার কারণ হতে পারে। সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্যের জোগান সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৫. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন: জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) বেশ কয়েকটি লক্ষ্য সরাসরি নিরাপদ খাদ্যের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে লক্ষ্য ২ (ক্ষুধামুক্তি), লক্ষ্য ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এবং লক্ষ্য ১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন) অর্জনের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

ডিম: পুষ্টির সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য উৎস

ডিমকে পুষ্টির পাওয়ার হাউস বলা হয়। এর প্রতিটি অংশে রয়েছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান। একটি ডিমে প্রায় ৬-৭ গ্রাম উচ্চ মানের প্রোটিন থাকে, যা শরীরের কোষ গঠন ও মেরামতে সহায়তা করে। এতে আরও রয়েছে:

- ভিটামিন ডি: হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।
- কোলিন: মস্তিষ্কের বিকাশ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা ঠিক রাখতে সহায়তা করে। গর্ভবতী মায়েদের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি।
- লুটিন ও জিয়াজ্যান্থিন: চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করে।
- আয়রন, জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম: যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শরীরের বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে ডিম উৎপাদন বহুগুণে বেড়েছে এবং এটি এখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে।

স্কুলের টিফিনে বা সকালের নাস্তায় একটি ডিম শিশুর দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করতে পারে। ডিম নিয়ে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা, যেমন–এটি কোলেস্টেরল বাড়ায়, তা আধুনিক গবেষণায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। পরিমিত পরিমাণে ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যকর জীবনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

উৎপাদনের পর থেকে ভোক্তার প্লেটে পৌঁছানো পর্যন্ত খাদ্যকে বিভিন্ন স্তর পার হতে হয়। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে সঠিক সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে খাদ্যের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় এবং জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫-৩০% খাদ্যশস্য ও ফলমূল শুধু সঠিক সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

- আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা: শস্য সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতানিয়ন্ত্রিত সাইলো ও আধুনিক গুদামঘর নির্মাণ করা জরুরি। ফল, সবজি, দুধ, মাংস ও মাছের মতো পচনশীল দ্রব্যের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন 'কোল্ড চেইন' বা শীতলীকরণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে উৎপাদনস্থল থেকে শুরু করে পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব।
- প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ: খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প একদিকে যেমন খাদ্যের অপচয় রোধ করে, তেমনই অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং রপ্তানির সুযোগ বাড়ায়। তবে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর উপাদান ব্যবহার এবং সঠিক লেবেলিং নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভেজাল প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্যে ভেজাল নামক এই নীরব ঘাতককে প্রতিরোধ করতে হলে একটি সমন্বিত ও বহুস্তরীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- **রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ:** 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'-এর কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA)-কে আরও শক্তিশালী করতে হবে। নিয়মিত ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।
- **প্রযুক্তির ব্যবহার:** ফুড ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম চালু করা যেতে পারে। ব্লকচেইন বা কিউআর কোডের মাধ্যমে ভোক্তা সহজেই খাদ্যের উৎস ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- **কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ:** কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অর্গানিক কৃষি পদ্ধতিতে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।
- **ভোক্তার সচেতনতা:** খাদ্য কেনার সময় লেবেল, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ দেখা উচিত। অনুমোদিত উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ এবং সন্দেহজনক কিছু হলে কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।
- **গবেষণা ও উদ্ভাবন:** ভেজাল শনাক্তকরণ কিট, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা

নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নিরাপদ খাদ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা অফুরন্ত। সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। মাছ, ডিম, দুধ এবং শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর কাতারে রয়েছে। এই বিপুল উৎপাদনকে যদি গুণগতভাবে নিরাপদ করা যায়, তবে তা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারেও একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারবে। অর্গানিক খাদ্যের বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশের বিশাল সুযোগ রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন শুধু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উৎপাদন ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উপসংহার

খাদ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ নয়, এটি জাতির শক্তি, স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি। নিরাপদ খাদ্য ছাড়া টেকসই জীবন ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। ডিম, দুধ, মাছ, মাংস থেকে শুরু করে প্রতিটি খাদ্যশস্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ভোগের প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র, উৎপাদক ও ভোক্তা–সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

অতএব বলা যায়, "নিরাপদ খাদ্যই টেকসই জীবনের পূর্বশর্ত" এবং এর মাধ্যমে সুস্থ প্রজন্ম, কর্মক্ষম সমাজ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

খাদ্য উৎপাদন এবং পুষ্টি নিশ্চিতকরণ

ডা. মোঃ আহসান আরাফাত লাবিব, বিএসসি ইন ভেট সায়েন্স এন্ড এএইস, বিভিসি রেজি নং-৯৬১৯, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার, প্রোভিটা গ্রুপ

"অন্নে আছে জীবনের আলো, পুষ্টিতে জাগে প্রান,
বিশ্ব খাদ্য ও ডিম দিবসে হোক সবার মুখে সুস্থ জীবনের গান।"

মানুষের বেঁচে থাকা ও সুস্থ জীবনের মূল ভিত্তি হলো খাদ্য। খাদ্য শুধু শরীরের শক্তির জোগানই দেয় না, এটি মানুষের মানসিক বিকাশ, কর্মক্ষমতা ও জাতীয় উৎপাদনশীলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিদিনের জীবনে আমরা শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধসহ নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ করি–যেগুলোর প্রতিটি উপাদান আমাদের শরীরে নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে। একদিকে এগুলো আমাদের পুষ্টিগত চাহিদা পূরণ করে, অন্যদিকে কৃষি ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবেও কাজ করে

বিশ্বজুড়ে অক্টোবর মাসে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস যাহা আমাদের খাদ্যের গুরুত্ব, নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই দুটি দিবস একদিকে খাদ্য উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তুলে ধরে, অন্যদিকে খাদ্যের সুষম বণ্টন, মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে।

১. খাদ্য উৎপাদন

বাংলাদেশে সারাবছর বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক শাকসবজি উৎপাদন হয়। প্রধান সবজির মধ্যে আছে–লাউ, কুমড়া, পটল, ঢেঁড়স, বেগুন, আলু, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি। বর্তমানে হাইব্রিড বীজ, মালচিং, ড্রিপ সেচ, এবং ভার্টিকাল গার্ডেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন অনেক বেড়েছে। গ্রীনহাউস ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতির মাধ্যমে শহুরে এলাকায়ও সবজি উৎপাদন জনপ্রিয় হচ্ছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। পুকুর, খাল-বিল, নদী ও জলাশয়ে প্রাকৃতিক ও চাষভিত্তিক মাছ উৎপাদন হয়। বর্তমানে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, মৃগেল, শিং, মাগুর, গোলসা প্রভৃতি মাছ চাষে বায়োফ্লক, আরএএস (RAS), ইনটিগ্রেটেড ফিশ ফার্মিং ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ও খাসির মাংস দেশের প্রাণিজ আমিষের মূল উৎস। ব্রয়লার, সোনালী ও দেশি মুরগির খামারব্যবস্থা এখন আধুনিক। অটো ফিডার, ক্লাইমেট কন্ট্রোলড শেড ও বায়োসিকিউরিটি প্রযুক্তির কারণে উৎপাদন ব্যয় কমেছে এবং মান বেড়েছে।

ডিম উৎপাদনে লেয়ার মুরগি খামারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি দেশি হাঁসের ডিমও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। দুধ উৎপাদনে উন্নত জাতের গাভী যেমন ফ্রিজিয়ান, জার্সি ও স্থানীয় জাতের সংকরায়ন করা গরু ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে দুধ উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

২. খাদ্য বিপণন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে খাদ্য বিপণন প্রথাগত ও আধুনিক–উভয় ধরণের পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। কৃষকরা পণ্য বিক্রি করে হাটবাজার, পাইকার, আড়তদার, রিটেইলার ও সুপারশপের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছায়। বর্তমানে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন Chaldal, Krishi Bazaar, Daraz Mart ইত্যাদি খাদ্য বিপণনে নতুন যুগ সৃষ্টি করেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বিজিএফএল, প্রান, আড়ং ডেইরি, মিল্কভিটা, অঈও ইত্যাদি মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. খাদ্যের পুষ্টিগুণ

খাদ্যের ধরন	প্রদান পুষ্টি উপাদান	শরীরে ভূমিকা
শাক ও সবজি	ভিটামিন, খনিজ, আঁশ	রোগ প্রতিরোধ, পরিপাক সহায়তা
মাছ	প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম	হৃদরোগ প্রতিরোধ, মস্তিস্ক বিকাশ
মাংস	প্রোটিন, আয়রন, বি-ভিটামিন	শরীর গঠন, শক্তি সরবরাহ
ডিম	প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন A,D, E	কোষ বৃদ্ধি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা
দুধ	ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ল্যাকটোজ	হাড় ও দাঁত মজবুতকরণ

সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের বৃদ্ধি, বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

৪. মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (BFSA), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BST), ফিশারিজ কোয়ালিটি কন্ট্রোল (FQC), এবং ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস (DLS) বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। HACCP, GMP, ISO সার্টিফাইড মান অনুসারে কাজ করা হচ্ছে। প্যাকেটজাত খাদ্যে লেবেলিং, এক্সপায়ারি তারিখ, পুষ্টি উপাদান উল্লেখ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৫. খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি

শাকসবজি: কোল্ড স্টোরেজ, রেফ্রিজারেটেড ভ্যান, ক্যানিং, ড্রায়িং

মাছ: ফ্রিজিং, চিলিং, স্মোকিং, সল্টিং

মাংস: ভ্যাকুয়াম প্যাকিং, ফ্রোজেন স্টোরেজ

দুধ: পাস্তুরাইজেশন, ইউএইচটি প্রসেসিং, কনডেন্সড মিল্ক

ডিম: ঠান্ডা ঘরে সংরক্ষণ, পাউডার ফর্ম

উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তির ফলে খাদ্যের অপচয় কমছে এবং ভোক্তা সারা বছর পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে।

৬. খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি

বাংলাদেশের খাদ্যাভ্যাস মূলত ভাত-ভিত্তিক। তবে শাকসবজি, ডাল, মাছ ও মাংসের সুষম সমন্বয় ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। শহুরে জীবনযাত্রায় ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রবণতা বেড়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

দৈনিক পুষ্টি নির্দেশিকা (পূর্ণবয়স্ক): শর্করা: ৫০-৬০%, প্রোটিন: ১৫-২০%,চর্বি: ২০-২৫%, এবং ভিটামিন ও খনিজ: যথাযথ পরিমাণে।

শিশু, গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধদের জন্য আলাদা নির্দেশিকা প্রযোজ্য।

৭. খাদ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি

Precision Agriculture: সেন্সর ও ড্রোনের মাধ্যমে সার, পানি ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ।

Biofloc ও RAS প্রযুক্তি: মাছ চাষে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন।

Pasteurization ও UHT: দুধের জীবাণু নিয়ন্ত্রণে।

Freeze Drying: দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ।

Smart Packaging: সতেজতা নির্দেশক সেন্সরযুক্ত প্যাকেজিং।

AI ও IoT ভিত্তিক মনিটরিং: খামার থেকে বাজার পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি।

৮. খাদ্য নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে । গবেষণা, রপ্তানি, নিরাপদ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও গ্রামীণ উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।সেজন্য প্রয়োজন-ক) কৃষক ও খামারির প্রশিক্ষণ, খ) মানসম্মত ইনপুট সরবরাহ, গ) খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পে বিনিয়োগ, ঘ) খাদ্য অপচয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থা, এবং ঙ) ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি।

উপসংহার

খাদ্য শুধু পেট ভরার উপাদান নয়, এটি একটি দেশের স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও উন্নয়নের মাপকাঠি। শাক, সবজি, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের সঠিক উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ পুষ্টিসমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

স্লোগান:

"খাদ্যে গড়ি সুস্থ জীবন, পুষ্টিতে গড়ি দেশ,
বিশ্ব খাদ্য ও ডিম দিবসে হোক উন্নত আগামীর আবেশ।

ডিম: একটি সম্পূর্ণ খাদ্য ও নিরাপদ পুষ্টির উৎস

ইরিন আক্তার হাফসা, শিক্ষার্থী, বেগম সৈয়দুন্নেসা হল, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২২৫

ডিম আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ডিমকে একটি সম্পূর্ণ খাদ্য বলে অভিহিত করা হয় কারণ এতে মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব পুষ্টিগুণই বিদ্যমান। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায়। এ থেকেই বোঝা যায় যেটা থেকে একটি সম্পূর্ণ প্রাণের উদ্ভব ঘটে সেটি পুষ্টিগুণে কতটা সমৃদ্ধ ।

ডিমে প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ এমনভাবে বিদ্যমান যে এটি শরীরের বৃদ্ধি, কোষ নির্মাণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। একটি মাঝারি আকারের ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম উচ্চ মানের প্রোটিন থাকে, যাতে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড বিদ্যমান,যা শরীরের টিস্যু গঠন ও মেরামতে সহায়তা করে। ডিমে ৫-৫.৩ গ্রাম চর্বি বিদ্যমান যা প্রধানত অসম্পৃক্ত চর্বি, যা হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ডিমের কুসুমে ভিটামিন এ,ডি,ই,কে এবং বি গ্রুপের ভিটামিন থাকে। এছাড়াও এতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ও জিঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ রয়েছে। ভিটামিন ডি হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত করতে সাহায্য করে, আর আয়রন রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।ডিমের কুসুমে লিউটেন ও জিয়াজেনথিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতি চোখের স্বাস্থ্যে উপকারী।

ডিমের পুষ্টিগুণ শুধু শিশুদের নয়, বয়স্ক ও গর্ভবতী নারীদের জন্যও সমানভাবে উপকারী। শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে ডিমের কোলিন নামক উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গর্ভবতী নারীদের পুষ্টি ঘাটতি পূরণে প্রতিদিন একটি ডিম অনেক উপকারী হতে পারে।

এছাড়াও, ডিম একটি সহজে রান্না করা যায় এমন খাবার। সেদ্ধ, ভাজা, অমলেট, ঝুরি–বিভিন্নভাবে এটি খাওয়া যায় এবং প্রতিটি রূপেই সুস্বাদু। অনেক দেশে এমনকি ডিমকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ এখনো পুষ্টি চাহিদা পূরণে স্বয়ং সম্পূর্ণ না। আমিষের ঘাটতি পূরণে ডিম হতে পারে অনবদ্য এক খাদ্য।দেশীয় খামারগুলো প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ডিম উৎপাদন করছে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বার্ষিক ২৩.৩৭ বিলিয়ন ডিম উৎপাদন হয়েছে বাংলাদেশে।এর ফলে দেশের প্রোটিন চাহিদা মেটাতে ডিমের ভূমিকা অপরিসীম। সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা মানুষকে প্রতিদিন একটি করে ডিম খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, যা "একটি ডিম প্রতিদিন, শিশুর বিকাশে নিশ্চয়ই প্রয়োজন"–এই স্লোগানেও প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে ডিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও খুব জরুরি। খামারে উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কিছু পদক্ষেপ যেমন:খামার ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখা,স্বাস্থ্যবান মুরগি পালন,সময়মতো ও সাবধানে ডিম সংগ্রহ,ফাটা বা ময়লা ডিম আলাদা করা,ঠান্ডা ও শুকনো স্থানে সংরক্ষণ,উৎপাদনের তারিখসহ প্যাকেটিং,নিয়মিত মান পরীক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি গ্রহণ করা হয় তবে ডিমের মান ও নিরাপত্তা দুটোই বজায় থাকে।পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সংরক্ষণ না করলে ডিমে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে, যা খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই নিরাপদ ডিম উৎপাদন ও সংরক্ষণে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়াও খাবার, পানি ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় খামার ব্যবস্থাপনা,বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য খামারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার,পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অ্যান্টিবায়োটিকবিহীন পুষ্টিকর জৈব খাদ্য ব্যবহার ,সেন্সর বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মুরগির স্বাস্থ্য ও উৎপাদন নিয়মিত পর্যবেক্ষন এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ডিম উৎপাদন হবে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই।

ডিম বিপণনে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।ঠান্ডা ঘর বা রেফ্রিজারেশনের অভাবে অনেক সময় ডিম দ্রুত নষ্ট হয়। গরম আবহাওয়া ও খারাপ রাস্তার কারণে পরিবহনের সময় ডিম ফেটে যায়।হঠাৎ করে দাম ওঠানামা করলে খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।খামারিরা সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করতে না পারায় তারা ন্যায্য দাম পায় না। পর্যাপ্ত আধুনিক বিপণন কেন্দ্র না থাকায় ডিম বিক্রি ও বিতরণে সমস্যা হয়।এসব সমস্যা সমাধান করে সঠিক বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যেন ডিমের মান বজায় থাকে, খামারিরা ন্যায্য দাম পায়, এবং ভোক্তারা নিরাপদ ডিম পেতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, ডিম এমন একটি খাদ্য যা কম খরচে, সহজলভ্য এবং সর্বাধিক পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি শিশু থেকে বৃদ্ধ–সবার জন্যই উপযুক্ত। তাই বলা যায়,ডিম একটি সম্পূর্ণ খাদ্য। পুষ্টি নিরাপত্তায় ডিমের বিকল্প নেই বললেই চলে।

ডিম: এক বিস্ময়কর পুষ্টির ভাণ্ডার

এ.বি.এম. আসাদুজ্জামান, নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক পুনশ্চ

খাবার হিসেবে ডিম মহা পুষ্টিদাতা, নির্ভেজাল এবং আকাশচুম্বি দ্রব্যমূল্যের বাজারে এখনও পর্যন্ত সস্তা প্রাকৃতিক খাদ্য। প্রকৃতিতে যত ধরনের প্রোটিন মানুষের সবচেয়ে গ্রহণ উপযোগী তার মধ্যে ডিম অত্যন্ত সহজপাচ্য একটি খাবার; কারণ, ডিমের প্রোটিনে রয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত এমাইনো এসিড, সর্বোচ্চ মানের প্রোটিন দক্ষতা ও ব্যবহার ক্ষমতা। মানুষের ব্যবহার্য অন্যান্য খাদ্যের পুষ্টিমান বিবেচনায় ডিম হচ্ছে স্বর্ণের মাপকাঠি। শুধুমাত্র প্রোটিনের উৎস হিসেবেই নয়, বরং ডিমে মানুষের প্রয়োজনীয় কোন উপাদানটি নেই? প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডের প্রায় সবই রয়েছে ডিমে। ডিম ভিটামিন-সি বাদে প্রায় সকল ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং ফ্যাটি এসিডের যোগানদাতা।

উৎপাদনের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দরুন ডিম মূল্যমানে দারুণ সাশ্রয়ী। আর তাই উন্নয়নশীল দেশের খেটে খাওয়া গরীব মানুষের খাদ্য তালিকায় পৌঁছে গেছে ডিম। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচুর ডিম উৎপন্ন হয় এবং সব জায়গাতেই সমানভাবে সমাদৃত। ডিম তুলনামূলক অনেক সস্তা যা একটু হিসেব করলেই বোঝা যায়। অ্যালকোহল কিংবা কোমল পানীয়ের কথা বাদ দিন, একটি ডিম এমনকি এক কাপ চা অথবা কফির চেয়েও সস্তা। যদিও পুষ্টিমানে এরা ডিমের ধারে কাছে কেউ নেই। সত্যি বলতে কি এদের সাথে ডিমের কোন তুলনাই চলে না। কারণ, এ সকল পানীয়ের মধ্যে যৎসামান্য কিছু চিনি ছাড়া আর কিছুই নেই; যা আছে তা মানুষকে কিছু ক্রণিক রোগের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। ডিমই একমাত্র খাদ্য যা একই রকম কম মূল্যে সারা বছর জুড়েই পাওয়া যায়। কিন্তু মৌসুমী সবজি বা ফলমূল মৌসুমের বাইরে চড়া মূল্যে কিনতে হয়। একটি ডিমে রয়েছে সর্বোচ্চ জৈবিক মানের ৭ গ্রাম প্রোটিন ও পলি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, ফসফোলিফিড, ভিটামিন-ই এবং কোলেস্টেরল যা মস্তিষ্কের গঠন এবং মনন বিকাশে অপরিহার্য।

একটি ডিম থেকে আপনি কতটুকু পুষ্টি পাবেন? একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রায় ১১.৫% প্রোটিন, ১১.৭% পলি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, ২৩% মনো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, ১০০% ফসফোলিপিড, ৮৫.৫% ভিটামিন-এ, ১৯% ভিটামিন-ডি, ১৩.১% ভিটামিন-বি২, ১৬০% ভিটামিন-বি১২, ৪০% ফোলিক এসিড, ১৬% ভিটামিন ই, ১৭% পেন্টোথেনিক এসিড, ৪০% বায়োটিন, ৯১.১% কোলিন, ১৭.৯% ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ, ৮.৮% ক্যালসিয়াম, ২০% কপার, ৮.৯% জিংক উপাদান। মোদ্দা কথা হচ্ছে, একটি ডিম একজন পুষ্টির শতকরা প্রায় ২৫.৫ ভাগ মিটিয়ে থাকে খরচে।

ডিমের স্বাস্থ্য রক্ষাকারী উপাদান সমূহঃ

পুষ্টি উপাদান	কার্যাবলী
১. এন্টিবডি (আই.জি.ওয়াই)	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, রোটা ভাইরাস, সালমোনেলা, ই-কলাই সিউডোমোনাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে কার্যকরী, এমনকি এই রোগীরআয়ু বাড়িয়ে দেয়।
২. বিটেইন	হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।
৩. বি-সাইটেস্টেরল, ক্যামপেস্টেরল, স্টিগমেস্টেরল	এইচ.ডি.এল. কোলেষ্টেরল বাড়ায় (যা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল)
৪. ক্যারাটিনয়েড	এন্টি অক্সিডেন্ট, ক্যান্সার প্রতিরোধ, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, এল.ডি.এল কোলেস্টেরল কমায় (যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর)
৫. লিনোলিক এসিড	ক্যান্সারএবং হৃদরোগ প্রমশন করে
৬. ফলিক এসিড	ক্যান্সার এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
৭. জি-২ ও জি-৩ গোবিউলিন	জীবাণুনাশক, রোগ প্রতিরোধক এবং এন্টিজেনিক
৮. লেসিথিনের সাথে ভিটামিন বি-১২	শিশুর মনন বিকাশ, এ্যালঝেমাক্স রোগের প্রকোপতাকমায়
৯. লেসিথিনএবং ফসভিটিন	এন্টি অক্সিডেন্ট, বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকায়, হৃদরোগ কমায়।
১০. লাইপোপ্রোটিন ১৭.৫	দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে

১১. লুমিক্রোম	প্রাকৃতিক এন্টি অক্সিডেন্ট, রক্তনালী কার্যকর রাখে।
১২. লুমিফাভিন	হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের ঝুঁক কমায়
১৩. মনো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	এলডিএল কোলেস্টেরল (খারাপ) কমায়, এইচডিএল কোলেস্টেরল (ভাল) বাড়ায়।
১৪. ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড	উচ্চ রক্তচাপ কমায়, ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, থ্রমবোসিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, রক্তে গুকোজেরমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
১৫. জৈব ক্রোমিয়াম	রক্তে এলডিএল কোলেস্টেরল কমায়, রক্তে গুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে।
১৬. জৈব সেলেনিয়াম	প্রাকৃতিক এন্টি অক্সিডেন্ট, রোগ প্রতিরোধক, দূগন্ধ কমায়, মিউকাস ঝিল্লি রক্ষা করে, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, আলসার প্রতিরোধ করে, শিরা ব্লক হতে দেয় না।
১৭. ভিটামিন-ই	একই ধরনের কাজ।
১৮. ওভালবুমেন	মিউকাস ঝিল্লি রক্ষাকরে, ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি, আলসার প্রতিরোধ করে।
১৯. সিয়ালিক এসিড	প্রদাহ এবং ভাইরাল রোগ প্রতিরোধ করে।
২০. সালফোরাফেন	ক্যান্সার প্রতিরোধ করে
২১.ভিটামিন	রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমায় এবং শিরা ব্লক হতে বাঁধা দেয়।

HDL (High Denstiy Lipid-Good for Health), LDL (Low Density Lipid- Bad for Health).

উপরোক্ত পুষ্টি উপাদান ছাড়াও ডিমে আরও বিশেষ কিছু উপাদান আছে যা সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বতপূর্ণ অবদান রাখে।

আপনি জানেন কি? ডিমে আছে এন্টিকোলেষ্টেরল উপাদান।

অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে, ডিমে উচ্চ কোলেস্টেরল বিদ্যমান। সুতরাং ডিম খেয়ে রক্তে কোলেষ্টেরল বেড়ে যাবে, এই ভয়ে অনেকেই ডিম থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ডিমের মধ্যে যে এমন কিছু উপাদান আছে যারা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাকে অনেক কমিয়ে দেয়। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ডিমে আরো কিছু উপাদান আছে যা সত্যিই অতুলনীয়। তবে লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক অবস্থা, গর্ভাবস্থা, দুগ্ধ প্রদান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা কম-বেশী হতে পারে।

এখন দেখা যাক, একটি ডিমের মূল্য-প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের বাজার মূল্যের শতকরা কত ভাগ। ধরা যাক, বাংলাদেশে একটি ডিমের গড় মূল্য ৮ টাকা এবং একজন পূর্ণবয়স্কের প্রতিদিন খাবারের নূন্যতম মূল্য ৮০ টাকা। একটি ডিমের খরচ মোট খরচের মাত্র ১০%। সুতরাং বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বিবেচনায় একটি ডিম মাত্র ১০% খরচে একজন প্রাপ্ত বয়স্কের প্রত্যাহিক প্রয়োজনীয় পুষ্টির ২৬.৫% পূরণ করে। যা অন্য কোন খাবার দিয়ে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

প্রতিদিন পরিবারের ছোট বড় সবার জন্য একটি করে ডিম:

আপনার স্কুলগামী ছেলে-মেয়ে বেড়ে উঠছে। সুতরাং ওর জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরণের পুষ্টিকর খাবার, তাই আর নয় আজে বাজে টিফিন, ওর বক্সে তুলে দিন একটি ডিম। ডায়েট ডিম-বিজ্ঞানীরা পাল্টে এ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব কম মূল্যে ডায়েট বিস্কুট বা ডায়েট কোমল ডিম তৈরীও সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এই ডিমকে বলছেন- ডায়েট, কার্যকরী, পরিকল্পিত, ওমেগা-৩ অথবা পুষ্টি সমৃদ্ধ ডিম। এই সকল প্রয়োজনীয় পুষ্টির বাহক হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্যমান রক্ষায় উপযুক্ত খাদ্য তৈরীর লক্ষ্যে এই সকল পরিকল্পিত ডিমে সাধারণ ডিমের তুলনায় অনেক বেশী পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। সময় এসেছে নতুন কিছু ভাববার। পুষ্টিহীনতার চিকিৎসা যারা কৃত্রিম মাল্টিভিটামিন গ্রহণের পরামর্শ দেন, এ ক্ষেত্রে ডিম হচ্ছে একটি উপযুক্ত সমাধান। তদুপরি ডিম খুবই সুস্বাদু একটি খাবার। বিভিন্ন ধরনের রুচিকারক ফাস্ট ফুড খুব দ্রুত এবং সহজেই তৈরী করা যায়। সুতরাং ডিমের পুষ্টিমান, এর স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দাম, স্বাদ, স্বাস্থ্য গঠনের উপযোগিতা প্রভৃতি বিবেচনায় প্রত্যেকের পরিবারে ডিম হোক প্রতি দিনের সঙ্গী।

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫

প্রকাশনা উপ-কমিটি

- প্রফেসর ড. মো: শরিফুল ইসলাম - আহবায়ক
- প্রফেসর ড. একেএম মোস্তফা আনোয়ার - সদস্য
- প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির - সদস্য
- প্রফেসর ড. মো: খালেদ হোসেন - সদস্য
- ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান - সদস্য
- প্রফেসর ড. মো: আমির হোসেন - সদস্য
- প্রফেসর ড. মোছা: মিনারা খাতুন - সদস্য
- প্রফেসর ড. সুলতান আহমেদ - সদস্য
- প্রফেসর ড. মহিদুল হাসান - সদস্য
- প্রফেসর ড. মো: সাজেদুল হক - সদস্য
- প্রফেসর ড. আশরাফী হোসেন - সদস্য
- প্রফেসর ড. শেখ আহমেদ আল নাহিদ - সদস্য
- ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান - সদস্য
- ড. নুরে আলম সিদ্দিকী - সদস্য
- ড. জীবুন্নাহার খন্দকার - সদস্য
- ডা. এএইচএম তাছলিমা আক্তার - সদস্য
- মোহাম্মদ তারেক সরকার - সদস্য
- ডা. মো: মুখলেছুর রহমান - সদস্য
- ডা. আবদুর রহমান (রাফি) - সদস্য
- ড. মো: আব্দুল ওয়ারেছ - সদস্য সচিব

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
পরিচালক সদস্য, পরিকল্পনা ও
মূল্যায়ন ইউনিট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ,
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস অনুষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর

ড. নুরে আলম সিদ্দিকী
ডেপুটি টিম লীড
ফ্লেমিং ফান্ড কান্ট্রি গ্রান্ট অব বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. এ.কে.এম মোস্তফা আনোয়ার
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ
এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রয়াত ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস
ওসমানীনগর, সিলেট

প্রফেসর ড. মো. মাসুদুর রহমান
প্যাথলজি বিভাগ, ভেটেরিনারি এন্ড
এনিমেল সায়েন্সেস অনুষদ
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

উপদেষ্টা মন্ডলী

SN	Name	Position
1	প্রফেসর ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ	FAO
2	প্রফেসর ড. মো. বাহানুর রহমান	BAU
3	প্রফেসর ড. আবুসালেহ মাহফুজুল বারী	BAU
4	প্রফেসর ড. কাজী রফিকুল ইসলাম	BAU
5	প্রফেসর ড. এ.কে.এম নওশাদ আলম	BAU
6	প্রফেসর ড. মো. আলীমুল ইসলাম	BAU
7	ড. মো. শমসের আলী	BINA
8	চেয়ারম্যান	BFSA
9	মি. মসিউর রহমান	Paragon
10	ড. নাজমুন নাহার করিম	BARC
11	মি. শামসুল আরেফিন খালেদ	Nourish Group
12	ডা. মো. আলী ইমাম	Jimstech Int'l
13	ডা. মোহাম্মদ আব্দুল সালেক	ACI Agribusiness

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) এর গর্বিত সদস্য হোন

সদস্য ফি ঃ ৫,০০০/- [আজীবন], ১,০০০/- [বাৎসরিক]

যোগাযোগ
+৮৮ ০১৭০৬-৮৭৭৫৩৩ [সভাপতি, বিএসএসএফ]
+৮৮ ০১৭১১-০৫৪৭২৮ [সাধারণ সম্পাদক, বিএসএসএফ]

ভিজিট করুন
www.bdbssf.org/join-with-bssf/

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

ID. No.	Name	Designation	Institution
LM00001	Dr. Eusha Islam	Ex Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00002	Dr. Md. Zakir Hassan	Senior Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00003	Dr. Md. Karim Uddin	Visiting Scholar	University of Helsinki, Finland
LM00004	Dr. Ziban Chandra Das	Associate Professor	BSMRAU
LM00005	Dr. Md. Muklesur Rahman	District Veterinary Surgeon	Department of Livestock Services
LM00006	Dr. Jahangir Alam	Chief Scientific Officer	National Institute of Biotechnology (NIB)
LM00007	Dr. Polysree Pramanik	Ex Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00008	Dr. Mohammad Habibur Rahman Mollah	Secretary General	Bangladesh Veterinary Association
LM00009	Dr. Nasrin Sultana Juyena	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00010	Dr. Chayan Kumer Saha	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00011	Md. Yousuf	General Manager	Best-1 Poultry and Fish Feed
LM00012	Dr. Gadadhar Chandra Shil	Proprietor	Organic Agro Care
LM00013	Md. Azharul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00014	Dr. Md. Ariful Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00015	Dr. Shubash Chandra Das	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00016	Dr. Mustak Ahammed	Consultant (Health and Beauty)	Magnessa Bangladesh Ltd.
LM00017	Dr. Abdullah Iqbal	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00018	Dr. Kazi Rafiqul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00019	Dr. Md. Jalal Uddin Sarder	Professor	Rajshahi University
LM00020	Fatema Nasrin Jahan	Senior Program Officer (NRM)	SAARC Agriculture Centre
LM00021	Dr. Begum Fatema Zohora	Professor	HSTU
LM00022	Dr. Md. Faruk Islam	Professor	HSTU
LM00023	Dr. ATM Mahbub E-Elahi	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00024	Dr. Shah Md. Monir Hossain	Principal Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council
LM00025	Dr. Md. Harunur Rashid	Chief Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council
LM00026	Dr. Md. Shajedur Rahman	Professor	HSTU
LM00027	Dr. Nazmi Ara Rumi	Associate Professor	HSTU
LM00028	Dr. Mir Rowshan Akter	Professor	HSTU
LM00029	Dr. Saifur Rahman	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00030	Dr. Marzia Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00031	Dr. Muhammad Tofazzal Hossain	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00032	Dr. Mohammad Showkat Mahmud	Assistant Professor	Gono University
LM00033	Dr. Md. Abu Yousuf	Senior Scientific Officer	Bangladesg Livestock Research Institute
LM00034	Dr. Md. Taohidul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00035	Dr. Md. Nuruzzaman Munsi	Principal Scientific Officer	Bangladesg Livestock Research Institute
LM00036	Dr. Md. Rashedul Islam	Professor	HSTU
LM00037	Dr. Md. Shahiduzzaman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00038	Dr. Mohammad Shohel Rana Siddiki	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00039	Dr. Md. Mahabubul Alam Tarafder	Senior Scientific Officer	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
LM00040	Md. Anisul Islam	Consultant	Easy Life
LM00041	Dr. Sk. Ahmad Al Nahid	Associate Professor	CVASU
LM00042	Dr. Md. Hemayatul Islam	Deputy Chief Veterinary Officer	University of Rajshahi
LM00043	Dr. Sultan Ahmed	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00044	Dr. Md. Kamruzzaman	Proprietor	Biolab
LM00045	Dr. Mst. Minara Khatun	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00046	Dr. Syed Md. Ehsanur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00047	Dr. Jasim Uddin Ahmed	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00048	Dr. Mohammad Abdus Samad	Chief Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

ID. No.	Name	Designation	Institution
LM00049	Dr. Sattwikesh Paul	Professor	BSMRAU
LM00050	Dr. SM Shahinul Islam	Professor	Rajshahi University
LM00051	Dr. Md. Nurul Haque Mollah	Professor	Rajshahi University
LM00052	Goutam Kumar Deb	Chief Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00053	Dr. Lutfur Rahman	District Veterinary Surgeon	DLS
LM00054	Md. Aiyub Uddin	Senior Manager	FDS Bangladesh Ltd
LM00055	Dr. Moinul Hasan	Assistant Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00056	Dr. Md. Kafil Uddin	Senior Scientist	Bangladesh Agricultural Research Institute
LM00057	Dr. Md. Bakhtiar Lijon	Microbiologist	Modern Food Testing Laboratory, Chittagong
LM00058	Dr. Md. Tanvir Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00059	Dr. Sukumar Saha	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00060	Dr. Parvin Mustari	Chief Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00061	Dr. Md. Shafiqul Islam	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00062	Mrs Zobayda Farzana Haque	Lecturer	Bangladesh Agricultural University
LM00063	Dr. Md. Ershaduzzaman	Senior Specialist (Livestock)	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00064	Dr. Mahbubul Pratik Siddique	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00065	Md. Shafiqul Islam Khan	Professor	Patuakhali Science and Technology University
LM00066	Dr. Md. Sazedul Hoque	Professor	Patuakhali Science and Technology University
LM00067	Dr. Amrita Pondit	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00068	Dr. Mohammad Ashiqul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00069	Dr. Md. Mahfuzur Rahman	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00070	Dr. S. M. Rafiquzzaman	Professor	BSMRAU, Gazipur
LM00071	Dr. Md. Rashedur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00072	Dr. Kabir Uddin Ahmed	Director (AIC)	Bangladesh Agricultural Research Council
LM00073	Dr. Md. Saifullah	Principal Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council
LM00074	Dr. S. M. Kamruzzaman	Professor	Rajshahi University
LM00075	Dr. Syed Sakibul Islam	Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00076	Dr. K. M. Mozaffor Hossain	Professor	Rajshahi University
LM00077	Dr. Khalid Hussain	Editor	Agrinews24.com
LM00078	Md. Hannan Malik	Executive Director	SEEDS
LM00079	Muhammad Javidul Haque Bhuiyan	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00080	Din Mohammed Dinu	Deputy Director (PR)	Bangladesh Agricultural University
LM00081	Md. Mahmudur Rahman	Associate Professor	NPI university of Bangladesh
LM00082	Tasnima Haque	Nutritionist	Bihs General Hospital
LM00083	Dr. Abu Saeid	Lecturer	NPI university of Bangladesh
LM00084	Dr. Ashrafi Hossain	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00085	Dr. Maruf Ahmed	Professor	HSTU
LM00086	Dr. Muhammad Ashik-E-Rabbani	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00087	Dr. Rezaul Alam Reza	Head, Department of Veterinary	Adorsho praniSheba Ltd.
LM00088	Dr. Khandaker Muhammad Mahmud Hossain	Proprietor & CEO	Arena Agro Ltd
LM00089	Dr. Hadiuzzaman	Consultant	Veterinary Diagnostics Center, Mymensingh
LM00090	Dr. Md. Mohidul Hasan	Professor	HSTU
LM00091	Dr. Md. Murshidul Ahsan	Ex National Consultant	PARB Project, DLS, Dhaka
LM00092	Dr. AHM Taslima Akhter	Livestock Specialist	Asian Disaster Preparedness Center
LM00093	Dr. Abdullya Al Mamun	LEO	DLS
LM00094	Dr. Md. Shariful Islam	Professor	Rajshahi University
LM00095	Dr. Mohammad Jasim Uddin	CEO	Global Agrotech BD Nutrition
LM00096	Dr. Mohammad Sorwar Jahan	Managing Director	Safe Bio Products Ltd.

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

ID. No.	Name	Designation	Institution
LM00097	Dr. Mohammad Sadequr Rahman	Marketing Manager	Bengal Oversease Ltd.
LM00098	Dr. Muhammad Saiful Bashar	CEO	Total Agro Care
LM00099	Dr. Md. Selim Ahmed	Professor	Patuakhali Science and Technology University
LM00100	Dr. Md. Yeamin Hossain	Professor	Univetsity of Rajshahi
LM00101	Dr. Md. Tariqul Islam	Professor	Univetsity of Rajshahi
LM00102	Dr. Md. Jahangir Alam	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00103	Dr. Khondoker Moazzem Hossain	Professor	Khulna University
LM00104	Soshe Ahmed	Associate Professor	Rajshahi University
LM00105	Dr. Rashida Khaton	Professor	Rajshahi University
LM00106	Dr. Md. Reazul Islam	Regional Manager	BRAC Dairy and Food Project
LM00107	Dr. Md. Monzur Rahman Bhuiyan	General Practitioner	IT General Hospital
LM00108	Dr. Nazmun Nahar Karim	Member Director	Bangladesh Agricultural Research Council
LM00109	Dr. Ali Akbar Bhuiyan	Principal Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
LM00110	Krishibid Lutfor Rahman	Manager	Technoworth Associates Ltd.
LM00111	Dr. Md. Abdul Kafi	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00112	Dr. Khondoker Jahengir Alam	Professor	Patuakhali Science and Technology University
LM00113	Dr. Abul Khair	Director (Retired)	DLS
LM00114	Dr. Mohammad Mohi Uddin	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00115	Dr. Ashish Kumar Samanta	Professor	ICAR- National Dairy Research Institute, India
LM00116	Dr. Md. Anower Hussain	Professor	Bangladesh Unicersity of Health Sciences
LM00117	Dr. Mohammad Dalower Hossain Prodhan	Senior Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Institute
LM00118	Eng. Usama Ibn Latif	Assistant General Manager	Danish Foods Ltd.
LM00119	Mohammed Tarique Sarker	Managing Director	Fishtech Hatchery Ltd.
LM00120	Dr. Alam Khan	Professor	Rajshahi University
LM00121	Dr. A.B.M. Rubayet Bostami	Associate Professor	BSMRAU
LM00122	Dr. Shib Shankar Saha	Professor	Patuakhali Science and Technology University
LM00123	Dr. Tanjina Atique	Lecturer	Bangladesh University of Health Sciences
LM00124	Dr. Md. Zahirul Alam	Deputy Registrar	Bangladesh Agricultural University
LM00125	Dr. Md. Sulaiman Hossain	Deputy Manager	Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
LM00126	Dr. Mohammad Alam Miah	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00127	Md. Mukul Islam	Associate Professor	HSTU
LM00128	Md. Mobinul Islam	Lecturer	HSTU
LM00129	Dr. M. Ariful Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00130	Dr. Muhammed Rafiqul Islam	PhD Fellow	Bangladesh Agricultural University
LM00131	Dr. A.K.M Khasruzzaman	Managing Director	Inter Agro BD Ltd.
LM00132	Dr. Mohammed Jamil Hossaim	Managing Director	Adyan Agro Ltd.
LM00133	Dr. Bishwajit Roy	Country Head-Bangladesh	DSM-FIRMENICH
LM00134	Dr. M. Enamul Hoque Azad	CEO	Relife Agrovet Bangladesh
LM00135	Tarek Mahmood Khan	Managing Director	Bengal Agrovet Ltd.
LM00136	Mohammad Fayzur Rahman	Managing Director	Avance Asia Ltd.
LM00137	Khondoker Mohammad Mohsin	Managing Director	United Agro Ltd.
LM00138	Dr. Amina Khatun	Assistant Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00139	Dr. Tahmina Sikder	Assistant Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00140	Dr. Mohammad Ashiqur Rahman	AGM	Nourish Agro Ltd.
LM00141	Md. Taslim Khan	CEO	Radiance Animal Health
LM00142	Dr. Muhammad Abdul Mannan	Assistant Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00143	Dr. Abdur Rahman	Lecturer	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00144	Dr. Lutfor Rahman	CEO	Vet Care Lab, Gazipur

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

ID. No.	Name	Designation	Institution
LM00145	Md. Sirajul Hoque	Director	Reneta Ltd.
LM00146	Dr. Md. Abdul Wares	Faculty Member	Sirajganj Government Veterinary College
LM00147	Dr. Md. Mahmudul Hasan Sikder	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00148	Dr. Anjuman Ara Bhuiyan	Senior Scientific Officer	National Institute of Biotechnology
LM00149	Mohammad Khorshed Alam	Managing Director	Oriental Pharma Agro Vets Limited
LM00150	Dr. Quazi Shireen Akther Jahan	PSO and Head	Bangladesh Rice Research Institute, Barishal
LM00151	Dr. Ajran Kabir	Research Assistant	Bangladesh Agricultural University
LM00152	Dr. Sabiha Salam	Product Development Officer	Bright International CTTG
LM00153	Dr. Zakiah Rahman Moni	Principal Scientific Officer	Nutrition Unit, BARC
LM00154	Dr. Sk. Shaheenur Islam	Deputy Director, Health	Department of Livestock Services
LM00155	Dr. Mir Mohammad Ali	Assistant Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00156	Dr. Farjana Haq	MPH	Livestock Capacity Development Specialist
LM00157	Dr. Afroja Yasmin	Assistant Professor	Dept of Pathology, BSRMAU
LM00158	Dr Md. Amir Hossain	Professor	Dept of Genetics & Plant Breeding, BAU
LM00159	Dr. Sajeda Sultana	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00160	Khondaker Monir Ahamed	Vice President	Bangladesh Poultry Industries Association
LM00161	Dr. Mofassara Akter	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00162	Dr. Md. Asaduzzaman	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00163	Dr. Mohammad Saiful Islam	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00164	Dr. Mahfuzul Islam	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00165	Dr. Md. Saiful Islam	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00166	Md. Rashidul Hasan	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00167	Dr. Md. Rashedul Islam	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00168	Dr. Roksana Jahan	Assistannt Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00169	Dr. Al-Nur Md. Iftekhar Rahman	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00170	Dr. Mst. Sharifa Jahan	Associate Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00171	Mr. Sayem Ul Haq	Chairman	Novivo Healthcare Limited
LM00172	Dr. Md. Tarikul Alam Fakir (Bulbul)	National Sales Manager	Novivo Healthcare Limited
LM00173	Dr. Md. Abdus Shabur Talukder	Assistant Professor	IUBAT
LM00174	Dr. Mohammad Nezam Uddin Akhand	Head of Marketing	Health Care Pvt Limited
LM00175	Dr. Md. Salauddin	Assistant Professor	Khulna Agricultural University
LM00176	Dr. Md. A Saleque	Chief Technical Advisor	ACI Animal Health
LM00177	Dr. Mohammad Rashedul Jakir	CEO	R R Agro Traders
LM00178	Dr. Md. Mominul Islam	Assistant Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00179	Dr. Md. Najmul Haque	Assistant Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00180	Dr. Nasrin Sultana Lucky	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00181	Dr. Sharmin Sultana	ULO	Department of Livestock Services
LM00182	Dr. Pran Krishna Howlader	ULO	Department of Livestock Services
LM00183	Dr. Md. Kamrul Hassan	Theriogenologist	Department of Livestock Services
LM00184	Dr. Md. Shohidullah Miah	Professor	College of Agricultural Sciences - CAS, IUBAT
LM00185	Dr. Sharmin Aqter Rony	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00186	Dr. Jayonta Bhattacharjee	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00187	Dr. Mossat Anamika Nasrin	Assistant Professor	IUBAT
LM00188	Dr. Md. Golzar Hossain	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00189	Dr. Sharif-Ar-Raffi	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00190	Dr. Farhana Binte Ferdous	Lecturer	Bangladesh Agricultural University
LM00191	Dr. Shaila Sharmin	Associate Professor	IUBAT
LM00192	Dr. Md. Aminul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

ID. No.	Name	Designation	Institution
LM00193	Dr. Mohammad Ferdousur Rahman Khan	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00194	Abu Yousuf Hossin	Assistant Professor	IUBAT
LM00195	A.K.M Rafiqul Islam Chuwdhury	CEO	Tennessee Agrovet
LM00196	Dr. Fahim Ahmed	Assistant Professor	IUBAT
LM00197	Dr. Kabirul Alam	Assistant Manager	Incepta Pharmaceuticals Ltd
LM00198	Dr. Sadia Afrin Punom	Assistant Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00199	Dr. Solama Akter Shanta	Lecturer	Khulna Agricultural University
LM00200	Dr. Muhammad Muktaruzzaman	Major	Bangladesh Army
LM00201	Dr. Mohammad Rabiul Karim	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00202	Dr. Mohammad Saidur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00203	Dr. Purba Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00204	Dr. A. K. M. Nowsad Alam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00205	Dr. Shirin Akter	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00206	Dr. Rakhi Chacrabati	Associate Professor	IIFS-Bangladesh Agricultural University
LM00207	Dr. Md. Nazim Uddin	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00208	Dr. Md. Ranzu Ahmed	Associate Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00209	Dr. Habibur Rahman	Professor	BSMRAU
LM00210	Dr. Md. Manjurul Haque	Professor	BSMRAU
LM00211	Dr. Swapan Kumar Roy	Assistant Professor	IUBAT
LM00212	Dr. Md. Jahidul Islam Saddam	CSO	Nourish Poultry & Hatchery Ltd
LM00213	Dr. Uttam Kumar Sarkar	Assistant Professor	Omargoni M.E.S. College, Chattogram
LM00214	Dr. Farzana Saleh	Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00215	Dr. Manika Rani Sarker	Associate Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00216	Dr. Taslima Khatun	Associate Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00217	Dr. Palash Chandra Banik	Associate Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00218	Dr. Saika Nizam	Assistant Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00219	Fatema Jebunnesa	Assistant Professor	Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
LM00220	Mr. Md. Abunaser	Lecturer	Bangladesh Agricultural University
LM00221	Dr. Rokshana Parvin	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00222	Dr. Md. Bahanur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00223	Md. Samiul Islam	Managing Director	Agro1 Global Limited
LM00224	Dr. Md. Mahbub Alam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00225	Dr. Mohammad Zahangir Alam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00226	Dr. A. K. M. Humayun Arefin	Managing Director	Artevet Bangladesh Ltd.
LM00227	Dr. Md. Masud Rana	Principal Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council-BARC
LM00228	Dr. Mahmud Hossain Sumon	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00229	Dr. Ali Reza Faruk	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00230	Dr. Tanvir Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00231	Dr. Md. Shahidur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00232	Dr. Layla Yasmin	ULO	Department of Livestock Services-DLS
LM00233	Dr. Shahrior Siddique	Manager	Tamim Agro
LM00234	Dr. Tazrin Kamal	PhD Fellow	N/A
LM00235	Dr. Md. Shahidur Rahman Khan	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00236	Dr. Mohammad Al Amin	Proprietor	Yelanc Pharma
LM00237	Dr. Mohammad Kamruzzaman Masud	CEO	Rabbani Trading Corporation
LM00238	Dr. Md. Shahidul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00239	Dr. Mst. Sonia Parvin	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00240	Dr. Mohammad Sakhawat	Deputy Director	Friendship

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

ID. No.	Name	Designation	Institution
LM00241	Muhammed Shamim Reza	Senior Director	Friendship
LM00242	Dr. Afrina Mustari	Professor	Bangladesh Agricultural University
LM00243	Dr. Mohammad Musa Kalimullah	Sr. DGM	Nourish Poultry and Hatchery Ltd.
LM00244	Dr. Mohammad Amjad Hossain	Head of Business	ACI Animal Health, ACI Ltd.
LM00245	Dr. Pallab Kumar Dutta	Deputy Director	Department of Livestock Services-DLS
LM00246	Dr. Mohammad Musharraf Uddin Bhuiyan	Professor	Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
LM00247	Dr. Salauddin Yousup	Lecturer	Habiganj Agricultural University
LM00248	Dr. Sharmin Sultana Royal	Lecturer	Habiganj Agricultural University
LM00249	Md. Asaduzzaman	Chief Executive Officer	Diamond Group
LM00250	Md. Didar Hossain Bhuiyan	Head of QC	Food Safety and Compliances, Sea Resources Group
LM00251	Dr. Tusar Chowdhury	Director	Doctor's Agro-Vet Agro-Vet Ltd.
LM00252	Dr. Rupsana Perven Borsha	Lecturer	Sher-e-Bangla Agricultural University
LM00253	Dr. Jebunnahar Khandakar	Associate Professor	Independent University Bangladesh
LM00254	Dr. Rayhan Hossain	Technical Manager	MSD Animal Health
LM00255	Md. Monoarul Islam	Senior Program Manager	Heifer International
LM00256	Dr. H. M. Nazmul Haq	CEO	Life Care Pharmaceuticals
LM00257	Dr. Biplab Kumar Pramanick	Proprietor	PNP Link
LM00258	Jahangir Alam Jony	Director	UBINIG
LM00259	Dr. Md. Nazrul Islam	ULO	Department of Livestock Services
LM00260	Dr. Md. Azizul Haque	Professor	Mawlana Bhashani Science and Technology University
LM00261	Dr. Md. Amimul Ehsan	Professor	Department of Medicine, Faculty of Veterinary Science, BAU
LM00262	Aung Tun Aye	Consultant	Aquatic Animal Nutrition and QA, Agro Solution
LM00263	Dr. Md. Kamrul Hasan	Professor	Department of Agricultural Chemistry, Syhet Agricultural University
LM00264	Dr. Md. Alimul Islam	Professor	Department of Microbiology, BAU, Mymensingh
LM00265	Dr. Md. Sazedul Karim Sarker	Principal Scientific Officer and Head	Poultry Research Centre, BLRI
LM00266	Dr. Mst. Farhana Sharmin	Senior Scientific Officer	Training Department, Bangladesh Jute Research Institute-BJRI
LM00267	Dr. Mohammad Anowar Hossain	Professor	Department of Biochemistry and Molecular Biology, BAU
LM00268	Dr. Md. Shad Uddin Mahfuz	Professor	Sylhet Agricultural University
LM00269	Dr. Md. Mohidur Rahman	Assistant Professor	Faculty of Agriculture, Gono Bishwabidyalay
"LM00270	Dr. Muhammad Abdur Rashid	Principal Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI)
LM00271	Dr. Ariful Islam	ULO	Department of Livestock Services
LM00272	Dr. Zaminur Rahman	Lecturer	Gono Bishwabidyalay
LM00273	Dr. Mohammad Humayun Kabir	Professor	Department of Horticulture, Shere e Bangla Agricultural University
LM00274	Dr. Tufael	Biochemist	Ibn Sina Diagnostic and Imaging Centre
LM00275	Md. Shofiqul Islam	Head of Operation	Ercole Media & Communications
LM00276	Dr. Khandakar Rakibul Islam	Director	Hoovers Agrovet Ltd.
LM00277	Mohammad Safiqul Bari	Managing Director	Hoovers Agrovet Ltd.
LM00278	Dr. Md. Bashir Uddin	Professor	Department of Medicine, Sylhet Agricultural University
LM00279	Dr. Md. Abdul Awal Khan	Professor	Department of Law, Independent University, Bangladesh
LM00280	Dr. Tahera Yeasmin	Professor	HSTU
LM00281	Rubaya	Scientific Officer	National Institute of Biotechnology-NIB
LM00282	Dr. Israt Jerin	ULO	Department of Livestock Services
LM00283	Mohammad Shaheen Shah	Chief Executive Officer	Everest Agrogenics Ltd.
LM00284	Shahida Akhter	PhD Fellow	Department of Microbiology and Hygiene, BAU

ছবিতে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

1st International Scientific Conference on Food Safety and Health

2nd National Scientific Conference on Food Safety and Health

3rd International Scientific Conference on Food Safety and Health

২০২০ সালে অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
এ.জি.এম শেষে উপদেষ্টা পরিষদ
কর্তৃক নির্বাচিত
নির্বাহী কমিটি ২০২০-২০২২

২০২০ সালে অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
কনফারেন্সে উপস্থিত
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

4th National Scientific Conference on Food Safety & Health

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
প্রেসিডেন্ট এর কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন
মাননীয় প্রধান অতিথি
প্রফেসর ড. মো. ফরিদুল আলম
ভাইস চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব
হেল্‌থ সাইন্স

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
সাধারণ সম্পাদক এর কাছ থেকে
ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিশেষ অতিথি
জনাব মশিউর রহমান
প্রেসিডেন্ট, বিপিআইসিসি

5th International Scientific Conference on Food Safety and Health

5th International Scientific Conference on Food Safety and Health

6th National Scientific Conference on Food Safety and Health

7th National Scientific Conference on Food Safety and Health

Safe Food Award 2025

Md. Rafiqul Islam
Managing Director, farmiagro

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড ও এরকোল মিডিয়া এন্ড কমুনিকেশনস এর আয়োজনে ৪৮ পর্বের খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সাপ্তাহিক লাইভ অনুষ্ঠানের কয়েকটি পর্ব।
অনুষ্ঠানটি দেখতে চোখ রাখুন প্রতি শনিবার বিকেল ৪:২৫ ঘটিকায় শুধু মাত্র এশিয়ান টিভিতে

অভিষেক অনুষ্ঠান
কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৫-২০২৭

SK+F
AiB™ VET
the Animal Immuno Booster
ম্যান্নান অলিগোস্যাকারাইড
বিটা-গ্লোকান
ভিটামিন ই
লাইসোজাইম
ভিটামিন সি
ভিটামিন এ
সেলেনিয়াম
জিংক
35 Lac U/gm
LYSOZYME HCl
সর্বোচ্চ লাইসোজাইম
সর্বোচ্চ ইমিউনিটি
ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.
ANIMAL HEALTH DIVISION
UK MHRA I EU GMP I TGA Australia I VMD UK
APPROVED

Andopan™

Powder

Andrographis paniculata 10%

Highlighting Point

- Prevents and treats viral diseases
- Improves immunity
- Reduces toxicity in liver
- Reduces Inflammation
- Increases growth of broiler poultry etc.

How to use

In poultry: Use in finished feed as follows

Prevention: 2mg/Kg body weight or, 1gm powder for 50Kg B.W for 5-7 days

Treatment: 4mg/Kg body weight or, 1gm powder for 25Kg B.W for 5-7 days

SQUARE
PHARMACEUTICALS PLC.
AGROVET DIVISION

Get it on: Google play App Store

PAAI

Like us on: facebook.com/spl.agrovet

SQUARE